খারাপ ছেলে

বাণী বসু

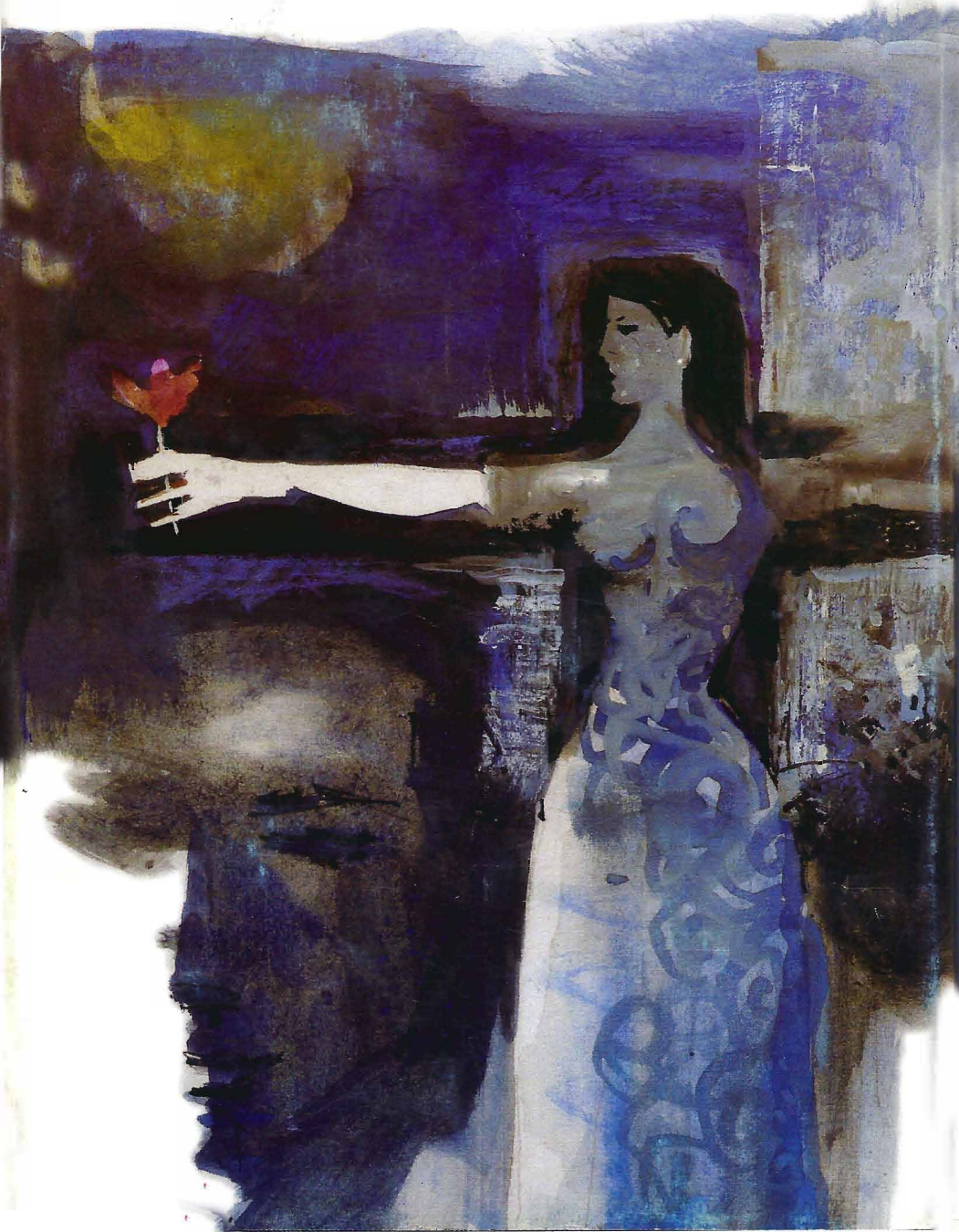

জিনা। পাখির মতো আকাশচারিণী জিনা। আশায় ভরপুর। কল্পনাপ্রবণ কোনও মালিন্য যেন তাকে কখনও স্পর্শ করেনি। জিনার বিয়ে হল মস্ত বড় চাকুরে নিখিলের সঙ্গে। শ্বশুর কল্যাণবাবুর সংসারে ছোটবউমা হয়ে এল জিনা। কিন্তু বিয়ের পর তার সময় যেন কাটতেই চায় না। নিখিলের মনের মানচিত্র তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। সময় কাটানোর জন্য কলেজের বান্ধবী মুকুট ও তার স্বামী ঋত্বিকের সংসর্গে জিনা নিজেকে জড়িয়ে নিল সমাজসেবায়। রেডলাইট এলাকায় যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়ে পড়ানোর কাজ।

এই কাজে জিনা পেয়ে গেল শ্বশুর আর বড়জা মল্লিকার সক্রিয় সহযোগিতা। জিনার এখন সারাক্ষণের চিন্তা—অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া মেয়েগুলো এবং তাদের সন্তানদের মুক্তির উপায় কী। সন্তানহীনা জিনার জীবন, মাধুর্যে ভরিয়ে তুলল এক যৌনকর্মীর ছোট্ট ছেলে কুটুস। নিখিলের সঙ্গে তার মৃতকল্প সুখহীন দাম্পত্যজীবনে এই সময় হঠাৎ নেমে এল আকস্মিক বজ্রাঘাত। সোনাগাছির যৌনকর্মী এবং ওদের কাজের সহযোগী বনমালার ঘরে জিনা আবিষ্কার করল ও-পাড়ার ফটিকবাবু ওরফে নিখিলকে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল জিনা। জীবনটা এখন তার কাছে এক জ্বলন্ত বিভীষিকা, দুঃস্বপ্ন। সেই দুঃস্বপ্ন থেকে কীভাবে জেগে উঠবে জিনা? ব্যক্তি এবং তার বহুকৌণিক জটিলতা, সমাজ-সমস্যা ও সংকটের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে এক দুঃসাহসিক উপন্যাস 'খারাপ ছেলে'।

.....

ISBN 81-7756-202-0

খারাপ ছেলে

খারাপ ছেলে

বাণী বসু

আনন্দ

অনুজপ্রতিম শঙ্করকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্তর্ঘাত
অমৃতা
অষ্টম গর্ভ
উজান-যাত্রা
উত্তর সাধক
উপন্যাস পঞ্চক
একুশে পা
খনামিহিরের ঢিপি
গান্ধর্বী
জন্মভূমি মাতৃভূমি
ঝড়ের খেয়া
ট্রেকার্স
তিমির বিদার
দশটি উপন্যাস
দিদিমাসির জিন
পঞ্চম পুরুষ
বৃত্তের বাইরে
মেয়েলি আড্ডার হালচাল
মৈত্রেয় জাতক
মোহানা (গল্প)
যখন চাঁদ এবং (গল্প)
যে যেখানে যায়
রাধানগর
শ্বেতপাথরের থালা
সমুদ্র-যাত্রা

কালবৈশাখ

এরকম বিদঘুটে অন্ধকার জায়গা সে আগে কখনও দেখেনি। এটা কি তারই বাড়ি? তা হলে কি সে ঘুমিয়ে থাকাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেছে? আজকাল তো সেভাবে বিদ্যুৎ যায় না! যায়, সাতগেছেয় তার বাপের বাড়িতে যায় খুবই। অনেক সময়ে ভোল্টেজ খুব কমে থাকে।...কোথা থেকে একটা মৃদু আওয়াজ আসছে না? খট খট খটাখট খট খট। খট খট খটাখট খট খট! কে যেন অবিশ্রান্ত কড়া নেড়ে যাচ্ছে। জোরে নয়, আস্তে, খুব ধৈর্যে কিন্তু খুব গোপনে। এত গোপন যে প্রায় নৈঃশব্দ্যের কাছাকাছি, ইশারা, শুধু ইশারা আছে এই মৃদু কড়া নাড়ায়। যেন সবাইকে জাগাতে চায় না। সবাই ঘুমিয়ে থাক। একঘেঁয়ে আওয়াজের ঘুমপাড়ানিতে আরও গভীর হোক ঘুম। শুধু একজন, বিশেষ একজন, যার দায়িত্ব বেশি, যার কর্তব্যের কোনও মাপজোক নেই, সে এসে চুপচাপ দরজাটা খুলে দিক। দরজার ওদিকে কে? চোর নয়, অথচ চোরের মতো, চেনা অথচ চেনার মতো নয়! ভেতর থেকে একটা দুর্বার কাঁপুনি আসছে। শীত করে জ্বর আসছে যেন। জিভ শুকিয়ে কাঠ। জল, একটু জল দাও কেউ। চতুর্দিকে বাঘের গায়ের দুঃসহ গন্ধ। বুনো, বোঁটকা। এবার সে বুঝতে পারে ধূর্ত মানুষখেকোটা অনেকক্ষণ তার পিছু নিয়েছে। গুঁড়ি মেরে মেরে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। বাঘের বাড়ি তো জঙ্গলে! এটা কি তা হলে জঙ্গল? না তো! অন্ধকারের মধ্যে কবরখানার ফলকের মতো ঘরবাড়ি সব আবছা হয়ে ভেসে আছে যেন! লোডশেডিং-এর ফাঁকেই কি বাঘটা লোকালয়ে চলে এসেছে? জনবহুল শহরের অলিগলি দিয়ে, লোকজন ট্রাম, বাস, রিকশা, ঠ্যালাগাড়ির পাশ কাটিয়ে ভয়াবহ দুলকি চালে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে বাঘটা। চোখের হাড় হিম-করা সবুজ আলো যেন জাহাজের সার্চলাইট, ঘুরছে চুনবালি খসা পাঁজরাসার বাড়িগুলোর গায়ে। হাত-পা সব কোলের মধ্যে টেনে নেয় সে, ছোট্ট একটা পুঁটলি হয়ে যায়, মালভর্তি ট্রাকের পাশে মাথা গুঁজে কুঁকড়ে থাকে, আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে আরও অন্ধকার কোণে, কানাচে। গলি পায়, পাথর পাতা সরু নোংরা, ঢিপি-ঢিপি আবর্জনা মাড়িয়ে মাড়িয়ে, ঘেন্নায় ভয়ে দিশেহারার মতো সে ছুটে চলে দু-পাশের পুরনো বাড়ির রোয়াকে রোয়াকে ধাক্কা খেতে খেতে। হুড়ুম করে একটা শব্দ। হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে বাঘটা। লাফিয়ে, লাফিয়ে, লাফিয়ে পড়ছে।

চিৎকার করে দিবানিদ্রা ভেঙে উঠে বসল সে। গোল গোল না-বোঝা চোখে বোবা আতঙ্ক। নড়ছে দরজা-জানলা, ঠাস করে জানলার পাট পড়ল কোথাও, সমস্ত ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। গড় গড় করে মেঘের ডাক। তীব্র বিদ্যুতের

ঝলক বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরে দপ করে সাদা আলোর মশাল জ্বালিয়ে নিবে গেল। বাঘ নয়। ভূমিকম্প নয়, কালবৈশাখী। এ বছরের প্রথম। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যেও দূর থেকে নির্ভুল ভেসে আসছে ধৈর্যশীল খট খট খটাখট খট খট খট খট...

সে বুঝতে পারছে অন্য ঘরগুলোয় কোথাও জানলা খুলে গেছে ঝড়ের দাপটে। বন্ধ করা দরকার। কিন্তু হাত-পাগুলো অবশ হয়ে আছে। এখনও পুরোপুরি না-ভাঙা ঘোরে, ভয়ে। নামতে গেলে যদি খাটের তলা থেকে দুটো লোমশ থাবা... খাট থেকে নিরাপদ দূরত্বে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল। ভীষণ লেগেছে। কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে কোনওক্রমে খিল খুলে সে দালানের অপর প্রান্তের দরজাটায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'জিনা! জিনা! জিনা!' শেষের দিকে গলার স্বর আর্ত কান্নার মতো শোনাচ্ছিল।

খুলেছে। খুলেছে। ওই তো জিনা! খোলা দরজার ওপারে দীর্ঘ কাফতান, অভয়দাত্রী বরদা।

—এ কী! তুমি যে পড়ে যাচ্ছ? কী হয়েছে দিদিভাই?

দরজাটা কোনওমতে ধরে যেন ডুবন্ত মানুষের মতো হাঁকপাক করছে মল্লিকা।

—ভরদুপুরে কে দরজা নাড়ছে...

—এ তো ঝড়ের আওয়াজ...

—না... না... ওই শোন... ওই আবার...

—আমি দেখছি। তুমি ভেতরে এসে বসো তো... তারপরে সে বলল... দরজা নাড়লেই বা কী?

কী, তা জিনা বুঝবে না। জিনা কেন, কেউ বুঝবে না। কেউ না কেউ না। এতক্ষণ পরে আশ্বাস পেয়ে মল্লিকার চোখ দিয়ে গরম জল নামতে থাকে। ভয়ের অশ্রু। প্রায় ফুটছে এত গরম।

সত্যিই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। ফুটো আছে একটা। কিন্তু ওপারে ঠিক জায়গায় না দাঁড়ালে কিচ্ছু দেখা যায় না। খুলতেই দমাস করে হাট হয়ে গেল পাল্লাদুটো। কোনওক্রমে দু হাত দিয়ে সেগুলো সামলাতে সামলাতে জিনা দেখল রোগামতো একটি লোক, কাঁধে ঝুলি, —ওহ্ ক্যুরিয়ার সার্ভিস। একটা কার্ড।

উলটো দিকে স্কটিশচার্চ কলেজ আর হেদুয়ার দক্ষিণে আকাশ নীলচে কালো, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ক্রমাগত নীচ থেকে ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। গরম হাওয়ার স্তর ভেদ করে একঝলক কনকনে এস্কিমো হাওয়া বরফজলের ঝাপটায় মুখের ওপর গলার ওপর আছড়ে পড়ল। নিখিল দে সরকারের নামে কার্ডটা। জনৈক 'ল' পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নববর্ষে, ক্রিসমাসে আসে। লোকটি দরজা ভুল করেছে। ঠিক দুপুরবেলা লোকের বাড়ির দরজা ঠেঙিয়ে এভাবে কার্ড পাঠাবার মানেটা কী? সবাই জানে এসময়ে ঘুমন্ত গিন্নিবান্নি আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ থাকে না! লোকে দরজা খুলবেই বা কী ভরসায়? এইসব ক্যুরিয়ারদের কী নিয়ম সে জানে না। কিন্তু এরা তো সন্ধেবেলাতেও আসতে পারে! এসেও থাকে! বলতে গিয়ে দেখল লোকটি অনেক দূরে চলে গেছে। ঝড়ের মুখে একটা

কুটোর মতো উড়ে গেছে বোধহয়।

দোতলায় উঠতে উঠতে বিস্ময়টা আবার ফিরে এল। ঠিক আছে। দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে। তো ভয়ের কী আছে? এত ভয়? আঁচল লুটোচ্ছে, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁট শুকনো, চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেছে! এ কী!

—ক্যুরিয়ার, নিখিল দে সরকারের চিঠি। কার্ড একটা। ওর বন্ধু মিঃ ল'-এর কার্ড। দিদিভাই। স্বপ্ন দেখেছিলে, না?

মল্লিকা দরজার কাঠে ঠেস দিয়ে দু হাত পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিশেহারা আতঙ্কের ভাবটা এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু মুখটা সাদা হয়ে আছে। কেমন অবসন্ন।

—বেল তো ছিল। দরজা ঠক ঠক করছিল যে! —কোনওক্রমে শুকনো গলায় বলল মল্লিকা। অসংলগ্ন।

সত্যি তো! বেল না বাজিয়ে লোকটা ঠক ঠক করছিল কেন! আসলে বেলটা একটু ওপরে। ছোট ছেলেরা বাজিয়ে বাজিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। সেই উৎপাত থেকে বাঁচতেই ওপরে লাগানো হয়েছে বেলটা। দেখতে পায়নি বোধহয়। সেই কথাই বলল জিনা।

—চলো তো। নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছিলে। চোরের না ডাকাতের?

চমকে উঠল মল্লিকা। জিনা ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে এসে বলল —খাও তো জলটা। সে মল্লিকার আঁচল গুছিয়ে তুলে দিল।

—তুমি ঝড় ভয় পাও দিদিভাই, না? অনেকে পায়। আমার ভাই ছোটবেলায় খাটের তলায় ঢুকে যেত দু কানে আঙুল দিয়ে। আমার কিন্তু ঝড় দুর্ধর্ষ লাগে। চলো প্লিজ। ছাতে চলো, তোমার ভয় আমি ভেঙে দেব।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই হিড়হিড় করে মল্লিকাকে টানতে থাকে সে।

মল্লিকা বলল, দাঁড়া, কোথায় জানলা পড়ছে, বন্ধ করে আসি।

—পারবে? না আমি যাব? ঘরে যদি ডাকাত লুকিয়ে থাকে?

জিনা হাসছে। শিউরে উঠল মল্লিকা, একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, তুই যা, আমি আসছি।

—ঠিক তো? আসবে তো? না এলে ভাল হবে না কিন্তু।

জিনা ভয়ের কী জানবে? জিনার চারপাশে কত অভিভাবক, কত রক্ষক, কত আলো, কত সঙ্গীসাথী! কত রকম সম্পর্ক থেকে জিনা তার অজস্র প্রাণশক্তি সঞ্চয় করেছে। টগবগ করছে যেন সব সময়ে। বিদ্যুৎহীন গ্রামাঞ্চলের ঝোপেঝাড়ে, গোয়ালে, উঠোনে, ঘরের কোণে, তক্তপোশের তলায় কীরকম ঝুঁঝকো আঁধার থাকে সে কি জানে? জানে মা না-থাকার ভয়, বাবা থেকেও না-থাকার ভয়, একমাত্র দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার ভয়? আরও কত, কত!

ইস, ঝুম্পা-মাম্পির ঘরখানা একেবারে হুলুট-থুলুট হয়ে গেছে। বালিশ থেকে ঢাকা উড়ে গেছে, টেবিলের ওপরে কাগজপত্র লুটোপুটি খাচ্ছে, ধুলোয় ঘরখানা বোঝাই। জানলাটা বোধহয় ভাল করে বন্ধ করে যায়নি ওরা। ছিটকিনিটা ঠিক জায়গায় পড়েনি। ভাল করে জানলা বন্ধ করে ঝাঁটা আনতে যাচ্ছিল। নাঃ, এসব

পরে হবে, এখন ছাতে না গেলে জিনা এক্ষুনি হুড়মুড় করে নেমে আসবে।

—কই, দিদিভাই? দু-তিন সিঁড়ি টপকে টপকে ঠিক নেমে আসছে।

—যাচ্ছি—

দুড়দাড় করে আবার উঠে গেল জিনা। পেছনে মল্লিকা। ছাতে দমকা হাওয়া। জিনা এখন আর ডাফ স্ট্রিটের বাড়ির ছোটবউ নেই। হয়ে গেছে আপাদমস্তক দমদম মতিঝিলের জিনপরি। ওর জ্যাঠামশাই ওকে 'জিনপরি' বলে ডাকেন। বোনেদের সঙ্গে পড়িমরি করে সে এখন ছাতে উঠছে। প্রকাশিত উদ্দেশ্য কাপড় তোলা, আসল উদ্দেশ্য ঝড়বৃষ্টিতে দাপাদাপি। সবাই মিলে হাসতে হাসতে ছুটোছুটি হবে এখন। এ ওর পেছনে। ও এর পেছনে। মেজজেঠুর ধুতিটা বাগানো গেল তো ঠাকুমার থান ওই উড়ে যায়। বেজায় মোটা সেজজেঠুর ফতুয়া হাত টান-টান করে শুকোতে দেওয়া, সেটা প্রবল বেগে দুলছে। যেন সেজজেঠু নিজেই ফতুয়ার মধ্যে গলে বসে আছে। ঝড়ে ফতুয়াও দুলছে। সেজজেঠুও দুলছে এতোল বেতোল। কে কাকে বলল কথাটা। বাস, হাসির রোল উঠল। ছোট ছোট শার্ট, প্যান্ট, ফ্রকগুলো ক্লিপ খোলামাত্র লাট খেয়ে উড়ে পড়ছে পাঁচিলে। ওমা। সীতা যে লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরিয়ে গেল— সেজদির চিৎকার। একটা প্যান্ট উড়ে চলে গেছে। ক্ষুরধার বৃষ্টিতে এবার সব ভিজে জাব। কাপড়ও, কাপড় তুলুনিরাও। যত বৃষ্টি তত হাসি। যত হাওয়া তত নাচ।

—ও মা গো! কাপড় তুলছে না আরও কিছু, ও বড়দি দেখে যাও, কাপড় তোলার নাম করে মেয়েগুলো কাকভেজা ভিজছে। কাপড়চোপড় সব ভিজে গোবো-ওর। কাকিমার তারস্বর নালিশ ডুবিয়ে দিয়ে আকাশচেরা বিদ্যুৎ ঝলসে বাজ পড়ল।

আকাশে গড়গড় করে রোলার গড়ানো শুরু হয়ে গেল। গম্ভীর আওয়াজে ভরে যাচ্ছে চরাচর। ছাতের পাঁচিলের নিচু ধাপে পা রেখে সে অবলীলায় শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে দেয়, তারপর মুখটাকে ওপরের দিকে হাসি হাসি করে তুলে ধরে, ঝড় খায়।

'বেড়া ভাঙার মাতন নামে এ উদ্দাম উল্লাসে/ আসে আসে'—গাইতে গাইতে লাফ দিয়ে নামে সে, ধাপ থেকে ছাদে।

—দিদি ভা-ই—দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে এরোপ্লেনের মতো সে ছুটে যায় ছাতের এক দিক থেকে আর এক দিকে।

—এবার জাগ রে হতাশ আয় রে
এবার জাগ রে হতাশ আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে
বুঝি এল এল তোমার পথের সাথী বিপুল অট্টহাসে

আসে আ-সে। গাইতে গাইতে সে ছুটে এসে দু হাত দিয়ে মল্লিকার গলা জড়িয়ে ধরল।

—দুর্ধর্ষ, না?

—কোনটা? —এতক্ষণে মল্লিকার মুখে কথা ফুটেছে!

—এই স-ব। হাত দিয়ে সমস্তটাকে সাপটে নিয়ে জিনা বলল এই ঝড়, গান, দুপুর, গরম, আমি, তুমি, তোমার স্বপ্ন, ভয়, সব... স...ব!

দূরের দিকে তাকিয়ে মল্লিকা দেখল দুটো নারকোল গাছ দক্ষিণ থেকে উত্তরে বেঁকছে, বেঁকছে, বেঁকছে। একেবারে এক গতিতে, পুরো একটা ঝাঁটা হয়ে গেছে। আবার উঠল, সোজা হল। ঝাঁকি দিয়ে পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবার। ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে। কুটোকাঠি, পাতাপুতি, সব পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরছে, সেই ঘুরনের কেন্দ্রে একটা মেয়ে। সে? জিনা? না ঝুম্পা? না মাম্পি? হতে পারে সবাই। কিন্তু তার এখন মনে পড়ছে বৃষ্টিভেজা মাটির গন্ধ। সন্ধে করে বৃষ্টি থেমেছে। এবার হু-হু করে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে মেঘের দল, তলা থেকে বেরিয়ে পড়ছে, তকতকে করে মোছা নীল আকাশ। সন্ধে, তাই রংটা একটু গাঢ়, কালো মেশানো নীল, তারা ফুটে উঠছে, —যাক, এক পশলা হয়ে গরমটা একটু কমল...

রাস্তা দিয়ে পিছল বাঁচিয়ে পা টিপে টিপে চলতে চলতে কেউ বলল।

—এই শুরু হলও বলতে পার। এইবার চাল উড়বে, ঝড়ের এমন দাপট হলে আমার রান্নাঘরের দেওয়ালখানা নিয্যস পড়বে। তোমার আর কী! পাকা করে নিয়েচ।

—গরমটার কথা বলো, গরমটার কথা বলো... ঘামাচি হয়ে হয়ে, ঘামাচি হয়ে হয়ে...

বাইরে শুতেও আজকাল সাহস হয় না।

—শুনছ-ও, কে আছিস, মল্লি-ই ছাতাটা ধর দেখি।

কাকা আগড় খুলে ঢুকছেন। পা কাদায় কাদা। সে জল ঢেলে দিচ্ছে প্লাস্টিকের লাল মগে করে।

কাকিমা বেরিয়ে এল। হাতে শাঁখ। একটা দাঁত উঁচু। ওপরের দিকে মুখ করে শাঁখে ফুঁ দিল, তারপর বলল, বুঝলে? মল্লির হিল্লে হয়ে গেল।

—মল্লির? হিল্লে? কীরকম?

—ও বাড়ির আরতিদি এসেছিলেন আজ। গলা থেকে হার খুলে মল্লিকে পরিয়ে দিয়ে গেছেন।

—বল কী? তা ব্যাপারখানা...

—আরে আরতিদির বড় ছেলেটি তো চার্টার পাস করে চাকরিতে ঢুকেছে আর বছর। চাকরি পাকা হল। বুঝলে না? মল্লিকে বুক করে গেলেন।

—বলেছেন কিছু?

—বলেনি। বলবে, দুদিন যেতে দাও।

—তা না বলবার কারণটা কী?

—কে জানে! ঘোড়েল মহিলা। হয়তো আর পাঁচটা দেখছে।

—অন্য কোথাও পছন্দ হলে হারের কী হবে?

—কী আবার হবে? একখানা চিলতে সোনার হার আর ওদের গায়ে লাগে না।

মল্লি সরে যাচ্ছে ছায়া থেকে অন্ধকারের দিকে, অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকার। নাকি আলো! কোনটা অন্ধকার কোনটা আলো সে জানে না। কলেজের

বাইরে একটা মজা পুকুর। সারের লেকচার শুনতে শুনতে ওই মজা পুকুরের দিকে চোখ চলে যায়। একদলা কচুরিপানার ওপর একটা মাছরাঙা বসেই উড়ে গেল। কোঁচড়ে করে গুগলি তুলছে একটি বউ। একটা ছাগলি ভারী পালান নিয়ে পুকুরধারের আগাছা খেয়ে বেড়াচ্ছে। পড়াশোনাটা তত ভাল লাগে না মল্লিকার। কলেজ ভাল লাগে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে দেখাশোনা, কথাবার্তা। সার, ম্যাডাম। শুধুই তো সবসময়ে সংবিধান আর মার্কসীয় তত্ত্ব পড়াচ্ছেন না, অন্য গল্পও করছেন। কেউ কেউ বেশ মজার গল্প করতে পারেন। সারেদের সব্বাইকার মল্লিকার ওপর খুব ঝোঁক। যে সার গোমড়ামুখো, অন্য দিকে চেয়ে পড়ান সেই দীপ্তেন সারেরও। ওঁরা মল্লিকাকে বিদ্যাদিগ্‌গজ বিদ্যাধরী না করেই ছাড়বেন না।

—কালকে কী বলছিলাম? পয়েন্টসগুলো মল্লিকা বলো—

দুর বাবা, বলছিলেন তো আপনি, আমি কী করে জানব? মল্লিকা ভাবে।

অর্ধেক মনোযোগ দিয়ে এই মজা পুকুর, কচুরিপানা, গেঁড়িগুগলি, সংবিধান, সন্ধে হতে না-হতেই ওই আঁধার, এ আর কতদিন? হয়তো আরতিদি, ওপাড়ার আরতিদিই ভাল। ওই মাছরাঙাটার মতো তাকে ঠোঁটে করে উড়ে যাবেন। কোথায় যাবেন, সে তাঁর খাদ্য হবে না খেলা হবে এ প্রশ্ন বোধহয় অবান্তর। মায়েরা যে কেন মারা যান! বেশ তো ছিল তারা! হেলথ্ সেন্টারের কম্পাউন্ডার ছিলেন বাবা। তো অর্ধেক চিকিৎসা সেই আধা শহরে বাবাই করতেন। কত কল আসত। তারা বাবাকে ডাক্তার বলেই জানত। সবাই ডাক্তারবাবুই বলত। মাকে বলত ডাক্তার বউদি। স্বয়ং ডাক্তার বউদিরই কোনও চিকিৎসা হল না। একটি বারো, একটি আট, দুই মেয়েকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন অসহায় ডাক্তারবাবু। বছর চার-পাঁচ কোনওরকমে কাটালেন, তারপর নিজেও এসে গ্রামে বসে গেলেন। এখানেও রোগী হয়। চিকিৎসা করেন, কিন্তু কেমন আলাভোলা মতো হয়ে গেছেন। কাকা-কাকিমা বলে উদোমাদা।

কিন্তু এ কেমন আচরণ? সে জানল না, বুঝল না, দেখল না, মতামত দিল না, কেউ জিজ্ঞেসও করল না। একজন গিন্নিবান্নি মানুষ তাঁর ইচ্ছেমতো তাকে 'বুক' করে গেলেন? সত্যি বলছি জিনা ভেতর থেকে হু হু করে কান্না আসছিল। কিন্তু যার কান্না বোঝবার কেউ থাকে না, তার চোখের জল চোখেই শুকোয়।

—দিদিভাই। তোমার কারও সঙ্গে প্রেম হয়নি?

—ভ্যাট!

—অনেস্টলি দিদিভাই, যদি বল হয়নি, আমি এক কড়াও বিশ্বাস করব না। সব মেয়ের চোদ্দো-পনেরো থেকে প্রেম হতে শুরু করে, কেমন কিনা?

—তুই-ই বল আমি শুনি।

—শুনলে হবে না বলতে হবে। আচ্ছা, আমি কি দাদাকে বলে দিতে যাচ্ছি?

—বলে দিলে কী হবে? সে কি আমার হাতে মাথা কেটে নেবে?

—তবে? তবে বলবে না কেন?

—ঠিক আছে, বলব। তুই আগে বল, চোদ্দো-পনেরো কী সব বলছিলি?

—খুব মজা, না? আমারটা জেনে নেবে, তারপর নিজের বেলায় বলবে

গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি মারিসনি। তোমাকে আমি চিনি না? হেভি চালাক!

—সত্যি সত্যি তিন সত্যি করছি, বলব।

—না, আমি বলছিলাম কি প্রথমে ভেতরে একটা প্রেম প্রেম ভাব হয়। নিজেকে নিয়ে নিজেই গদগদ। এই ধর পাড়ার দাদা, বন্ধুর দাদা, নিজের কাজিন-টাজিন, মল্লিকা মিটিমিটি হাসে— তারপর?

—তারপর ধর ফিলমের হিরো, গল্প-উপন্যাসের হিরো, বন্ধুর দাদাটা কনটিনিউ করতে থাকে, যদি না তার মাইনাস পয়েন্টগুলো একেবারে জ্বলজ্বলে হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

—আর কাজিন?

—কাজিন আউট, ওরে ব্বাবা, অনেকে নিষিদ্ধের থ্রিল পেতে ঝুলে পড়ে বটে দিদিভাই, কিন্তু মোস্ট আনরিওয়ার্ডি।

—কেন?

—কেন আবার কী? নতুন তো কিছু নেই! পিসি-মাসি পিসে-মেসো এদের তো তুমি ইনসাইড আউট চেনো। নতুন বোতলে পুরাতন? কবি বলেছেন না? পুরানো জানিয়া চেয়ো না, চেয়ো না... আধেক আঁখির কোণে! জিনার গলায় উচ্ছ্বসিত হাসি। প্রেম নতুন কিছু চায়, বুঝলে দিদিভাই! দেশভ্রমণে যাওয়ার মতো! কিংবা একেবারে ভিন্নদেশে সেট্‌ল করার মতো। তবে সবচেয়ে কমন হল কলেজ য়ুনিভার্সিটি প্রেম। ব্যাচমেটকে আজকাল তা বলে হাফ পার্সেন্টও পাত্তা দেয় না, স্পোর্টস বা টেস্ট-ফেস্ট-এ এ প্লাস পেলে কটা দিন একটু স্বপ্নে আসা-যাওয়া করে বাস, ফুলস্টপ। এরা কতটুকু করে জান? একটা প্রেমের উপক্রমণিকা তৈরি করে দেয়। ঠিকঠাক একটা মেজাজ। তবে যদি হায়ার ক্লাসের হয় তো একটা বীভৎস ঝুলোঝুলি হয়। আচ্ছা এবার চালাকি ছেড়ে তোমার কেস বলো দিকি! ইয়ার্কি!

—আরে আমি গাঁয়ের মেয়ে। আমার আবার প্রেম কী?

—তবে রে? গাঁয়ে আর পাড়ার দাদা, বন্ধুর দাদা থাকে না? গাঁয়ের মেয়ের আর কাজিন নেই?

—কমন ক্যানডিডেট সব তো বলেই দিলি। ওইরকমই আমারও ঘটেছিল নিশ্চয়। কোনওটাই তেমন স্পষ্ট নয়। ওই তোর উপক্রমণিকাই।

—একদম বাজে কথা বলবে না দিদিভাই, তুমি হলে গিয়ে টিপিক্যাল ম্যান'স উয়োম্যান।

—মানে? তুই বাগে পেয়ে গুরুজনকে যা-তা বলছিস?

—এই তো! 'গুরুজন' তাসটা যে তুমি বেগতিক বুঝলেই খেলবে সেটা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি। তা খারাপ তো কিছু বলিনি দিদিভাই। তোমাকে বিধাতা খুব অ্যাট্রাকটিভ করে গড়েছেন। বাস।

—কেন? তুই অ্যাট্রাকটিভ নোস। যেখানে যাস, মুন্ডু তো সব তোর দিকে ঘুরে যায়।

—সত্যি সত্যি যায় কি না জানি না। তবে যতই সাজপোশাক করি, তোমার

কাছে আমি কিছুই না। মানে ওই চার্ম-এর দিক থেকে। আমার হয়তো এক ফোঁটা ব্যক্তিত্ব, তোমার এক পুকুর চার্ম। —বুঝলে আর পুঙ্গবগুলো ব্যক্তিত্বফেক্তিত্ব দেখলে হেভি ঘাবড়ে যায়।

—একমাত্র নিখিলবিশ্ব দে সরকার ছাড়া।

দুজনে লুটোপুটি খেয়ে হাসে।

জিনার মতো সুখী জীবনের মেয়েকে বোঝানো শক্ত, কী কঠিন সংকট আর মনখারাপের মধ্যে তার কৈশোর কেটেছে। সেই দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করা দিনগুলোতে... বাবা দিন দিন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছেন, খোঁজখবর পর্যন্ত নেন না মেয়েরা কোথায় আছে, কেমন আছে... কাকা-কাকিমার তাচ্ছিল্য বাবাকে এবং তাদের... দিদি ছিল আরও দুর্বল। ফাঁক পেলেই কাঁদত আর কথায় কথায় রেগে যেত, যত রাগ মল্লির ওপর। সেই সময়ে প্রেমট্রেমের বিলাসিতা যে একেবারে উদ্ভট চিন্তা ছাড়া আর কিছু না, তা কাউকে বোঝানো শক্ত। তবে কি অন্যদের নজর, অন্যদের কৌতূহল, ঘুরে ঘুরে কাছে আসা, বুড়োদের ছুঁকছুঁকুনি এসব বুঝতে পারেনি? কিন্তু সে তো প্রেম নয়! একমাত্র একটা ঘটনাই মনে আছে। অল্প বয়সি প্রোফেসর ছিলেন ইংরেজির। সলিল সেন। তিনিও ক্লাসে কারও দিকে চাইতেন না। দেয়ালের দিকে চেয়ে পড়াতেন। কিন্তু যখন-তখন শুধু মল্লিকার সঙ্গেই তাঁর চোখাচোখি হয়ে যেত। চোখের ভাষা শুধু। সলিল সেন কী একটা পড়াশোনার কাজ নিয়ে দিল্লি ইউনিভার্সিটি গেলেন। স্টাডি লিভ নিয়ে। একদিন কলেজের বেয়ারা এসে একটা মস্ত লেফাফা এনে দিল, বলল— সলিল সার দিয়ে গেলেন, দিদিমণি এর মধ্যে ইস্পেশ্যাল নোটস আছে। খুলে দেখে ওমা! গুচ্ছের সাদা কাগজ। তার মধ্যে একটায় বড় বড় করে লেখা—'রিমেমবার মি।' মানে কী এর? শুধু স্মৃতিতে আবছা ছবি হয়ে থাকতে চায়? না জ্বল-জ্বলন্ত হয়ে থাকতে চাইছে আবার ফিরে আসবে বলে! স্পষ্ট করে অপেক্ষা করার কথাও তো কিছু লেখেনি? এ কী রকমের কাপুরুষ, অপুরুষ ভালবাসা, যদি ভালবাসাই হয়? বিমানের মা যে হারছড়া দিয়ে তাকে 'বুক' করলেন সে মোটেই বুঝতে পারেনি। উনি বলেছিলেন— বা, বা, নরেনদার এমন মেয়ে? চমৎকার মেয়ে, গলা থেকে হারছড়া খুলে পরিয়ে দিলেন— এমন মেয়ের মুখ কি শুধু হাতে দেখতে আছে? কাকিমা চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলছে— হিল্লে হয়ে গেল— কাকিমার সেই ঘাড় ফেরানোর ভঙ্গিটা, কানের তলায় গুঁড়ো চুল, একটা লাল পাথর চিকচিক করছে কানে— এখনও স্পষ্ট মনে আছে দৃশ্যটা।

কেন যে কান্না এসেছিল? হয়তো কান্নার মধ্যে ইংরেজির সার সলিল সেনও মিশে ছিলেন। কিন্তু আশা হয়ে নয়, বরং ক্রোধ হয়ে। আশাভঙ্গ হয়ে। মা-মরা, বাপের খোঁজ-না-নেওয়া একটা মেয়ে। তার আবার মতামত? এই তাচ্ছিল্যই আসলে তাকে অপমানের কান্না কাঁদিয়েছিল। আশ্চর্য, এখনও, এত দিনেও, বড় মেয়ে আঠারো পার হল, এখনও সেই অন্ধকার, অনিরাপদ, অপমানময় সন্ধ্যা তার অনুভূতিতে ফিরে ফিরে আসে। ফিরে আসে বিবাহোত্তর সেই বাড়ির দ্বিপ্রাহরিক নির্জনতাও। দুটি যুবক একটি তরুণী, এক প্রৌঢ় এক প্রৌঢ়া। সেই অস্বস্তি,

অস্বাচ্ছন্দ্য, অসুবিধের কথা, আতঙ্কের কথা কাউকে না বলতে পারার অন্ধকার।

বৃষ্টিতে চুরচুর ভেজা হয়েছে। ভাগ্যিস মাম্পি বাড়ি নেই। থাকলে ভিজত। নির্ঘাত গ্ল্যান্ড ফুলত, জ্বর হত। পায়ের জলছাপ ফেলে ফেলে মল্লিকা কলঘরে গেল। বৃষ্টির জলের পর কলের জল গরম লাগে। কে জানে কেন, আজকের জলটা যথেষ্ট কনকনে। আরামে শিউরোচ্ছে গা। কেন যে দুপুরে ঘুমোতে গিয়েছিল। দুপুর-ঘুমেই এই বিশ্রী স্বপ্নগুলো আসে। বাঘ, চোর, মাঝে মাঝে ম্যমির স্বপ্ন আসে। একটা বিরাট দৈত্যের মতো লোক। মুখে মাথায় কোথাও কোনও চুল নেই। চোখদুটো কাচের মতো। চৌকো চোয়াল। বিরাট বিরাট থামের মতো পা ফেলে এগিয়ে আসছে। সে প্রাণপণে চিৎকার করছে কিন্তু আওয়াজ বেরোচ্ছে না। মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটছে। কিন্তু দূরে যেতে পারছে না। এই লুটিয়ে পড়া আঁচল পায়ে বেধে বেধে যাচ্ছে।

—দিদিভাই দিদিভাই?

—আবার কী হল? —ভেতর থেকে সে সাড়া দিল।

—শিগগির বেরিয়ে এসো। আমার বন্ধু এসেছে। সেই মুকুট গো!

হঠাৎ যেন ভয়টা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে রাত শেষের বাদুড়ের মতো দূরে মিলিয়ে গেল। জিনার বন্ধু, মুকুট, বিদেশে থাকত, কাজ করে, একা একা, এসেছে। যেন বাইরের হাওয়া নিয়ে এসেছে। এই নির্জন দুপুরের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা ভেঙে যাচ্ছে। দুপুরটা ভাল নয়, দুপুরটা অনিরাপদ, দুঃসহ, যত দুঃস্বপ্ন সে দুপুর-ঘুমেই দেখে। বিকেল হয়ে গেলে মেয়েরা ঘরে ফিরবে, শুধু তার ঘরে নয়, সব ঘরে। আর একটু পরে সন্ধে হবে, অফিস-ফেরত মানুষের ঢল নামবে মহানগরীর বুকে, এই বাড়ির অতীতভরা খাঁ খাঁ দুপুর তখন লেজ তুলে দে দৌড়। তাড়াহুড়ো করে সাবান মাখতে থাকে সে। কলঘর ভরে যায় ল্যাভেন্ডারের গন্ধে।

কল্যাণবাবুর নারীভাগ্য ভাল। মা অবশ্য তাঁর কপালে বেশিদিন টেঁকেননি। কিন্তু যে জেঠিমার কাছে তিনি প্রধানত মানুষ, তিনি তাঁকে চিরকাল বুক দিয়ে আগলেছেন। এক ছেলে হওয়ার দরুন ঠাকুরদাদার ভূ-সম্পত্তির মধ্যে, বরানগরের গোটা একখানা বাড়ি, তা ছাড়া বেশ কিছু টাকাপয়সাও তিনি একলা পাবেন, এ নিয়ে অন্যান্য কাকাদের মধ্যে একটা রাগ-বিরক্তি ছিল। বাবা কর্মোপলক্ষে বিদেশে থাকতেন। ছেলেটি সম্পূর্ণ পরিজনদের করুণানির্ভর, অনেক ক্ষতিই তো হতে পারত। কিছুই হয়নি। জেঠিমা সব সময়ে নজর রাখতেন। বিয়ে যখন করলেন, দেখা গেল স্ত্রীও চমৎকার মানুষ। আমুদে, সংসার চালনায় অতি দক্ষ। এই বাড়ি দুজনে পছন্দ করে কিনলেন। বাড়ি টিপটপ রাখা, পাঁচ বছর অন্তর অন্তর স্বামীকে ধরে-করে চুনকাম, সারাই-ঝালাই করানো—এ সব তিনি একেবারে নিয়ম করে করতেন। কল্যাণবাবু চিরকাল উচ্চপদে চাকরি করেছেন। কিন্তু সৎ মানুষ, বিলাসিতা করার মতো উপার্জন করেননি।

কিন্তু স্ত্রীর প্রবল বাস্তববুদ্ধির জন্য কোনওদিন কোনও অসুবিধের মধ্যে পড়েননি। পিতৃসূত্রে পাওয়া সম্পদ দিব্যি দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে আরতি কতটা ভাল, কতটা উদার ছিলেন তার অবশ্য কোনও সত্যিকার পরীক্ষা হয়নি। কোনও ভাগীদার তো কখনও ছিল না! নিজের বাপের বাড়ির দেশ থেকে প্রায় অনাথা একটি শান্তশিষ্ট রূপসী মেয়েকে বড় ছেলের জন্য সংগ্রহ করে আনলেন। চালাকিটা কি আর তিনি বোঝেননি? গরিবের মেয়ে, মাতৃহীন, তার ওপর দেশঘরের। এত আদর, এমন ঘর-বর পেয়ে সে তো স্রেফ কৃতজ্ঞতাতেই চিরটাকাল নুয়ে থাকবে! ছেলেও শান্ত প্রকৃতির, তাকে যৌবন থেকেই ব্রিজের নেশা ধরেছে, সে বরাবর মায়ের অনুগত। যেমন ছিল তেমনই রইল। তবে বউমা কি আর এত সত্ত্বেও শাশুড়ির হিসেব উলটে দিতে পারত না? কিন্তু দেয়নি। মল্লিকা বড় ভাল মেয়ে। শান্ত, ঘরোয়া, কল্যাণবাবুর সঙ্গে তার আপন কন্যার মতোই সম্পর্ক হয়ে গেছে। তার একটাই মাত্র দোষ। সে বড় ভুলো, অগোছালো, সুগৃহিণী নয়। হতে পারে, শাশুড়ি অতি সুগৃহিণী ছিলেন বলেই সে ওরকম হতে পারল না, আদেশ পালন করতে করতে আদেশ দেওয়া কী জিনিস, পরিচালনা করা কী জিনিস শিখে উঠতে পারল না। তবে এ নিয়ে তাঁরা সবাই, এমনকী, মল্লিকার মেয়েরাও খালি মজাই করে। কোনও নালিশ নেই।

—দাদু আজকে হরিমটর। মায়ের ভাঁড়ারে চাল, ডাল, তেল, আটা, নুন সব বাড়ন্ত। শাকভাত এমনকী নুনভাত খাবারও উপায় নেই!

—সে কী! বউমা! বউমা!—

—কী বাবা!

—তোমার নাকি সব বাড়ন্ত? আমায় বলনি কেন? এনে দিতুম।

—কে বললে আপনাকে এসব?

—ঝুম্পা।

—ওদের আসলে আজকে হোটেলে খাবার ইচ্ছে হয়েছে, তাই আপনাকে গুচ্ছের বাজে কথাগুলো লাগিয়ে গেছে।

ঝুম্পা কিছুটা বাড়াবাড়ি করলেও একেবারে বাজে কথা কিন্তু মোটেই বলেনি। সত্যিই সব রান্না শেষ করে— মল্লিকা ভাত চাপাতে গিয়ে সেদিন দেখে আধ কুনকেটাক চাল মাত্র পড়ে রয়েছে।

একদিন কল্যাণবাবু রাত্রে শুতে এসে দেখেন পরিপাটি করে বেডকভারটি পাতা রয়েছে। কিন্তু তার তলায় তোশক বালিশ চাদর কিছু নেই। রোদে দেওয়া হয়েছিল। তুলতে ভুল হয়ে গেছে। তোলা-পাড়ার কাজটা হয়তো হাতেকলমে তার করার কথা নয়। কিন্তু তত্ত্বাবধানের দায়টা তো তারই। এতখানি জিভ কেটে মল্লিকা বেচারি যখন ছাতে ছুটছে, লজ্জায় প্রায় চোখে জল এসে গেছে। তখন কল্যাণবাবু তার সঙ্গে ছাতে গিয়ে তাকে নিরস্ত করেন। ক্রন্দনমুখী বউমাকে আশ্বস্ত করে, —তোশক, বালিশ নামিয়ে আনেন। কেন যে এত ভুল, কেন যে এত অগোছালোপনা সে কথা কল্যাণবাবু মাঝে মাঝেই ভাবেন। কেন না তিনি জিজ্ঞাসু মানুষ। প্রশ্নহীন নিরুত্তর টাইপের তিনি নন। কেন মেয়েটি এত আনমনা হয়ে থাকে? আরতি যখন বেঁচেছিলেন, তখন এটা ছিল কি না তিনি খেয়াল করেননি। কিন্তু আরতির আড়ালটা সরে যেতেই এই ভুলোমনের মেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকদিন ধরে লক্ষ করে করে, ভেবেচিন্তে শেষে একদিন বউমাকে ডাকলেন তিনি। সন্ধেবেলা। বাড়িতে আর কেউ নেই। ছেলে তো ফিরে কোনওমতে কিছু গলাধঃকরণ করেই তার ব্রিজ-ক্লাবে চলে যায়। ঝুম্পা-মাম্পি হয় পড়তে গেছে, নয় গানটানের স্কুলে গেছে। কবে যে ওদের গান, আর কবে যে ওদের ছবি আঁকা, তিনি হিসেব রাখতে পারেন না। আর ছোট ছেলে কোনওদিনই আটটার আগে ফেরে না। ডাকতে মল্লিকা এসে বলল, এক কাপ কফি খাবেন, বাবা?

—কেন? তোমার খেতে ইচ্ছে হয়েছে? সঙ্গী চাই?

—তাই বলছি না কি? ও মা! —লজ্জা পেয়ে যায় মল্লিকা।

—বললে হয়েছেটা কী? তোমার এক কাপ সান্ধ্য-কফির আকাঙ্ক্ষা হতে পারে না?

—তা নয়।

—তাই-ই। ভাব শ্বশুর-ব্যাটা নিজেরটি ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

—এ মা! ছি ছি!

—ছি ছি বললে কী হবে, আজ অবধি তো তোমাকে স্বীকার করতে দেখলুম না যে তোমার শ্বশুর হল— শ্বশুর উইথ এ ডিফারেন্স। —একটু তরল হলেন কল্যাণবাবু।

—এ মা। আমি আপনাকে বাবা বলে ডাকি, বাবাই ভাবি।

—তা হলে তোমার মন কেন এত খারাপ সে কথা তো বলছ না!

—মনখারাপ? কে বললে? —মল্লিকা আকাশ থেকে পড়ল।

—মন খারাপ নয়?

—না তো!

—তা হলে এমন উদাস দেখি কেন? সব ভুলে ভুলে যাও। সংসারে মন দেখি না কেন মা? ভাল লাগে না?

—ব্যস। অমনি মল্লিকার চোখ ছলছল।

—আমি একেবারে অপদার্থ, বাবা, এবার থেকে চেষ্টা করব।

—শোনো, কল্যাণবাবু উঠে বসলেন— তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। আমি কিন্তু তোমার বিচার করছি না। সেনসার নয় এটা। একেবারেই নয়। সবাইকার সব কিছু ভাল লাগে না, এটা ফ্যাক্ট। আমি জাস্ট জানতে চাইছি। না ভাল লাগে তো আর একটা লোক রেখে দাও। —দৈনন্দিন কাজগুলো সত্যিই বড় ক্লান্তিকর।

মল্লিকা বলল, আরও একটা লোক? তা হলে আমি কী করব? আর তো কিছু করতে শিখিনি!

—বেশ তো! খেদ থাকে তো কিছু শেখো না!

—এই বয়সে?

—শেখার আবার বয়স আছে না কি?

—না বাবা, আমার কিছু শিখতেটিখতে ইচ্ছে করে না। একটু বেরোতে পারলে অনেক সময়ে ভাল লাগে। কিন্তু সে তো আপনার ছেলের সময় হয় না।

—নিখিল তো প্রায়ই থিয়েটার-টার যাবার জন্য সাধাসাধি করে?

উত্তরে মল্লিকা বলল, বাবা, ওর এবার বিয়ে দিন না!

কল্যাণবাবু হেসে বললেন, তাতে নিখিলের সমস্যার সমাধান হবে, তোমার সমস্যার হবে কি?

—হবে! ঠিক হবে। —নিখিলের বিয়ের জন্যে মল্লিকা এমন ধরে পড়েছিল, যে পরদিন থেকেই উঠে-পড়ে লাগতে হল তাঁকে।

কল্যাণবাবুর কোনও ছেলেই খুব একটা কিছু নয়। বিমান অধ্যবসায়ী, বাজে খেয়াল এক তাস ছাড়া আর কিছু নেই। তাসের নেশাটা অবশ্য সে পেয়েছে বাবার কাছ থেকেই। কল্যাণবাবু একসময়ে চুটিয়ে ব্রিজ খেলেছেন এবং বহু পুরস্কার জিতেছেন, তারপরে একটা সময় এল যখন তাস তাঁর একেবারে বিষ লাগতে থাকল। একদম ছেড়ে দিলেন। ক্লাবের আড্ডার বন্ধুরা বলতে লাগল— কী হে কল্যাণ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না কি? তাসের নেশা যার ছোটে তার বউ-বাচ্চা ঘর-সংসারের নেশাও ছুটে গেছে, কিংবা ছুটল বলে। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে কল্যাণবাবু দিব্যি অফিস-বাড়ি, বাড়ি-অফিস করতে লাগলেন। গৃহিণীর সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার করতে লাগলেন, বড় ছেলেটিকে সাধ্যমতো মাজাঘষা করতে থাকলেন, ছোটটি গোঁয়ার। তাঁকে এড়িয়ে গেল। এবং এইসময় থেকেই কল্যাণবাবু টুকটাক পথশিশুদের পড়ানো, ব্লাইন্ড-স্কুলে গল্পের ছলে বিজ্ঞান— এইসব করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা সব ভারতীয়রই ব্যক্তিগতভাবে দেশের মানুষের জন্য কিছু করা উচিত। কেননা এখানে রাজনীতি বলতে যা আছে তা হল আত্মনীতি লুঠেরা নীতি। সরকার একটা জ্ঞানপাপী অকর্মা। গোষ্ঠীর ভাঁড়ার ভর্তি করার উদ্দেশ্য নিয়ে চলে। কবে যে বিমান বাবার ক্লাবে ঢুকে গেছে, শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলেছে তিনি জানতেনও না। এক তাসুড়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে সে-ই বলল —'তোমার

ছেলে যে কার্লবার্টসন-ফন্ ব্রিজতত্ত্ব সব গুলে খেয়েছে হে!' তা খেলুক। শুধু সময় কাটাতে তো খেলছে না। বুদ্ধির চর্চা করতেই খেলছে। তবু তাসের নেশায় সংসারকে যে সে খানিকটা অবহেলাই করে এটা তাঁর ভাল লাগে না। মেয়েদু'টিকে গোড়ার দিকে নতুন নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় খুব দেখাশোনা করত। এই বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। এই গল্পের বই কিনে দিচ্ছে। এই এনসাইক্লোপিডিয়ার পুরো সেট এনে ফেলল। এখন উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে। এক ধরনের লোক আছে মুড়ির মতো, একটু হাওয়া লাগল কি না লাগল মিইয়ে যায়। এখন নাতনিদের তিনি খানিকটা দেখেন। বাকিটা কোচিং। তবে এক বছর অন্তর এল.টি.সি-র দরুন পুরো পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়াটা বড় ছেলে নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছে। এসব সময়ে মল্লিকাকে খানিকটা সজীব, খুশি খুশি লাগে। এটাই তা হলে ওর আসল সমস্যা! একাকিত্ব! দুই মেয়ের বাপ হওয়া ছেলেকে কি আর বলা যায় বউয়ের দিকে একটু মন দাও বাবাজীবন! কিন্তু কথাটা তাঁর বলতে ইচ্ছে করে। অনেক কষ্ট করে— আত্মসংবরণ করেন। স্ত্রীর প্রতি মনোযোগের অভাব তাঁর তো কোনওদিন হয়নি! তাঁর স্ত্রী বলতেন— সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে।

নারীভাগ্য ভাল হলে পুরুষের দু' রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। একটা হল মেয়েদের পড়ে-পাওয়া বলে গণ্য করা। বিমানের মা সুদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ, স্নেহশীল ছিলেন। —স্ত্রী, রূপসী, লেখাপড়া জানে, অনুগত, সে-ও স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ, ফলে বিমানবাবু ধরেই নিয়েছেন মায়েরা ও স্ত্রীয়েরা এইরকমটাই হয়ে থাকে। হওয়া উচিত। সুতরাং তাদের জন্য আলাদা করে কোনও ভাবনা-চিন্তা খাতির-খয়রাত করবার দরকার নেই। মেয়েমাত্রই এইরকম হয়। ঝুম্পা-মাম্পিও বাবার দেখাশোনা আদর যত্ন ছাড়াই এমনটাই হয়ে উঠবে। বিমান তাদের বিশেষ আদর দিক বা না দিক তারা বাবাকে ঠিকই যত্নআত্তি, সেবাশুশ্রূষা করবে। কল্যাণবাবুর এটা ভাল লাগে না। তাঁর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াটা হয়েছে দ্বিতীয় রকম। মেয়েদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং করুণা। কোনও মেয়েকেই তিনি ঠিক 'খারাপ' ভাবতে পারেন না। কেউ যদি নিজেকে 'মন্দ' প্রমাণ করে তা হলে সেটা হল ঘটনাচক্র। এমনটাই তাঁর থিয়োরি।

তবু বিমান কিছুটা তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু নিখিলকে তিনি ততটা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন না। একটু বড় হতে না-হতেই তার বিশাল নিজস্ব বন্ধুবাহিনী হয়ে গেল। লেখাপড়ার জন্যেও সে কখনও বাপের ধার ধারেনি। সবই বন্ধুদের পরামর্শে ও সাহায্যে। বেসরকারি অফিসে এগজিকিউটিভ পদে প্রতিষ্ঠিত হতে তার একটু সময় লাগছিল। বিমানের যে বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, নিখিলের সে বয়সটা পার হয়ে গেল। তারপর স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি খানিকটা দমেও গিয়েছিলেন। বড় বউমার ব্যস্ততায় তিনি নিখিলকে ডেকে পাঠালেন। উঠতে-বসতে তাঁকে তাড়া দিচ্ছিল মল্লিকা।

—তোমার এবার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নিজের কেউ পছন্দটছন্দ আছে।

—না।

—তা হলে কি আমরা দেখব?

—হ্যাঁ।

—দেখে প্রাথমিকভাবে পছন্দ হলে তোমাকে বলব দেখে আসতে, না কী?

—হ্যাঁ।

—কোনও বিশেষ চাহিদা আছে তোমার?

—না।

একাক্ষরী এইমতো উত্তরে কল্যাণবাবু আরও দমে গেলেন। কিন্তু দু-চারটি পাত্রীকে ছেলে অপছন্দ করায় বুঝলেন— না, যতটা উদাসীন ভেবেছিলেন, বাবাজি ততটা নয়। শেয়ানা আছে।

জিনাকে প্রথমে তিনি আর মল্লিকা দেখতে গিয়ে ভীষণ পছন্দ করে এসেছিলেন। নিখিলেরও পছন্দ হল।

মেয়েটি মল্লিকার ঠিক উলটো। পরিপূরক যাকে বলে। কল্যাণবাবুর ঘর হাসিতে খুশিতে ভরে উঠল। সবাইকার সঙ্গেই জিনার বন্ধুত্ব। ঝুম্পা-মাম্পি তার ডান হাত বাঁ হাত। একের নম্বরের বন্ধু মল্লিকা। বিমানকেও সে রেয়াত করে না। 'বটঠাকুর' বলে ডাকতে শুরু করে তাকে হাসিয়ে ছাড়ল। বিমান বলল 'দোহাই বউমা সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বাঁদর যা খুশি বলো আমাকে, ওই বটঠাকুরটি বলো না।'

—আপনিও তা হলে বউমা বলবেন না। আর ঘোমটা দিয়ে থাকবেন না। একটু সকাল সকাল বাড়িও আসবেন, কেননা আমার ঠিক ন'টায় খিদে পায়। আর... বিমান বলল, তোমার এই শর্তাবলির কি কোনও ল্যাজামুড়ো আছে? না এ চলবেই?

মল্লিকা তো আত্মসমর্পণ করে বসেই আছে। ইগো বলতে মেয়েটার কিছু নেই। কিন্তু জিনার স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন। এত সহজে সে দিদিভাইকে ওপরে বসাল অথচ তাকে সব কিছুতে সাহায্য করে সংসারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দিল যে তার মুনশিয়ানার বাহবা দিতেই হয়। একদিন দেখলেন, বিমান দুই বউমাকে নিয়ে থিয়েটার যাচ্ছে, একদিন কোনও মিউজিক কনফারেন্সে গেল। কল্যাণবাবুকে নিয়েও সে যথেষ্ট টানাটানি করে। কিন্তু তিনি জানেন, বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। জিনার ব্যবহারে লোক দেখানো কিচ্ছু নেই, এ বিষয়ে তিনি আঠারোআনা নিশ্চিত। কেননা তার দমদমের বাপের বাড়ি একটা নামকরা হুল্লোড়ে বাড়ি। গিয়ে দেখেছেন, মানুষগুলি কতকগুলো নিয়ম মেনে নিজেদের বেশ একত্রে ধরে রেখেছেন। জিনার জ্যাঠামশাই খুব জমাটি লোক। বলেন— বুঝলেন দাদা, আমাদের পিতৃদেবটি ছিলেন বিশেষ শেয়ানা, না হলে পাঁচটি পুত্তুর একেবারে এক পদের হয়? ভাবতে পারেন পাঁচটি ভাই-ই আমরা ইন্দিরা গান্ধীর ন্যাশন্যালাইজেশনের সুফল পেলুম একেবারে নিক্তি মেপে? বড় দু'জন আমরা অয়েলে, ছোট তিনটি ব্যাংকে। দুটি বোন, কেউ কারও চেয়ে কম বুঁচি নয়। ঈশ্বর এবং পিতৃদেব উভয়ে ষড়যন্ত্র করে যদি একান্ন পীঠের আইডিয়্যাল কনস্টিট্যুশন তৈরি করে থাকেন তো একটা প্রমোদ বা একটা প্রবীর নাগের বা তাদের

নাগিনীদের সাধ্য কী তা নাকচ করে?

জিনার জেঠিমা-ও খুব রসিক মানুষ। তিনি বললেন—শুধু তাই না কি? জানেন দাদা, আমার আর মেজর বিয়ে হয়ে গেছে, সেজর জন্যে কত অপ্সরী, বিদ্যাধরী আসছে। কে কলেজ লেকচারার, কে ডক্টরেট, কে ডাবলু বি. এস. এস, কে দুধেআলতা, কে বা তপ্তকাঞ্চন, ইনি ঘটককে কী বললেন জানেন? —উহুঁ, এসব চলবে না। ঘটক বললে—পাত্রী খারাপ হল? কত খুঁজেপেতে আনলুম। তা ইনি বললেন—পাত্রী সব সোনার চাঁদ। রাজরানি হোক। সে কথা নয়, আমার আর আমার মেজভাইয়ের পত্নী উভয়েই খেঁদিবুঁচি, কোনওমতে পাস। তা সেজভাইয়ের কি বউদিদিদের মনে দুঃখু দিয়ে অপ্সরী বিদুষী বিয়ে করা উচিত? ভাল করে দেখে শুনে পাঁচাপাঁচি আনুন। পাঁচাপাঁচি আনুন।

সেই বাড়ির মেয়ে হয়ে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের ম্যাজিক তাঁর ছোট বউমা আয়ত্ত করেই এসেছে। তার ওপরে, সে কোনওদিক দিয়ে সত্যি সত্যি লঘিষ্ঠ নয়। গুণের সঙ্গে যদি কাণ্ডজ্ঞান ঠিক পরিমাণে মেশে তা হলে একটা জিনা তৈরি হয়। কল্যাণবাবু বড় বউমাকে ভালবাসেন। ভালবাসার সঙ্গে একটু করুণা, মমতা মিশে থাকে। কিন্তু ছোট বউমাকে তিনি বেশ অ্যাডমায়ার করেন, গর্ব করার কারণ খুঁজে পান। তবে তিনিও খুব কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বিবেচক মানুষ, মনের কোনও ভাবই কখনও মুখে প্রকাশ করেন না। আরতি থাকলে হয়তো কোনও দাম্পত্য আলাপের দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলতেন। কিন্তু সে-পরিস্থিতি না থাকায় তাঁর ব্যবহারে বিচক্ষণতা, সমদর্শিতা, প্রসন্ন সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া শক্ত।

তবু যে, ছোট পুত্রের বিয়ের বছর দুইয়ের মধ্যে বাড়ি ভাগ করতে হল, তার জন্যে কল্যাণবাবু পুত্রবধূদের দায়ী করেন না। সমস্তটাই তাঁর গোঁয়ার, দুর্মুখ ছোট পুত্রেরই কীর্তি। এখানে আর দ্বিতীয় কোনও পক্ষ নেই। একটা সুখী পরিবারের মধ্যে থেকেও বেয়াড়া সন্তান বেরোতে পারে দেখা যাচ্ছে। চমৎকার শান্তি আর আনন্দের পরিবেশ ছিল। নিখিল চন্দরের সেটা পছন্দ হল না। তার বউ যে সবার বন্ধু হবে, সবার সঙ্গে হেসেখেলে থাকবে এটা তার চক্ষুশূল হল। সে জিনাকে তার একার সম্পত্তি করে রেখে দিতে চায়। এমন অশান্তি, অভদ্রতা শুরু করল যে বিরক্ত হয়ে তিনি বাড়ি ভাগ করে দিলেন। তাঁর ঘরটা পড়েছিল জিনাদের অংশে। ছেড়ে চলে আসছিলেন। ছোট বউমাই কেঁদে কেটে আটকাল। পুরো ব্যাপারটা তাঁর অত্যন্ত অরুচিকর ঠেকেছে। অরুচিকর এবং অপ্রয়োজনীয়। সন্দেহ নেই, অন্যদেরও তাঁরই মনোভাব। ঝুম্পা-মাম্পির স্বতঃস্ফূর্ততা কমে গেছে। তারা আর কাকিমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে বলে মনে হয় না, বিমান আবার নিজের অ্যালফা-বিটা ক্লাবে ফিরে গেছে, মল্লিকা একা। জিনা আরও একা। কেননা, আশ্চর্যের বিষয়, নিখিল জিনাকে যৌথ পরিবার থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেললেও, খুব যে বউকে সময় দেয়, এমন মনে হয় না। আগে ফিরত নটা, এখন দশটা, কখনও কখনও এগারোটাও হয়ে যায়। আগেও জিনাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই বেরোত, এখনও বেরোয়, নতুনের মধ্যে, বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের খুব ডাকে। এবং বছর পাঁচ-ছয় হয়ে গেল ওদের কোনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। অর্থাৎ

'ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস' বলে আপ্তবাক্যটির যে আধুনিক পাঠ তৈরি হয়েছে 'ম্যান প্রপোজেস, উয়োম্যান ডিসপোজেস' বলে, তার একটি আধুনিকতর ও বিশেষ পাঠ তৈরি হতে দেখলেন কল্যাণবাবু! 'ওয়ান ম্যান প্রপোজেস, অ্যানাদার ম্যান ডিসপোজেস।' অবশ্য তাঁর কোনও কৃতিত্ব কোনওদিনই সেভাবে ছিল না। পরিবারটা তাঁর আপনা থেকেই হয়ে উঠছিল। তাঁর ভূমিকাটা ছিল শুধু তাকে রক্ষা করবার। সে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন। সবাইকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। কোনও জায়গাতেই কঠোর কর্তৃত্ব ফলাতে যাননি। তাঁরই ছোট পুত্র যে সেই সংসারকে সম্পূর্ণ বিনা কারণে এভাবে দু টুকরো করে দেবে, দিতে পারবে, এ তিনি কখনও ভাবেননি। হ্যাঁ, কোনও না কোনওদিন হয়তো দরকার পড়ত। দুই ভাই যখন। তখন ভবিষ্যৎ হাঙ্গামা এড়াতে তিনি নিজেই হয়তো দুজনের অংশ আলাদা করে নির্দেশ করে দিয়ে যেতেন। কিন্তু নিখিল যা করল, তার কোনও মানে হয় না। সেই নিখিল তাঁর আঙুল ধরে হেদুয়ায় বেড়াতে যেত। সেখানেই সাঁতার শিখল বেশ ছোট বয়সেই। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ডাইভ খাওয়া না দেখলে বাবুর রাগ হত। আর ঠাকুর দেখতে যাওয়া? ওরে বাবা! 'ও বাবা, ফায়ার ব্রিগেড হয়নি।' 'ও বাবা মহম্মদ আলি পার্কে রাত্তিরবেলায় নিয়ে চলো।' 'ও বাবা কাল সাউথে নিয়ে যেতে হবে!' কত বায়না! কবে থেকে, কখন থেকে, কেন যে বাপের সঙ্গে তার অসম্পর্ক তৈরি হল তিনি ভেবে পান না। বড় হয়ে গেলে ছেলেরা আর বাপের কাছে ঘেঁষে না, তাদের নিজের নিজের মতো চলতে দেওয়াই ভাল, এটা তিনি মানেন। এমন সেন্টিমেন্টাল লোক নন যে কথায় কথায় অভিমান করবেন। কিন্তু নিখিলের আচরণটা তাঁর হিসেবে মেলে না। জিভের ভেতর একটা বাজে কষা মতো স্বাদ বরাবরের জন্যে রেখে দিয়ে গেছে যেন।

—জিনা-আ-, জিনা-আ—উগ্রমেজাজি চিৎকারটা মাঝের দরজা দিয়ে ঢুকে ফাটা বোমার ধোঁয়ার মতো ঘরে ঘরে ঢুকে যায়, সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নীচে নামতে থাকে। মাম্পি ঝুম্পার দিকে চায়, ঝুম্পা ছুটে বেরিয়ে যায়। তার হ্যান্ডলুমের কাফতান পায়ের ওপর কড়া ঝাপটা মারে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডাকে—কাকি-ই, ও কাকিমা! তারপর তরতর করে নীচে নেমে যায়, ঝংকার দিয়ে ওঠে—উঃ কাকিমা, ওদিকে যে পারা ক্রমে চড়ছে। শুনতে পাচ্ছ না! কতবার বলেছি না, কাকা থাকলে এদিকে আসবে না!

জিনা ধীরেসুস্থে বেরিয়ে, হঠাৎ দুপদাপ করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকল। পেছন ফিরে ফিক করে হেসে বলল—দেখেছিস? হনুমতী। চিলিম্পা।

দরজা পার হবার সময়ে তার গতিবেগ প্রায় মেল-ট্রেনের সমান হয়ে যাচ্ছে দেখা গেল। ঝুম্পা তার মায়ের দিকে তাকিয়ে অর্ধেক-রাগ অর্ধেক-মজায় বলল, উঃ কাকিমাটা পারেও। তারপরে সুর পালটে বলল, রোজ রোজ ভাল লাগে না। তোমরা না...

মল্লিকা বলল, আমি কিন্তু ওকে ডাকিনি। ও-ই চেতল মাছের গাদা নিয়ে এসে বসল। ছাড়িয়ে দাও। আমি কাঁটা ছাড়াতে পারি না, করিনি কখনও...।

—আর সময় পায় না?

—আহা মাছটা তো সকালেই আসে, তোর ওই কাকাই তো শখ করে এনেছে।

হন্তদন্ত হয়ে জিনা ঘরে ঢুকতে তোয়ালে পরা নিখিল ফেটে পড়ে—আমি বলে অফিস বেরোচ্ছি, এখন তোমার গালগপ্পো মারবার সময়?

—গালগল্পের চিতলমৎস্য কে এনেছে? কাঁটা ছাড়াচ্ছিলুম! কণ্টক!

—গুষ্টির পিণ্ডি!

—রাতে যখন পড়বে পাতে তখন বলো পিণ্ডি না মন্ডা!

—আমার রুমাল?

—এই তো।

—গ্রে মোজা-জোড়া?

—জুতোর সঙ্গে রেখেছি, নীচে।

—শার্ট? প্যান্ট?

—কী আশ্চর্য! এই তো সামনে রেখেছি, দেখতে পাচ্ছ না?

—তুমি যা রাখবে তাই পরতে হবে? পিন-স্ট্রাইপটা দাও, সাদার ওপর নীল।

ঝট করে আলমারি খুলে ফট করে ইপ্সিত শার্ট বার করে দেয় জিনা।

—আর কিছু?

—কেন? ও বাড়ির রান্নাঘরে মন পড়ে আছে নাকি দ্রৌপদী মহারানির।

জিনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসে। আর কী-ই বা সে করতে পারে! কারও রাগী মেজাজের সামনে মুখে মুখে তর্ক করতে নেই, জবাব দিতে নেই। দমদমের বাড়িতে দেখেছে জেঠু রেগে তুলকালাম করলে জেঠিমা এক্কেবারে চুপ। আবার

জেঠিমা রাগলে মা-কাকিমারা চুপ। এ ওর দিকে আড়ে আড়ে চায়। কেউ কান্না চাপছে, কেউ হাসি চাপছে। কিন্তু ভুলেও একটি কথা না।

নিখিলবাবু শার্ট বদলালেন, তোয়ালের ভেতর দিয়ে প্যান্টফ্যান্ট গলালেন। একটু যে বে-আব্রু হলেন না তা নয়, সে সময়ে জিনা চট করে কড়িকাঠের দিকে চোখ ফেরাল। চুলে একবার ব্রাশ চালালেন। গরগর করে বললেন, টাইটা তো বউরাই বেঁধে দেয় জানি।

—বউরা গলায় গামছা বাঁধে, আর নাকে দড়ি। টাইটা আজ নিজেই বাঁধতে হবে আজ্ঞে—সাতসকালের তুলকালামের জন্য জিনা তার বরকে এইটুকু দণ্ড বিধান করে।

—ও—আয়নার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সটাসট টাইটা বেঁধে ফেলতে লাগলেন নিখিলচন্দ্র। বাঁধতে বাঁধতে মুরুব্বি স্টাইলে বললেন, ভাসুরঠাকুরের টিফিন তৈরি করার জন্যে তোমায় আনা হয়নি। শ্বশুরঠাকুরকে ফুলতুলসী দেবার জন্যেও না। আনা হয়েছে এই নিখিলচন্দ্রের জন্যে, নিখিলচন্দ্রের সুখসুবিধের জন্যে।

জিনা বলল, যা বাব্বা, আমি তো ভেবেছিলুম আসছি আমার নিজেরই সুখসুবিধের জন্যে। কাটবার জন্যে বেশ ভারী একটা পকেট পাব, ঠোনা মারবার একটা গাল পাব, চাপবার একটা কান পাব, তেমন দরকার পড়লে ঘাড়টা মটকাতেও পারি—

নিখিলচন্দ্রের মুখে একটু হাসি ফুটব ফুটব করেও শেষ পর্যন্ত ফুটল না। বললে, ও বাড়ির দরজাটা কি সিল করে দেব?

—কেন জানতে পারি?

—সেই কথায় আছে না, ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে তোরে পেলাম কাছে।

—ভূতটা কে? দাদা? দিদিভাই? ওদের ওপর তোমার এত রাগ কেন বলো তো? নিজেরই তো দাদা-বউদি! তোমার কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে?

—এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি অনবরত জিনিস চলে যাচ্ছে। এই চেতল না পেতল সেটাও যাবে।

—যাবেই তো। দিদিভাই কদিন আগেই তো কচুরশাক দিয়ে গেল। খাওনি?

বিদ্রূপ ফুটে ওঠে নিখিলচন্দ্রের মুখে—কচুরশাক? কচুরশাক মাঠেঘাটে ফলে থাকে জিনুরানি, আর চেতল মাছ নগদ আড়াইশো টাকা কিলো দরে বাজার ঢুঁড়ে কিনে আনতে হয়। উপরন্তু এপারে মাত্র দুজন, ওপারে শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পাঁচজন।

জিনা ছি ছি করে ওঠে। বলে, তুমি এইসব মেয়েদের ব্যাপারে নাক গলাবে না তো! আমার ঘেন্না করে। যা দিচ্ছ তাইতে আমি চালাতে পারলেই তো হল? বেশি চেয়েছি তোমার কাছ থেকে? ইন ফ্যাক্ট তুমি এগজ্যাক্ট কত মাইনে পাও তা পর্যন্ত আমি জানি না। জানি?

উত্তরে নিখিল বলল, হুঃ!

নিখিল বেরিয়ে গেলে জিনা চটপট রান্না সেরে ফেলল। এরপর খাওয়া ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি তার আর কোনও কাজ নেই। চানটা সে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে করে। চানের আগে পরে, যোগাসন, হাত-পা ঘষা, চুলের পরিচর্যা অনেক রকম আছে তার। নতুন বাথরুমটা ভাল বানিয়েছে তার বর। একটা ছোটখাটো ঘরই। বাথটব বসেছে একটা। ডুবে চান করার মজা এই যে উঠতে মনে থাকে না। জলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবনা আসে। শুধু চানই বা কেন, কোনও কাজই তার বহতা চিন্তাস্রোতকে বন্ধ করতে পারে না। আশাবাদী, ইতিবাচক চরিত্রের মানুষ সে। অথচ খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়। এটা তাদের পরিবারেরই চরিত্র। মুশকিল হচ্ছে আশাবাদ-এর 'আশা' আর ইতিবাচকের 'ইতি'টুকু যদি জীবনে একটা কথার কথা মাত্র না হতে হয়, তা হলে সেগুলোর ওপর তার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দরকার। কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। জিনার 'কিছু-না-মনে-করা' 'আচ্ছা-বাবা-ঠিক-আছে' 'সব ঠিক হয়ে যাবে'... আনুগত্য, রসবোধ কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সে অনেক কিছু মেনে নেয় বটে, কিন্তু সেটা বোকা বলে নয়, অলস বলেও নয়। ভাল পাসটাস করেছে, গান শিখেছে, অথচ কোনও কেরিয়ারে তার মন নেই। অবশ্য, পাশের বাড়ির মিতালিদির মতো গোল্ড মেডালিস্ট হলে, কিংবা বন্ধু সুনন্দিনীর মতো স্বর্ণকণ্ঠী হলে কী হত বলা যায় না। সে যতটুকু ভাল, তাতে করে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তাকে অনেক লড়াই করতে হবে—এই তার ধারণা। জিনা জানে না, সব ব্যাপারেই 'ভাগ্যং ফলতে' বলে একটা কথা আছে। হয়তো মিতালিদির কিছু হল না, সুনন্দিনীর কিছু হল না অথচ জিনারই হয়ে গেল, এরকমটা ঘটতেই পারত। কিন্তু সে চেষ্টার পথে সে যায়ইনি। নাগ-বাড়ির বেশির ভাগ মেয়ের ক্ষেত্রেই কুড়ি-একুশ বড় জোর বাইশ হলেই পিতৃব্য-মহলে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। যা খুশি করো, কিন্তু আগে আমাদের দায় থেকে মুক্ত করো—এই তাঁদের বুলি। জিনার এক দিদি বিয়ের পর এম ফিল করে কলেজে পড়াচ্ছে, আর এক দিদি স্বামীর সহায়তায় আর্ট-স্কুল খুলেছে। কিন্তু বেশির ভাগই বিশুদ্ধ গৃহিণী। কারওই সে নিয়ে খেদ নেই। বেশ আছে। কাজেই জিনার যখন অতি সহজেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এগজিকিউটিভ বর জুটে গেল, ঘর পছন্দ, দু পক্ষে চমৎকার মনের মিল তখন কেউই দ্বিধা করেনি। জিনাই একমাত্র এত বড় বর বিয়ে করতে চায়নি। এগারো-বারো বছরের বড়? ওরে বাবা, সে তো একটা লোক! নাগ-বাড়িতে সব রকমের নজিরই আছে। ছোট কাকা নিজেই একটি কেস। বললে—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হবার এমন চান্স আর পাবি না। নিয়ে নে। সারা জীবন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারবি, তোর কাকি যেমন আমায় ঘোরাচ্ছে।

এখন, কে কাকে ঘোরাচ্ছে ছোট কাকাকে ডেকে এনে দেখাতে ইচ্ছে যায়। এইজন্যেই জিনার ধেড়ে কার্তিক লোককে বিয়ে করতে অনিচ্ছে ছিল। সব বিষয়ে কর্তাত্বি ফলাবে। সব সময়ে একটা হামবড়া আদেশের ভাব। ধুত। ঝুম্পা-মাম্পি-দিদিভাইকে নিয়ে কী চমৎকার একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছিল তাদের, উপদেষ্টার ভূমিকায় দাদা আর বাবা। এই বেরসিক লোকটা সব ভেস্তে দিল। কেন রে বাবা? সে কী সুন্দর মাম্পিকে স্কুল থেকে আনতে যেত এক এক দিন। ওই ছুতোয় একটু

বেরোনো আর কি। পায়ে যে মরচে পড়ে গেল! তা ফট করে একদিন হবি তো হ, সাদা মাতিজের সামনে। মাতিজে স্টিয়ারিং ধরে নিখিলচন্দ্র। একেবারে ক্যাচ, কট, কট। তক্ষুনি দুজনকে গাড়িতে তুলে নিল, পৌঁছে দিয়ে ডাঁটের মাথায় সাঁ করে চলে গেল, তারপর রাতে বাড়ি ফিরে সে কী তুলকালাম! আমার বউ কারও দাসী-বাঁদি নয়, মেয়ে-আনুনি ঝিগিরি তাকে দিয়ে করানো চলবে না। জিনা যত বলে আমি নিজে গেছি, কেউ আমাকে বলেনি, ততই সে ঝটকা মারে। জিনা বলল—আমি তবে করবটা কী? চুপচাপ বসে থাকব? উত্তর হল—বসে থাকতে না পার তো শুয়ে থেকো।...কী লজ্জার কথা! কী দুঃখের কথা! বাবা বাড়ি ছিলেন। তাঁর মুখের ওপর সুদ্ধু চোপা করল। তারপরই বাবা দু ভাইকে আলাদা করে দিলেন।

কেন? এটাই জিনা অবাক হয়ে ভাবে। জিনার জন্যে ভেবে ভেবে ঘুম হচ্ছে না, কী বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকতে পছন্দ করছে এমনটা তো নয়। কতটুকু থাকে বাড়িতে? নটায় বেরিয়ে আবার নটায় ফেরা। বেশির ভাগ দিনই আরও রাত হয়। অফিসের পর ক্লাবে যায় নাকি এক এক দিন, ক্লায়েন্টক্লায়েন্টের সঙ্গে নাকি সর্বক্ষণই দরকার তার। শনি-রবিবারে অবশ্য প্রায়ই তাকেও ক্লাবে নিয়ে যায়। কিন্তু এই যে এতক্ষণের অনুপস্থিতি এতে জিনার খারাপ লাগছে কি না, সে কেমন ছিল এ নিয়ে তো ভদ্রলোকের কোনও মাথাব্যথা নেই? দমদমে, কি কোনও বন্ধুর বাড়িটাড়ি যেতে চাইলে কোনও আপত্তি নেই। খালি নিজের দাদা-বউদিদি আর তাদের পরিবারকেই সে একেবারে দেখতে পারে না। তার বিয়ের আগে কোনও টেনশন ছিল না। দুই ভাইয়ের সম্পর্ক অবশ্য কোনওদিনই খুব স্বাভাবিক নয়। দাদা এমনিতেই খুব কম কথা বলেন। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বয়সের তফাতও অনেকটা। কিন্তু মাত্র দুটি ভাই, তাদের মধ্যে কোনও আদানপ্রদান নেই এটা তার কেমন অদ্ভুত লাগে। কিন্তু এরা এইরকমই। বড় হয়ে যাবার পর যে-যার নিজের জগতে বাস করে। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কোনও মনোমালিন্য ছিল বলে তার মনে হত না। দাদা হয়তো কোনওদিন খেতে বসে বললেন, অমলকে তোমার মনে আছে?

ভাই বলল, কোন অমল?

—ফুটবলের। তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তোমার কথা খুব জিজ্ঞেস করছিল।

—আচ্ছা! আজকাল আছে কোথায়?

—জে সি টি-তে আছে বলেই তো জানি।

ব্যাস।

আবার কোনওদিন ছোট ভাই উবাচ—

—তোমাদের ক্লাবের শিবেন ব্যানার্জি কেমন লোক, জান?

—কেন? মানে কী সেন্সে!

—এই অনেস্ট কি না।

—খুব একটা মনে হয় না। কেমন একটু সিক্রেটিভ টাইপ। কেন?

—আমাদের অফিসে একটা টেন্ডার ধরেছিল, খুব ঢুকতে চাইছে, ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে।

—ওহ্।

অর্থাৎ মনোমালিন্য থেকে কথা বন্ধ এমনটা নয়। দুজনের জগৎ, বন্ধুবান্ধব, ভাল লাগার জিনিস সবই এত আলাদা যে কোনও বিষয় নেই ওদের কথা বলার। জিনাদের ভাইয়েরা একত্র হলেই ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে তাদের উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। রাগারাগিও হয়ে যায়। হাতাহাতির ঠিক আগেটায় জেঠিমা কি মা কি কাকিমা প্রত্যেকের মাথায় একটা কেটলি করে একটু একটু জল ঢেলে দিয়ে যান।

—এটা কী হল?

—এ হেহে আমার নতুন পাঞ্জাবিটা...

—কী হল কাকিমা, মোস্ট আনপার্লামেন্টারি। এই শীতে মাথায় হঠাৎ ঠান্ডা জল...

—তা হলে কি গরম জল দেব বলছিস?

—তাই বলে কথা বলব না?

—কথা বলতে কেউ বারণ করেনি বাবা, মারমুখো হতে শাপশাপান্ত করতে বারণ করা হচ্ছে...

—মারমুখো? কে মারমুখো হল?

—শাপশাপান্ত? সে আবার কী?

পাঁচ-ছয়জন নানা বয়সের 'ইয়াং ম্যান' আকাশ থেকে পড়ে।

কোনও তর্কের মধ্যে আর মাতৃকুল ঢুকতে চান না। মারমুখো কে, শাপশাপান্ত কী, এসব অব্যাখ্যাত থেকে যায়।

শ্লেষের হাসি হাসতে হাসতে 'ইয়াং'রা খাওয়া শেষ করে। সকলেই একমত এই ওল্ড 'জেনারেশন'কে নিয়ে আর পারা গেল না। একটা 'ফ্রেন্ডলি' হচ্ছিল, বুঝল না।

আমাদের ইডিয়ম তোমরা বুড়ো-বুড়িরা বুঝবে না...

ছোট কাকিমা আস্তে করে ফুট কাটবে—ইডিয়টের আবার ইডিয়ম—পেছন থেকে, নিরাপদ দূরত্ব ও আড়াল থেকে।

ব্যস, আর যায় কোথায়। বিরোধীরা সব এককাট্টা। —কে বললে? কেন বললে? তাকে সারেন্ডার করা হোক। না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে...আসলে ওদের ধারণা বোনেরা কেউ বলেছে। জিনার ওপরেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ। বাতাবরণ ঘোরালো হতে জেঠিমা তাঁর চওড়া ভোমরা পাড় দাঁতালো শাড়ি আর জমজমে গলা নিয়ে ফ্রন্ট লাইনে এগিয়ে আসবেন—এই নে, আমি বলেছি বেশ করেছি, করছি সারেন্ডার। কী করবি কর। শেষ পাতে আলুবখরার চাটনি ছিল, পাবি না।

জিনা এইরকম সম্পর্ক দেখেছে। হুল্লোড়, মজা, এসব না-ই থাক। সম্পর্কটা তো থাকবে? সে নিখিলকে জেরা করতে ছাড়ে না।

—প্রথম প্রথম তো দেখেছি একসঙ্গে খেতে বসা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কথাও বলছ পরস্পর। ক্রমশ কী হল?

—ধান্দাবাজি আমার ভাল লাগে না।

—ধান্দাবাজি কার?—জিনা আকাশ থেকে পড়ে।

—ওই তো। রান্না করছ, পরিবেশন করছ, বাসন মাজছ, সবই তো আস্তে আস্তে মিসেস নিখিলের কাঁধে উঠে আসছে।

—ওমা! বাসন মাজলাম কোথায়? সেদিন আমার নিজের বোনচায়নার ডিনার সেট আমি নিজে পরিষ্কার করে নিয়েছি। ডলিকে দিলে যদি ভেঙে যায়? ঝুম্পাকেও হাত লাগাতে দিইনি। আর রান্না? ও তো সবই দিদিভাই করছে, আমি একটু সাহায্য করি শুধু, পরিবেশনটা আমিই করি তাই বাড়িতেও করতুম, ভাল লাগে আমার।

—ও-ই করো! স্টেটাস যে বোঝে না, তাকে কী বোঝাব?

—স্টেটাস? সেদিন কোথায় পড়ছিলাম ইন্দিরা গান্ধী সুদ্ধু রাতে ডিনারের সময়ে টেবিলে বসে ছেলেদের এটা-সেটা পরিবেশন করতেন। এসব কেউ আমার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। ছিঃ ছিঃ!

—এখন কি তুমি আমায় ম্যানার্স শেখাবে না কি?

জিনা দুঃখিত গলায় বলেছিল, বিয়ের পর স্বামীদের অভদ্রতার দায় বউয়েদের ওপরেই পড়ে, এটা অন্তত মনে রেখো।

—কেন, দিনরাত যে সব্বাইকে তেল মারছ?

জিনা মনে মনে হাসে। মনে মনেই বলে তোমাকেও কম তেল মারি না বাবা। ফল হচ্ছে না কেন কে জানে!

অথচ সে বিয়েটাতে প্রায় এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল একটু বেশি স্বাধীনতার জন্যে। তাদের দমদমের বাড়িতে কতকগুলো অদৃশ্য, অকথিত নিয়ম আছে। সেগুলো মেনে চলতে হয়। কেউ জবরদস্তি করে না, কিন্তু সবাই-ই মানে। নিয়মগুলো বলাই বাহুল্য মেয়েদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রয়োগ হয়। যেমন বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও রাত কাটানো চলবে না, অর্থাৎ এক্সকার্শন—নো। দেশান্তরে, প্রদেশান্তরে, বাড়ি ছেড়ে একা একা পড়াশোনা কাজকর্ম করতে যাওয়া চলবে না। তার পিসতুত দিদি ইয়েল য়ুনিভার্সিটি থেকে ডাক পেয়েছিল, ভাল স্কলারশিপ, উপরন্তু পার্ট টাইম কাজ ক্যাম্পাসের মধ্যে। শুনতে পেয়ে জেঠু গোটা পঁচিশ যুবকের ছবি বায়োডেটা সহ নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন। ক্ষমতা আছে বটে মানুষটার। দিন দশেকের মধ্যে বিদেশ যাবে পাত্রী খুঁজছে এমন পঁচিশটা কেস জোগাড় করেছেন।

বললেন—নাও পছন্দ করো।

—কী ব্যাপার? কাকে পছন্দ? কেন পছন্দ!

—রুমা বিলেত যেতে চায়, এই তো কথা! তা যাক, এইসব সোনার চাঁদেদের খবর এনেছি। এদের কারও সঙ্গে সিদুঁরটিঁদুর পরে একেবারে যাক।

—সে কী? ইয়েল-এ যে...পিসেমশাই হতবাক।

—আচ্ছা সুবীর, তোমারও যা বয়েস আমারও তাই বয়স, আমিও য' টাকা মাইনে পাই তুমিও ত' টাকা মাইনে পাও। মাথায় গ্রে ম্যাটার এত কম হয়ে গেল

কী করে। রুমু একা একা ইয়েলে যাবে, তারপর কোনও সাতঘাটের জল খাওয়া সায়েব ওকে পাকড়াও করলে? জান, ওরা দাঁত মাজে না!

—সে কী! ওরা কোনকালে দাঁত মাজা চান করা সব শিখে গেছে।

—তুমি আর 'সে কী' 'সে কী' করো না। কথায় কথায় আকাশ থেকে পড়া তোমার একটা রোগ। টিভি দেখ? যে কোনও সায়েব হাসলেই দাঁতগুলো খেয়াল করে দেখো...আমাদের যেমন বাঁধা গোয়ালা, ওদের তেমনি বাঁধা ডেনটিস্ট।

—তা যদি বলেন বাঁধা গোয়ালা ওই আপনাদের নাগ-বাড়িতেই এখনও টিকে আছে, এখন কেউ বাঁধা...

চুলোয় গেল ইয়েল, চুলোয় গেল রুমাদির ভাল রেজাল্ট, স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশ যাবার আশা। কটা বাড়িতে এখনও গোরুর দুধ খায়, তার পরিসংখ্যান নিয়ে দুজনে ধুন্ধুমার তর্ক লেগে গেল।

অবশেষে কাঁদো কাঁদো মুখে রুমুদি একটা ছবি তুলে নিয়ে বলে বড় মামু এইটে পছন্দ, ঠিক যেন শাড়ি পছন্দ করছে।

অতঃপর সেই সানাই, সেই পাঁচশো লোক, লুচি থেকে আইসক্রিম, সেই তত্ত্ব। এখন রুমু জামাইবাবু স্টেট য়ুনিভার্সিটি অফ মিনেসোটায়। রুমুদিদি রুম্যানি বীক্ষ্য করছে।

মেয়েদের বাড়ি-ফেরা নিয়ে জেঠু এত বাতিকগ্রস্ত যে পাশের বাড়ির মিতালিদি পর্যন্ত যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে জেঠু ঘরবার করে। মিতালিদি ফিজিক্সের মেয়ে, পি এইচ ডি করছে, স্বভাবতই তার ফিরতে দেরি হয়। এক এক দিন তো বেশ দেরি। তার নিজের বাড়ির লোকের মাথাব্যথা নেই, জেঠু ঠায় সদরে দাঁড়িয়ে থাকবে। গলির মোড়ে মিতালিদির হিলের খুটখুট শোনা যাবে, তবে জেঠুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে।

—মিতু এলে মা? খবর সব ভাল তো?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, খবর খারাপ হবে কেন?

—না। রাস্তাঘাটে বিপদআপদ আজকাল লেগেই আছে কি না!

—একটু জ্যাম ছিল, আর কিছু না।

জেঠিমা রাগ করে বলেন, তোমার খবরদারির কী দরকার বলো তো! মেয়েটা কী মনে করে কে জানে!

—কী আবার মনে করবে? আমি একটা পিতৃতুল্য মানুষ। মেয়েটার ভাল-মন্দর জন্যে চিন্তা-ভাবনা করছি। এতে আবার মনে করার কী আছে? রাত দশটা পর্যন্ত ঘরের মেয়ে বাইরে থাকলে ভাবনা হয় না? দিনকাল জান? যেখানে-সেখানে মেয়েগুলোকে মুখে কাপড় বেঁধে আরবে চালান করে দিচ্ছে। জান না তো আর...

—হ্যাঁ, অমনি চালান করে দিলেই হল। দুনিয়ার মেয়ে তা হলে দোরে খিল এঁটে কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে বসে থাক!

—কাজকর্মটা কী শুনি? কী? মাদাম কুরি হবে?

হয় মাদাম কুরি নয় হাতা বেড়ি। এই দুটোই জেঠুর কাছে একমাত্র গ্রহণীয়

বিকল্প। এইটে নাগ-বাড়ির জীবনদর্শনের অন্ধকার দিক। তাই একটা সময়ের পরে মুক্তির জন্যে প্রাণটা একটু আঁকুপাঁকু করে বই কী! জিনার ধারণা ছিল বিয়ে মানে সেই মুক্তি। বিয়ে মানেই তুমি একটা গোটা লেডি হয়ে গেলে। তোমার মাথায় সিঁদুর, সুতরাং সম্ভাব্য সব অনাকাঙ্ক্ষিত ক্যানডিডেটরা জানবে এ কেস খতম। এ দিকে আর নজর দিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়ত, তুমি গৃহিণী। মানে কর্তৃকারক। নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে, নিজের মতামত দেবে, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে চলবে এখন থেকে।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা ভালই ছিল। সব আত্মীয়স্বজনের বাড়ি জোড়ে নেমন্তন্ন সারতে সারতেই বছর পার। প্রত্যেক রবিবার বা ছুটির দিন নতুন নতুন শাড়িটাড়ি পরে সাজগোজ করে বরের সঙ্গে বেরোনো। ফুরফুরে মেজাজ, হাসি, রসিকতা, বরের বন্ধুদের মনোযোগ আর বরের তো কথাই নেই। চক্ষে হারাচ্ছে। দুঃখের বিষয় এ সবই জীবনে বাসি হয়ে যায়। পাটভাঙা, ধোপদুরস্ত অবস্থায় যতটা আকর্ষক থাকে, পরে কিছুতেই আর ততটা থাকে না। শুধু তাই নয়। আগের হাসি আনন্দ তামাশার মধ্যে থেকেও অনেক খুঁত বেরোতে থাকে। অনেকটাই যেন ঠকে যাওয়া, ফাঁকি। যেটাকে প্রশংসা বলে মনে হয়েছিল সেটা ঈর্ষা, স্নেহটা স্নেহ নয়— তোষামোদ, অন্তরঙ্গতাটা আসলে হাঁড়ির খবর জেনে নেবার কৌশল। এইরকম। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির গণ্ডির মধ্যে তার তেমন খেদের কোনও কারণ ছিল না। মল্লিকার সঙ্গে তার খুব পটে গেছে। যদিও মল্লিকার কিছু কিছু দোষ আছে। সে বাইরের জগতের কোনও খোঁজ রাখে না। ভয়ানক ভিতু, অকপট নয়, নিজের সব কথা জিনা যেমন উজাড় করে বলে দেয়, মল্লিকা তেমন নয়, কিন্তু এগুলোর কোনও গুরুত্বই থাকে না, তার গুণের পরিচয় একবার পেলে। এত স্নেহ, এত আন্তরিক মনোযোগী ভালবাসা আর কোথাও পেয়েছে বলে জিনা মনে করতে পারে না। দিদিভাইয়ের কোনও ইগো-প্রবলেম নেই। জিনাকে নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই। জিনা এই পারে, জিনা ওই পারে। সে নিজে যে হোটেলের শেফদের হার মানিয়ে দেবে অনেক রান্নায় সে কথা কে বলে! জিনার গুণপনায় তার চোখ কপালে উঠেই আছে। মল্লিকার ধারণা তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই। তাই সে সব ভুলে যায়। এলোমেলো করে ফেলে। জিনা দেখেছে বুদ্ধি না থাকার কথাটা ঠিক নয়। কোনও একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে মল্লিকার ভুলের। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ায় নিরাপত্তার অভাববোধ? শাশুড়ি কি খুব দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন? দাদার শীতলতাও একটা কারণ হতে পারে। মেয়েদুটো বুদ্ধিমতী, কাকিমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার জন্য এক পায়ে খাড়া। ওদেরও খুব ভালবাসে জিনা। আর শ্বশুরমশাই? একটু চুপচাপ, ভাবুক ধরনের। কত যে পড়েন, কত যে জানেন, কত রকমের আগ্রহ, ওঁকে এখনও জিনা বুঝতে আরম্ভ করতেই পারেনি। তবে একটু দূরের মানুষ, নিঃসন্দেহে। বাড়ির দুই ছেলে অর্থাৎ তার ভাসুর এবং তার পতিদেব— এরা দুজনেই তাকে নিরাশ করেছে। দাদা তো দিদিভাইয়ের উপযুক্ত বর বলেই তার মনে হয় না। এ আবার কী! যার এমন সুন্দরী গুণী স্ত্রী, এত সুন্দর প্রাণোচ্ছল দুটো মেয়ে, তিনি এরকম তাসে- সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকতে পারেন কী করে? কী

ভীষণ চুপচাপ, ঠান্ডা প্রকৃতির! প্রথম প্রথম জিনা তার স্বভাবমতো ওঁকে ঠেলাঠেলি করতে ছাড়েনি। উনিও কদিনের জন্য নড়েচড়ে বসেছিলেন। কিন্তু কদিন। ক'মাস। ব্যস আবার যে কে সেই। আর নিখিল? নিখিল এক হিসেবে দাদার উলটো। সব সময়ে তপ্ত লোহা, ছ্যাঁক করে উঠলেই হল। নিখিলের সব কাজকর্ম কথাবার্তার কার্য-কারণ সে সত্যিই বুঝতে পারে না। সে নিজেকে সবটা দিতে চায়। পারে না। কোথাও নিখিলের মধ্যে একটা লৌহকপাট আটকানো আছে। তা ছাড়া ভীষণ গোঁয়ার। অহমিকা সাঙ্ঘাতিক। যদি একবার বুঝতে পারল কোনও জিনিস তার মতে হচ্ছে না, জিনার মতটাই জিতে গেল, অমনি বেঁকে বসবে। অমন বাবার ছেলে, জীবনে কোনও কিছুর অভাব হয়নি, বাইরে পালিশ আছে, সবই ঠিক। কিন্তু ভেতরে কোথাও একটা ভীষণ রূঢ় অমার্জিত মানুষ বাস করে যাকে জিনা চেনে না, স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু আশা ছাড়ে না, একদিন না একদিন তাকে সে বুঝবেই, পোষ মানাবেই।

ইতিমধ্যে সে ধৈর্য ধরে আছে। সুতো ছাড়ছে। সময় দিচ্ছে। যাদের জীবনটা সম্পূর্ণ স্বামী-নির্ভর সে তো সে জাতীয় নয়ও। আরও তো আছে। অনেক অনে-ক রকম আছে। তাদেরও তো দুর্ধর্ষ লাগে তার! ঝুম্পার সঙ্গে ওয়ার্ড-মেকিং, মাম্পির সঙ্গে সাপলুডো, দিদিভাইকে নিয়ে একজনদের জন্মদিনের আর একজনদের অন্নপ্রাশনের উপহার কিনতে যাওয়া। টিভি সিরিয়াল নিয়ে ফোনে মায়ের সঙ্গে তুমুল তর্ক। হঠাৎ কলেজ-জীবনের তিন-চার জন বন্ধু বাড়িতে হাজির। একেবারে অপ্রত্যাশিত। তার ওপরে সে উপন্যাসের পোকা, বিশেষ করে থ্রিলার। 'হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে!' জাতীয় মন নিয়ে বরের মুখ চেয়ে থাকতে তার বয়ে গেছে।

গরমের দীর্ঘ দুপুর শেষ হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যদিও এখন তিনটে। মুকুটের মনে হল একটা বিরতি নেওয়া দরকার। এশিয়াটিক সোসাইটির রিডিং রুমটাও ফার্নেস লাগছে। বারোটার একটু আগেই সে টেবিলে বসেছে। ঋত্বিকের আসার কথা ছিল অথচ এখনও তো এল না। যা কাজপাগল ছেলে! দেখো কোথায় কোন কাজে আটকে গেছে। সেইজন্যেই সে বাইরে কোথাও 'মিট' করবার ঝুঁকি নেয়নি। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথাখারাপ হয়ে যাবে।

—ওই তো, ওই তো ঋত্বিক! হাতে হেলমেট, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছে না। এশিয়াটিকের রিডিং রুমটার সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই। মুকুট উঠে দাঁড়াল। খাতাপত্রগুলো ফাইলের মধ্যে ভরে নিল, একটা হাত তুলে ঋত্বিককে দাঁড়াতে বলল। বই ফেরত দিয়ে, ঝোলাটা সংগ্রহ করতে করতে বলল, কী রে, তোর বাইকে চড়তে হবে না কি এখন? এই রোদ্দুরে?

—তা ছাড়া কী? আজকে তো সোজা বাইপাস, জায়গাটা তোকে দেখিয়ে আনি।

—সব ঠিকঠাক হয়ে গেল?

—সব হয়নি। প্রবলেমটা গিয়ে বলব।

—এই ঋত্বিক প্লিজ, পাশেই একটা রোল-এর দোকান আছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে, সেই এগারোটায় বেরিয়েছি।

—নে। নিয়ে নে—ওখানে গিয়ে খাবি।

—না রে। তখন বিশ্রী হয়ে যাবে। একটু সময় দে...

পার্ক স্ট্রিট থেকে ইস্টার্ন বাইপাস নেহাত কম দূরত্ব নয়। তারপর শেষ দুপুর হলে হবে কী, গাড়িতে বাসেতে এখনও ছয়লাপ রাস্তাঘাট। এক এক দিন কপাল এমন খারাপ থাকে, পুরো একটা লাল করিডর দাঁড়িয়ে থাকে সারা পথ জুড়ে। তুমি যাও বঙ্গে লালও যায় সঙ্গে। সুতরাং ওয়ান ওয়ের ভুলভুলাইয়ায় ঘুরতে ঘুরতে ওরা যখন গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছোল, তখন আকাশজুড়ে কমলা আলো।

জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে একটা ছোট পুকুর। একটা চালাঘর। গাছের মধ্যে, কটা নারকোলগাছ, কিছু দেশি আমগাছ, একটা শিশু, একটা তেঁতুল, বকুল আর দুটো মাঝারি শিরীষ গাছ রয়েছে, ছড়ানো, ছিটোনো। মুকুট বলল, এ তো অঢেল জায়গা রে! পুকুরটা নিশ্চয়ই বোজাবি না, বড় গাছগুলোও কাটাকাটি করবি না।

ঋত্বিক বলল, মাথা খারাপ? আমার অলরেডি ভাবা হয়ে গেছে পুকুরটাকে কীভাবে ব্যবহার করব। গাছগুলোর তলা বাঁধিয়ে দিয়ে, বেশ চাতাল মতো করে দিলে, সেখানে বসে ক্লাসও নেওয়া যাবে। ওই বকুলটা দেখ।

—শান্তিনিকেতন?

ঋত্বিক হাসল— বলল, শান্তিনিকেতন কে না গড়তে চায়, শান্তি গিয়ে অশান্তিতে না ঠেকে। যাক, চট করে দেখে নে, ঝপ করে অন্ধকার নেমে যাবে,

এখানে এইসব আগাছাটাগাছার জন্যে বিশ্রী সব পোকা আছে, কামড়ে জান বার করে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে উলটোদিকে ধাবাটা চোখে পড়ল মুকুটের। মাটির উঁচু চুড়োর মতন উনুন। তার ওপর বিরাট ডেকচিতে কিছু একটা চেপেছে। ওদিকে সর্দারজির পাগড়ি দেখা যাচ্ছে। ফেলে-রাখা বেঞ্চিগুলোর ওপর গোধূলির আলো পড়ে আছে। মুকুট বলল, চল ওখানে একটু বসা যাক। দুটো লস্যি অর্ডার দিয়ে বাইরের একটা বেঞ্চিতে বসল ওরা।

ঋত্বিক একটা অদ্ভুত ছেলে। কলকাতা মেডিকেল থেকে ডাক্তারি পাস করে এফ.আর.সি.এস করতে সে ইংল্যান্ডে যায় কিন্তু সেসব না করে সে সেখানে রেডক্রসের সঙ্গে জুটে যায়। মুকুট অ্যান্টি এডস প্রোগ্রামে ডাবলু.এইচ.ওর. সঙ্গে কাজ করতে করতে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, নরওয়ে হয়ে ইংল্যান্ডে গেলে একটা কনফারেন্সে ঋত্বিকের সঙ্গে আলাপ হয়। ঋত্বিক তখন ঠিকই করে ফেলেছে রেডক্রস ছেড়ে দেবে, দেশে ফিরে আসবে এবং বাচ্চাদের জন্য কিছু কাজ করবে। মুকুটকে ও অনুরোধ করে ওর সঙ্গে যোগ দিতে। কর্নেল থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিটা নিয়ে ডাবলু.এইচ.ওর. সাহায্যে পরিচালিত একটা সংস্থার কাজ নিয়েই মুকুট দেশে এসেছে। দেখে ঋত্বিক ঠিক এসে গেছে, তার যে কথা সেই কাজ। সে অনাথ বাচ্চাদের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান খোলবার কাজে তখন মেতে।

একটা বাইক এসে থামল। কালো গগলস্ পরা, জিনস্ আর কালো টি-শার্ট পরা দুটো ছেলে। দেখে সর্দারজি যে রকম শশব্যস্ত হয়ে উঠল, তাতেই ওদের মনে হল এনারা স্থানীয় মস্তান হবেন। একজন বাইক থেকে নেমে সর্দারজিকে নিচু গলায় কীসব জিজ্ঞেস করল। অন্যজন বাইকে বসেই রইল। একটু পরেই রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল দুজনে।

নিচু গলায় মুকুট বলল, কী রে! তোর শান্তিনিকেতনে এদের উৎপাত হবে না তো!

—আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম। কনস্ট্রাকশন শুরু হলেই এসব মাল এসে যাবে। আমার ধারণা ছিল কাছাকাছি লোকালয় নেই, কাজেই... এখন দেখছি ধারণাটা ভুল, যেখানে গুড় সেখানেই মাছি। যাক গে, ওসব কনট্রাক্টর বুঝবে। ওরা জানে কাকে কী মন্ত্রে তুষ্ট রাখতে হয়। আমাদের ওর মধ্যে মাথা না গলালেও চলবে। নামটার কথা কিছু ভাবলি?

—ভেবেছি কয়েকটা। 'সত্যকাম' নামটা কেমন?

—সেই 'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে?' শুনতে ভাল মুকুট, বুঝতে ভাল নয়।

—তা হলে যদি 'জীবক' দিস?

—ইনি কে বটেন?

—এঁকে তোর চেনা উচিত। শিশুচিকিৎসক ছিলেন। আড়াই হাজার বছর আগে। শল্যচিকিৎসা প্লাস্টিক সার্জারি এইসবে নাম করেন।

—তাই নাকি?

—আরও প্রাসঙ্গিকতা আছে ভদ্রলোকের। ওঁর জন্মপরিচয় জানা যায় না।

বনের ধারে কাঠকুটো পাতাটাতার মধ্যে পড়েছিলেন। বাঁচবার কথা নয় তবু বেঁচেছিলেন তাই জীবক। খুব সম্ভব রাজগৃহের নটী শালবতীর ছেলে। মানুষ করেন বিম্বিসারের এক ছেলে। চারপাশে কাক ঘুরছিল। কিন্তু ঠোকরায়নি।

—সেই কুকুরগুলোর মতো? ডাস্টবিনে পড়ে থাকা একটা বাচ্চাকে পাহারা দিচ্ছিল।

—ঠিক বলেছিস। একজন ফিল্মস্টার বোধহয় দত্তক নিলেন।

—আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখ, কুকুরেরাই বাগে পেলে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ড থেকে বাচ্চা টেনে নিয়ে যায়। আবার সেই কুকুরই... নাঃ, কুকুরের মতিগতিও মানুষের মতোই আনপ্রেডিক্টেবল।

মুকুট বলল, যা বলেছিস। ঠিক মানুষের মতো।

—জীবক, রিবক, সেবক...আওড়াতে আওড়াতে ঋত্বিক বলল, বড্ড কাঠ কাঠ শোনাচ্ছে না? তা ছাড়া যে কারণে 'সত্যকাম'টা চাইছি না, সেই একই কারণ 'জীবক'-এও এসেছে। আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া নটীর ছেলের পরিচয়টা সারাজীবন বয়ে বেড়াবার পক্ষে বড্ড ভারী নয়? যেখানেই যাবে বলবে 'জীবক' থেকে এসেছে, জীবক-এর রেসিডেন্ট।

—সে তো অন্য নাম দিলেও বলবে, অনাথ তো বটে!

—হ্যাঁ বলবে, কিন্তু ঠিক কাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা তো একটু অস্পষ্টও থাকবে! মায়ের জীবিকার পরিচয়ে সারাজীবন ওদের পরিচিত হতে হবে। দিস ইজ ভেরি আনজাস্ট। আচ্ছা, নামটা 'রচনা' দিলে কেমন হয়? মানুষ রচনা করা হচ্ছে। গড়বার চেষ্টা করা হচ্ছে!

—খারাপ না। একটা ও-কার লাগিয়ে দে তা হলে—'রোচনা'।

—'রোচনা'? শুনতে তো খুবই ভাল লাগছে। মানে কী?

—'রোচনা' মানে দীপ্তি, শোভা।

—থ্যাঙ্কস, মুকুট। এটাই থাক।

সামনে, আশেপাশে তাকালে কচুরিপানায় ভর্তি। লম্বা লম্বা ঘাসে আর আগাছায় ছাওয়া জলাজমিই বেশি দেখা যায় জায়গাটায়। দূরে দূরে কিছু নতুন বাড়ির খাঁচা। কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। বাজি ফেলে বলা যায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এসব জায়গা কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে যাবে। চারদিকে এখন ছড়ানো ঝুপড়ি, ন্যাংটা মাটি-মাখা বাচ্চাকাচ্চা। অপুষ্ট অর্ধনগ্ন এইসব পুরুষ-মহিলা পপুলেশন অচিরেই ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোথায় যাবে? কোথায় যায় স্থানচ্যুত এইসব বাস্তুহীন? এদের কোনও দেশ নেই। প্রথমটা দেখা যাবে এইসব কনস্ট্রাকশনের ভাঁজে ভাঁজে বালির ঝুড়ি নিয়ে গাঁইতি শাবল নিয়ে ওঠানামা করছে ওরা। যতদিন কাজ চলবে ততদিন। তাতে এমন কিছু সংস্থান করে নিতে পারবে না। কোনও ভূখণ্ডে স্থায়ী আস্তানার কোনও প্রশ্নই নেই, নেই কোনও বিশেষ জীবিকা। পোকামাকড়ের মতো অনিশ্চিত, স্বল্পমেয়াদি জীবন। রাজনৈতিক দলগুলো 'জনগণ' 'মানুষ' এইসব গালভরা নামের গৌরবে ওদের ভূষিত করে থাকে ভোটের স্বার্থে, তারপর বাদলাপোকার মতো এ জীবনগুলো কবে কাবার

হয়ে যায়, খোঁজ রাখবারও প্রয়োজন কেউ মনে করে না। পুরুষের পর পুরুষ বয়ে চলেছে এমনই। এদের জন্ম দেবার অধিকার কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু জাত শিশুর পালিত হবার অধিকারটাও যে থাকার কথা, কেউ ভাবে না। তারা খেতে পাবে না, খাটলে পিটুনি খাবে, ভাড়া খাটবে, বিক্রি হয়ে যাবে। তবু আইন হবে না পালন করার ক্ষমতা না থাকলে পৃথিবীতে শিশু আনা দণ্ডনীয় অপরাধ। আইন করলেও অবশ্য কিছু স্ত্রীলোকই ছেঁকে তোলা যাবে শুধু, যেন স্ত্রীলোকে পুরুষলোক ব্যতীত বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকে।

—কী যেন ভাবছিস? ঋত্বিক লস্যিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ধর তুই যদি তোর 'রোচনা'য় এইসব বাচ্চাগুলোকেও নিতিস... দূরের দিকে হাত দেখাল মুকুট।

ঋত্বিক বলল, ওয়ান অ্যাট এ টাইম মাদমোয়াজেল। ওভাবে আবেগে সেন্টিমেন্টে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে গেলে চলবে? তা ছাড়াও আমাদের কাজের গণ্ডিটা নির্ধারিত করছে অন্য একটা ফ্যাক্টর।

—কী?

—জমিটা হল একজন পতিতার। তিনি চান 'পতিতা'দের বাচ্চাদের জন্যই জমিটা ব্যবহার হোক।

—তা হলে তো অন্য প্রশ্নই নেই। কে এই মহিলাটি?

—জনৈকা ললিতা দাসী। এক ব্যারিস্টার সাহেবের রক্ষিতা ছিলেন।

—ছিলেন। এখন?

—এখন সাহেব গত। মেমসাহেব বিগতযৌবনা। টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তির অভাব নেই। চ্যারিটিতে মন গেছে। স্বজাতির কল্যাণ চান।

—ভাল তো! তা তুই কি সেইজন্যেই আমায় চাইছিস?

ঋত্বিক মুখে একটা মজা-পাওয়া হাসি নিয়ে বলল, তোকে ইন এনি কেস চাইছি মুকুট, সেটা কি তুই জানিস না?

মুকুট বলল, রোম্যান্স মচাসনি, রোম্যান্স মচাসনি। আসল কথাটা বল।

ঋত্বিক বলল, ঠিক হ্যায় বাবা, কাজের কথাটা হল ঘটনাচক্রে সত্যকামদের নিয়েই যখন কাম, তখন তোর অভিজ্ঞতা তো কাজে লাগবেই। এখন একটা মুশকিল আসান কর দেখি।

—কী?

—এই ললিতা দাসী বোর্ডে থাকতে তো চাইছেনই। প্রেসিডেন্ট টেন্টও হতে চাইছেন বোর্ডের।

—বোর্ডে থাকতে অসুবিধে কী? আর প্রেসিডেন্ট তো উনি ইচ্ছে করলেই হতে পারবেন না। সেটাতে তো ভোটাভুটির ব্যাপার থাকছে।

—উনি হয়তো সেটাও অ্যারেঞ্জ করতে চাইছেন।

—কীভাবে?

—ওঁর চেনাশোনা অনেককে বোর্ডে ঢোকাতে বলছেন আর কি!

—ইউনিসেফ বোর্ডের কম্পোজিশনের ব্যাপারে কোনও শর্ত দেয়নি?

—দিয়েছে। একজন ফিল্ড-ওয়ার্কের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সোশ্যাল সায়েন্সের লোক চাই, সেখানে তোকে ভাবছি। একজন মেডিক্যাল বা প্যারামেডিক্যাল পার্সন, সেখানে আমি আসছি। একজন 'মাদার'দের প্রতিনিধি চাই, সেখানে উনি ঢুকতে চাইছেন, যদিও উনি কোনও 'মাদার' নন ; এ ছাড়া তিনজন যে কোনও শিক্ষিত দায়িত্বশীল নাগরিক হতে পারেন। এখন উনি চেয়ারপার্সন হলে এবং সঙ্গে ল্যাংবোট নিয়ে এলে আমি কাজ করতে পারব বলে মনে হয় না। ওঁকে আমি ছেড়েই দিতাম, কিন্তু তুই তো জানিস প্রথমে কিছু কাজ এবং কিছু নিজেদের খরচাপাতি, আর্থিক সামর্থ্য দেখাতে হয়, না হলে ইউনিসেফের ফান্ডও পাওয়া যায় না, প্রজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকেও কিছু পাওয়ার আশা বৃথা। আমার সঞ্চয় তো আমি সবটা ঢালছিই। কিন্তু এই ললিতা ম্যাডামের জমিটা আমাদের একটা বড় অ্যাসেট। এটাই আমার প্রোপজালের প্রধান অংশ। তুই এঁদের সাইকোলজি জানবি। অনেক ডিল করেছিস। দেখ না তুই যদি ব্যাপারটা একটু ম্যানেজ করতে পারিস।

—তা, তুই ওঁকে ডিটেইলস বলতে গেলি কেন?

—ঘোড়েল মহিলা ভাই, তুমি চল ডালে ডালে তো ইনি চলেন পাতায় পাতায়। ব্যারিস্টারের ব্যাপার। বুঝছ না! আমি খুব চিন্তায় আছি।

—চল। আজই চল তা হলে। কাল থেকে আবার পর পর তিনদিন আমার বউবাজারে কাজ। সময় পাব না।

—তা হলে দাঁড়া। একটা ফোন করি ওঁকে।

পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, সেটা অনেক দিনের। বেশ নামকরা। চরিত্রটাও বহুজাতিক। ওরা ঢুকতে ঢুকতেই দেখল একটা ওপেল অ্যাস্ট্রা বেরিয়ে যাচ্ছে। চালাচ্ছেন একজন সিন্ধি বা পার্শি ভদ্রলোক, পাশে যে মোঙ্গোলীয় মুখের মেমসাবটি বসে তিনি চিনা না কোরীয় বোঝা শক্ত। কয়েকজন হিপি ধরনের বিদেশি খালি গায়ে তাপ্পি-মারা শর্টস পরে বেরিয়ে গেল। লিফটে ওদের সঙ্গে উঠলেন একজন তামিল বা কেরলীয় ভদ্রলোক।

লিফটের গহ্বরটা ঝুলে ভর্তি। মুকুট বলল, ছিঁড়েটিঁড়ে পড়ে যাবে না তো? ঋত্বিক কাঁধ নাচাল। সহযাত্রী তামিলের কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। লিফটম্যান অবশ্য বিরক্ত চোখে চাইল। অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশীয় বা বিহারি দেখতে হলেও সে বাংলা বোঝে।

ললিতা দেবীর ফ্ল্যাটে অবশ্য রং-চটা কোনও জিনিসই নেই। বরং একটু বেশি চকচকে সবই। ওয়লপেপার দিয়ে মোড়া ঘর। মাস্টার্ড রঙের কার্পেট। হলুদ সোফা-সেট। তাতে নীল-লাল নানা রঙের কুশন। সামনের দেয়ালে আবার একটা বিরাট আয়না। যেখানেই বসুক, আয়নায় অতিথির প্রতিবিম্ব পড়বেই। সামনে আয়নায় নিজের ছবির সামনে বিশ্রী অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকতে হয়।

বেশ একটু পরে ওদের পেছনের কোনও করিডর থেকেই আয়নায় ছায়া ফেলে এলেন ললিতা দেবী। অর্থাৎ নিজে যেমন অন্তরাল থেকে অতিথিদের দেখে

নেবার সুযোগ নেন, অতিথিদেরও তেমনই নিজে আসার আগেই চেহারাটা দেখিয়ে দেন। বয়স তিয়াত্তর চুয়াত্তর তো নিশ্চয়ই হবে। সাদা চুল, মাশরুম কাট। মাঝারি উচ্চতার আধা-ফরসা মহিলা। কোনও সময়ে হয়তো সুন্দরী ছিলেন, এখন খুবই প্রসাধিত ও কেতাদুরস্ত। একটু মোটার দিকে গড়ন। সুরমা দেওয়া চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ।

ঋত্বিক বলল, ম্যাডাম এই হল মুকুট রায়, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম। ওর বিদেশে বহু কাজের অভিজ্ঞতা আছে। জায়গাটা ওকে দেখিয়ে আনলাম।

উনি বললেন, নাম ঠিক হল?

—ভাবছি। এখনও ফাইন্যাল হয়নি।

এবার মুকুটের দিকে চাইলেন— পছন্দ হল? জায়গাটা?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর। শহর থেকে বেশি দূরে নয়। অথচ পরিবেশটা বেশ গ্রাম গ্রাম। যাতায়াতের অসুবিধে নেই।

—যাতায়াত? কেন? তোমরা ওখানে থাকবে না।

উনি ঋত্বিকের দিকে তাকালেন, তারপর মুকুটের দিকে।

—না, থাকব কেন? —মুকুট বলল, নিয়মিত দেখাশোনার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মেট্রন এসব ঠিক করতে হবে।

—বেশ কথা। আমি জনাকয়েক ছেলেমেয়ে ঠিক করে দেব এখন।

মুকুট বলল, আপনি কীরকম ছেলেমেয়ের কথা বলছেন জানি না। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে সব ঠিক করতে হবে। নিয়মমাফিক।

—বাঃ —কর্কশ শোনাল ললিতা দেবীর গলা —তা হলে যাদের মঙ্গলের জন্য করা, তারাই কাজ পাবে না?

—ব্যাপারটা ঠিক তা নয় মাসিমা, আপনি যাঁদের কথা বলছেন দরখাস্ত করে যদি তাঁরা যোগ্য বোঝা যায় তো তাঁদেরও নিতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু আমরা তো গ্র্যাজুয়েট, টিচার্স ট্রেনিং, মন্তেসরি ট্রেনিং, অন্যান্য কারিগরি ট্রেনিংও খুঁজব। আমি যদ্দূর জানি কোনও এন. জি. ও-ই এখনও পর্যন্ত সেরকম ব্যাচ বার করতে পারেনি। সে সময়টাই আসেনি এখনও।

—আমার চেনাপরিচিত কিছু সজ্জন আছেন, আমায় ভক্তি করেন, তাঁদের পরামর্শ আমাদের কাজে লাগবে। এঁরাও শিক্ষিত লোক তোমাদের জোগাড় করে দিতে পারবেন। তা ছাড়া 'অ আ ক খ' শেখাতে গ্র্যাজুয়েট, ট্রেনিংমেনিং দরকার হবে কেন, আমি বুঝি না।

মুকুট গ্র্যাজুয়েট ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্যে একটা বক্তৃতা আরম্ভ করতে যাবে, হঠাৎ ঋত্বিকের গলা শুনে সে থমকে গেল। ঋত্বিক বলছে, আপনার পছন্দমতো একটা প্রতিষ্ঠান তো আপনি ইচ্ছে করলে চালু করতেই পারেন। আপনার আদর্শ, আপনার ধারণামতো। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনও দরকার আপনার থাকছে না। প্রজেক্ট ওয়ার্ক, গ্রান্টের টাকাপয়সার জন্য কাগজপত্র তৈরি... এসবও অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ। ললিতা দেবী হকচকিয়ে গেছেন। তাঁর চোখ ঋত্বিকের ওপর

স্থির। একটু পরে উনি কেটে কেটে বললেন, তোমার কথা আমি বুঝলাম না বাছা।

—বোঝার কিছু নেই ম্যাডাম। শর্তসাপেক্ষে আপনার জমি আমি নিচ্ছি না। জমিটা দিলে পুরো ব্যাপারটাই আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। 'পতিতা'দের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজটা করব, এই শর্তটুকু আমি মেনেছি। কিন্তু এরপর আপনার যদি কোনওরকম মালিকানার ইচ্ছে, কনট্রোল করবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে জমিটা আপনি বরং দেবেন না। আমরা যদি ফান্ড আনতে পারি, তা হলে কাজটা করব একেবারে আমার মনের মতো করে, আমার পছন্দমতো লোক নিয়ে, আমার নিয়মে।

প্রত্যেকটা 'আমার'-এর ওপর কড়া ঝোঁক দিয়ে ঋত্বিক কথা শেষ করল। ললিতা দেবীর মুখ লাল হয়ে গেছে, বেশ উত্তেজিত। বললেন, বেশ কথা। এই যে এত ভদ্র-সজ্জন ব্যক্তি স্কুল-হাসপাতাল এসবের জন্য জমি বাড়ি দান করছেন, সেখানে তাঁরা চেয়ার নিয়ে থাকছেন না? তাঁদের মা-ঠাকুমার নামে স্কুলটুল হচ্ছে না? খালি আমার বেলাই নিয়ম আলাদা হবে? জানি। বিনোদনী দাসীর টাকায় তৈরি হল কিছুতেই তাঁর নামে হতে দিলে না কেউ। তা সে না-হয় ছিল আগেকার দিনের কথা। এখনও...।

—আপনি ভুল করছেন। এই শর্তে আমরা তথাকথিত ভদ্র-সজ্জনের কাছ থেকেও জমি বা অন্য কিছু নেব না। আপনার কেস আলাদা কিছু না।

—আমি তো ভেবেছিলাম আমার দিদিমা নীহারিকা দাসীর নামে ইস্কুলটা হবে... নীহারিকা স্মৃতি। ধরো.. তোমরা তো নাম খুঁজেও পাচ্ছ না!

—একটা নাম আমরা মোটামুটি ভেবে রেখেছি— মুকুট তাড়াতাড়ি বলল।

ঋত্বিক বলল, আপনার মা-দিদিমা এঁদের নামে প্লাক ওখানে রাখাই যায়। কিন্তু নীহারিকা স্মৃতিটৃতি আজকাল চলে না। ...আর এটা তো শুধু স্কুলও নয়। নামটার কোনও অর্থই সেভাবে... বলতে বলতে ঋত্বিক উঠে দাঁড়াল।

একটি মেয়ে ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে ঢুকলেন। ললিতা দেবী বিমূঢ়ভাব কোনওক্রমে সামলে বললেন, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও অন্তত, ও মেয়ে!

মুকুট একটা মিষ্টান্ন তুলে নিয়ে বলল, এই নিলাম, ঠিক আছে মাসিমা?

ঋত্বিক শুকনো গলায় বলল, আমায় ছেড়ে দিন প্লিজ। এমনিতেই আমার খুব অনিয়ম হয়ে যায়...

ললিতা দেবী তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

বাইরে বেরিয়ে মুকুট বলল, তুই তো যথেষ্ট কড়া লোক! আমায় নিয়ে যাওয়ার কোনও দরকারই ছিল না তোর।

ঋত্বিক বলল, সামহাউ তুই থাকাতে কথাগুলো বলবার জোর পেয়ে গেলাম। কেন, কীভাবে তা বলতে পারব না। মাইন্ড করলি?

—আমার একটু খারাপ লাগছিল। মহিলা বোধহয় চেয়ারপার্সন নীহারিকা স্মৃতি গোছের কিছু একটা হওয়ার আশা করছিলেন। ওইভাবে জাতে ওঠা আর কি! ব্যারিস্টার সাহেব ওঁকে সুখ, ঐশ্বর্য, বিলাসের বস্তু সবই দিয়েছেন। খালি কোনও সমাজ, সম্মান দিয়ে যাননি। তোরা বুঝিস না খুব করুণ ব্যাপারটা।

ঋত্বিকের ভুরু কুঁচকে ছিল। সে অধৈর্যভাবে স্টার্টারে লাথি মারছিল। বাইক স্টার্ট নিতেই বলল, বোস। তারপরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল অফিস-ফেরত ভিড়ের রাস্তাঘাট মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে। খুব রেগেছে।

মুকুটকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়েই চলে যাচ্ছিল। মুকুট বলল, শোন, এক কাপ কফি খেয়ে যা।

—ধুত! ঋত্বিক বলল, মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল।

—খারাপ হয়ে যাবার কী আছে? ওঁর দিক থেকে একটু ভেবে দেখ।

—তোর সঙ্গে আমার মতে মিলবে না মুকুট। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দান যদি স্বার্থের কথা ভেবে হয়, উদ্দেশ্যমূলক, তা হলে সে দান না করাই ভাল। সে কোনও পতিতাই হোক আর মহাত্মাই হোক। পতিতা বলে আহা উহু করতে থাকলে— কাজটা হবে না। ওভাবে কিছু হয় না।

মুকুট অবশ্য ঋত্বিকের হতাশাটা বুঝতে পারছিল। নিজের কেরিয়ারের কথা না ভেবে একটা পাস করা ডাক্তার সমাজের প্রতি দায়বোধে বাচ্চাদের জন্য কিছু করবার চেষ্টা করছে। তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি, ভাবনাচিন্তা করে প্রত্যেকটা ধাপ পার হচ্ছে। একটা অতি নগণ্য কারণে যদি এভাবে বাধা পড়ে! কিন্তু সে বলল, দেখ, ওঁর নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা না হয় ছাড়। কিন্তু মেয়েদের কোনও বিকল্প ব্যবস্থার ভীষণ দরকার। হলে ভাল। উনি খারাপ কিছু বলেননি।

দু-তিন লাফে ওপরে উঠে এল ঋত্বিক। বেল-এর ওপর আঙুল রেখেছে। মুকুটের মা খুলে দিলেন। ওঁর দিকে আবছাভাবে চেয়ে একটা আনমনা হাসি দিল ঋত্বিক। তারপর বলল, মুকুট, যখন কোনও কাজ করবি তোকে আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে তুই কী চাইছিস। একেবারে ষোলোআনা পেশাদারি টেকনিক্যাল অ্যাকিউরেসির সঙ্গে। তোর টার্গেট এরিয়াটা কী? এটা খুব জরুরি।

মুকুটের মা হেসে বললেন, ঋত্বিক ভেতরে এসে তর্ক করো!

—ও হ্যাঁ, স্যরি মাসিমা —ঋত্বিক অন্যমনস্ক হাসল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, ধর এই ব্যাপারটায় তোর কাজটা কাদের নিয়ে? পতিতারা? না তাদের ছেলেমেয়েরা?

—ছেলেমেয়েরা অবভিয়াসলি।

—ঠিক আছে। তোর টার্গেট কী? বাচ্চাগুলোর জন্যে ক্রেশফ্রেস তৈরি করতে চাইছিস কি? ব্যবসার সময়ে ওদের জমা রাখা যাকে বলে। ব্যবসার সময়ে রাস্তায় লুটোপুটি খাবে না, বিরক্ত করবে না, ওষুধ-পথ্য পাবে, এই?

—না রে বাবা। ওদের মানুষ করে তুলতে চাইছি। টোট্যাল এডুকেশন। যাতে বড় হয়ে অন্য স্ট্রিমে যায়। প্রসটিটুশন ব্যাপারটার সঙ্গে একেবারে যুক্ত না থাকে।

—রাইট। তা সেটা কি শুধু 'অ আ ক খ' শেখালেই হবে? তার জন্যে একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, সামাজিক পরিবেশ চাই, না চাই না? সেখানে যদি এই প্রফেশনের ঘুণ কেউ এসে এদের সুপার হয়ে বসে যায়, পরিবেশটা মাটি হয়ে যাবে না? মানুষ তার পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে মুকুট। ওদের কথাবার্তায়, চালচলনে, এমনকী আদর বা শাসনের ধরনেও ওদের অভিজ্ঞতার জগৎটা বেরিয়ে পড়তে বাধ্য। তাতে

বাচ্চাগুলোর ক্ষতি। এটা বুঝতে তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়?

মুকুট বলল, ওদের মায়েরা? তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কী হবে?

—মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাবে। সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু মাখামাখি থাকবে না।

—জিনিসটা একটু অমানবিক না?

—গোটা ব্যাপারটাই অমানবিক মুকুট। এই বারাঙ্গনা বৃত্তি, তাদের সন্তান হওয়া। সেসব সন্তান যেভাবে বড় হয়, জীবনকে ফেস করতে বাধ্য হয়, সমস্তটাই চূড়ান্ত অমানবিক মুকুট। আমার চেয়ে কম জানিস না তুই। সংস্কার-প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট ধাপে কঠিন হতে হবেই। নইলে উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এনি ওয়ে, হস্টেলে যারা মানুষ হয় সেইসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও বাড়ির বন্ধন একটু আলগা হয়ে যায়ই। স্বীকার করিস বা না করিস।

—বাচ্চাগুলো বড় হয়ে মায়েদের ঘৃণা করতে শিখলে?

—ঘৃণা করতে তো শেখানো হবে না। কিন্তু আমরা ওদের নারকীয় পরিবেশ থেকে তুলে এনে সুস্থ পৃথিবীর জলহাওয়ায় বাঁচতে দিতে চাই। তার প্রথম শর্তই হল কিন্তু ভুলে যাওয়া। নরকবাসের সময়টা। এখন এই ভুলে যাওয়া, সুস্থ ভ্যালুজ নিয়ে বড় হয়ে ওঠা মানে যদি অসুস্থতাকে ঘেন্না করা হয় কারও কারও ক্ষেত্রে কিছু করার নেই তা হলে। মায়েরা যদি ওদের বদলের সঙ্গে তাল রাখতে না পারে, সেই পুরনো জায়গায় থেকে যায়, তা হলে কোনও না কোনও সময়ে মায়েদের সঙ্গে ওদের বিচ্ছেদ হবেই। আমরা চাইব বড় হয়ে সব বুঝে ওরা মায়েদের এই দুরবস্থা থেকে মুক্ত করুক। কিন্তু ঘৃণা যদি না-ও করে শ্রদ্ধা করা শক্ত হবে। অতটা আমি প্রমিস করতে পারছি না। যাই হোক, সেটা পরের কথা। বি প্র্যাকটিক্যাল মুকুট। হয়তো করুণা করবে। করুণাও খারাপ জিনিস না। ভবিষ্যৎ কীরকম হবে, সে সম্পর্কে নির্ভুল আন্দাজ দেওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে কোনও ললিতা বিশাখার আবদারই আমি শুনতে রাজি নই।

কফি এসে গেছে।

মুকুট বলল, ঠিক আছে। এবার একটু হাস।

মুখের পেশি সামান্য আলগা হল ঋত্বিকের। কিন্তু সে আদৌ হাসল না। বলল, কাজটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল রে! আবার কোথায় হা জমি জো জমি করে ঘুরব!

মুকুট বলল, কী আশ্চর্য! এখনই অত হতাশ হবার কী আছে? উনি কি একবারও বলেছেন জমিটা দেবেন না?

জবাবে ঋত্বিক নীরবে কফিটা শেষ করে ফেলল। বলল, চলি রে! দু-তিন কদমে পগার পার।

সত্যিই। ঋত্বিকের মতো কঠিন সংকল্প, নিজের ধ্যানধারণায় অবিচল থাকার মতো মনের জোর মুকুট আজও আয়ত্ত করতে পারল না। তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, কিন্তু ঋত্বিকের জোর, দৃঢ়তা তার নেই। ভাবা যায়! এফ. আর. সি. এস-টা কমপ্লিট করল না জাস্ট ওয়েবসাইটে ভারতীয় শিশুদের ওপর কতকগুলো ছবি আর ডেটা দেখে? তিনদিন তিনরাত নাকি খালি পায়চারি করেছে আর ভেবেছে। তারপর সেই যে নিজের পথ ঠিক করে নিয়েছে, আর একচুলও নড়েনি।

চুলের আমি চুলের তুমি

—চুল তুমি কার?

—আগে ছিলাম মাথার, এখন মাটির।

পার্লারের মেঝেয় ছড়িয়ে থাকা অসহায় চুলের গোছাগুলোর দিকে চেয়ে জিনার বুক ঠেলে কান্না এল। সে বলল, প্লিজ, চুলগুলো আমাকে দিয়ে দিন।

—আগে বলবেন তো! মেঝেতে পড়ল! ঠিক আছে ওয়াশ করে দিচ্ছি।

গোছা করে চুলগুলো সযত্নে তুলল মেয়েটি। এলোমেলোগুলো বাদ দিয়ে দিল, তারপর শ্যাম্পু লাগিয়ে চড়া জলের ধারার তলায় ধুয়ে, ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে, রাবার ব্যান্ড আটকে ওর হাতে তুলে দিল। বলল, এত মন খারাপ তো কাটলেন কেন ম্যাডাম? আমাদের ব্যবসা, আমরা তো বলবই চুল কাটুন, ডাই করুন, ব্লিচ করুন...

জিনা হাসল, বলল, স্বীকার করছেন তা হলে!

মেয়েটি বলল, দুপুরবেলা, আর কাস্টমার নেই, আমাদের ম্যাডামও লাঞ্চে গেছেন তাই বলে ফেললাম। সাহেবের শখ, না?

জিনা চমকে উঠল, এ কথা কেন মনে হল আপনার?

—বা! সাহেবের শখেই তো বেশির ভাগ কাস্টমার চুল কাটে। আপনার মতো এমন সুন্দর ন্যাচার‍্যাল ওয়েভঅলা চুল যাদের, তারা বড় জোর একটু শেপ করে নিতে ভালবাসেন। আমাদের এমন কাস্টমারও আছে, জানেন, হাঁটু ছাড়িয়ে ঘন চুল। পার্লারে এসে শ্যাম্পু করাতে হয় এত। কিছুতেই চুল কাটবে না। চুল কাটে কারা? বয়স হয়েছে, চুল কমে বিশ্রী হয়ে গেছে, কী করলে ভাল লাগবে বুঝতে পারছে না... আপনার বয়সে আপনার মতো চুলে...ওসব সাহেবদের শখ।

জিনার হঠাৎ একটু স্বস্তি বোধ হল। যাক বাবা, আর পাঁচজনেরও তার মতো বর আছে। সে একলাই দুখিনী নয়।

টাকা মিটিয়ে সে একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে এল। বর্ষার আকাশ থমথম করছে। যে কোনও মুহূর্তে ঢালতে পারে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে দিন। চাবি দিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা খুলল সে। দরজার কপাট, ভেতরের দেয়াল, পিয়ানো-রিড সিঁড়ি সব তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারছে না। 'কে তুমি রঙ্গিণী, আগে তো দেখিনি' গোছের ভাব। নিজের বাড়িতেই জিনা চোরের মতো পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে। বাবা যদি উঠে পড়েন! এই সময়টায় উনি ওঁর আরামচেয়ারে পড়তে পড়তে টুক করে একটু ঘুমিয়ে পড়েন। পাতলা একটা ফুরফুরে নাক ডাকার শব্দে উঁকি মেরে সে দেখেছে দৃশ্যটা। কিন্তু খুব পাতলা ঘুম। এক্কেবারে বোনচায়নার মতো ভঙ্গুর। নিজের নাকের ডাকেই ভেঙে যায়। চুপচাপ নিজের ঘরে গিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল সে। বাথটবে জল ভরল, ও ডি কলোন দিল। তারপর পা খালি করে আস্তে আস্তে ছলাত ছলাত। এই ব্যাটা বাথটবই যত নষ্টের গোড়া।

বাবু বাথটব বসালেন, একসঙ্গে নাকি চান করবেন। এমা! ঠিক আছে বাবা তাই

তা-ই। আয়না বসিয়েছে একখানা মানুষ-মাপের। টব থেকে উঠে তাকে যে এড়িয়ে যাবে তার উপায় নেই। একটা লেসের ঢাকা দিয়ে তাকে মোটামুটি ঘোমটা দিয়ে রাখা গেছে। তা এই টবে যুগল-স্নান করতে করতে গোছাসুদ্ধু তার চুলগুলো ধরে একদিন মারল এক টান। এই বাথটবে এরকম চুল মানাচ্ছে না যা-ই বলো! কেমন ঠাকুর ঠাকুর লাগছে। এখানে ঠাকুর নয়, মেমসাহেব দরকার। চুলগুলো কেটে ফেলো।

মানে? ভেরি অবজেকশনেব্‌ল্‌! তোমার বাথটবের সঙ্গে ম্যাচ করার জন্যে আমার চুল কাটতে হবে? সাব্বাস, কোনওদিন বলবে তোমার মুন্ডুটা বেডরুমের সঙ্গে যাচ্ছে না, তখন কি মুন্ডুটাও ঘ্যাঁচ করে...

—ঠিক আছে, আর বলব না। আমার ভাল লাগা না-লাগায় তোমার যদি কিচ্ছু এসে না যায়, কী আর করা যাবে!

অভিমান? বাব্বাঃ, নতুন জিনিস! জিনার গায়ে পুলক লাগে। গ্যাটম্যাট রাগ নয়, লাল-চোখ আদেশ নয়, মুখ-কুঁচকোনো ঘেন্না বা তাচ্ছিল্য নয়। তার বরের অভিমান হয়েছে। পুরনো ইয়ার্কিবিলাসী মন তাকে সুড়সুড়ি দেয়, সে মিটিমিটি হেসে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—আমার ভাল লাগা না-লাগাতেও তো তোমার কিচ্ছু যায় আসে না। দাও না বাবা তোমার নেয়াপাতিটুকু স্লাইস করে কেটে। ভুঁড়িতে সে আচ্ছা করে কাতুকুতু দেয়।

এই কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? নিখিল হাসতে হাসতে কেশে ফেলে। জলে খানিকটা খাবি খায়। জল গিলে ফেলে। জিনা বাথরোব গায়ে জড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পগার পার।

কিন্তু রোজ যদি একই ঘ্যানঘ্যান করে? ভাল লাগে? বিনুনি করা কি হাতখোঁপা করা বাঙালি মেয়ে রান্নাঘরে মানায়, ক্লাবে মানায় না। কেমন ভেতো ভেতো লাগে, কিছু না হোক চুলগুলো সোজা করে খুলে রাখো।

—আমার হালকা চুল বাবা, উড়বে, এলোমেলো হয়ে যাবে, চুল খুলে রাখলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। কেন? তোমাদের ওই মিসেস শিবদাসানি তো আমার খোঁপার কত প্রশংসা করলেন।

—বোঝো না। ওটা প্রশংসা নয়।

—ব্যাজস্তুতি?

—ইয়েস।

—জিনা কষে সাবানের ফেনা তোলে, বিজ্ঞাপনের মেয়েদের মতো। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে। নতুন জিনা আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচায়, বলে—তুই আর তুই নেই।

কত লোকেই তো চুল কাটে। ভালও দেখায়, নতুন দেখায়। নিজেকে নতুনরূপে দেখবার জন্যেই তো এত কাণ্ড! জিনার একারই কেন এমন স্যামসনের মতো অবস্থা! মাথাটা হালকা লাগছে, মান মর্যাদা গরিমা সব কিছুই কেন হালকা লাগছে? বাইবেলে গল্প আছে স্যামসনের চুল কাটলে শক্তি কমে যেত। তারও নিজেকে কেমন বলহীন, সত্যিকারের অবলা লাগছে। বিয়ের সময়ে শুনেছিল এই

চুলই নাকি বিশেষ পছন্দ হয়েছিল নিখিলের। সে যখন খোলা চুলে পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল সেই দৃশ্য নাকি নিখিলের চোখে লেগে আছে, চিরকাল থাকবেও। জিনা এমনিতে নিজের কোনও বিশেষ অঙ্গের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে না। তার কেমন অস্বস্তি হয়। কেউ যদি বলে—ইস জিনা তোর হাতগুলো কী সুন্দর!

—দেখিস আবার, হাতগুলোকেই আমি ভেবে বসিস না।

যখন ষোলো-সতেরো বছর বয়স কে এক বন্ধু হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—কী রে, আমাকে দেখছিস?

—তোর স্কিন দেখছি। কী মাখিস রে?

—ব্রণ উঠলে ডাকব দেখে যাস—জিনা রাগ করে বলেছিল। এ এক অদ্ভুত বিদঘুটে ছেলেমানুষি, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা। কিন্তু নিখিল যখন প্রথম বিয়ের পর তার চুল নিয়ে আদিখ্যেতা করত, তার খারাপ লাগেনি। যেন গোড়ার থেকে জানাই ছিল, তার থেকে প্রায় বারো বছরের বড় এই লোকটা তাকে খণ্ডখণ্ডভাবে ছাড়া দেখতে পাবে না। হাত পা চুল চোখ নাক কান বুক—এ সবের ক্যালাইডোস্কোপ। কিন্তু সেই চুলই অমন নির্মমভাবে কেটে ফেলতে বলল? তার মানে কি ও খণ্ড থেকে শেষ পর্যন্ত জিনার সামগ্রিকতায় পৌঁছোল? নাকি সমগ্রকে দেখতে পেল না, আবার খণ্ডও গেল! এই জাতীয় কিছু অস্পষ্ট ভাবনা তার ভেতরে কাঁকরের মতো ফুটছিল। নতুন চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার মনে হচ্ছিল—এই খুশি করার কি কোনও শেষ নেই? 'খুশি থাকো, আমার পানে চেয়ে চেয়ে খুশি থাকো' এই তো ছিল তার নিজের মনোভাব। মানুষটা রাগী, জটিল, খেয়ালী, দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক। ঘটনাচক্রে যদি এমন মানুষের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়তে হল তাকে, কুছ পরোয়া নেই, মতিঝিলের নাগিনী ওতে ঘাবড়ায় না। যাতে খুশি থাক, খুব অদেয় না হলে তাই-ই দিচ্ছি। বন্ধুদের আসরে যেতে হবে? ডাকতে হবে? বানাচ্ছি কাবাব, শিখে নিচ্ছি ককটেলের কায়দা। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। একদিন বাড়ি ফিরে নিখিলবাবুর ক্রুদ্ধ মন্তব্য—খুব যে। এবার কি ওই রণেনকে নিয়েই কাটবে না কি?

রণেন ওর এক নম্বরের বন্ধু। তার বাড়িতেই সবচেয়ে জমাটি আসরগুলো বসে।

—কাটতে হবে কেন? তোমার কি তা হলে ভাস্বতীকে নিয়ে কাটতে সুবিধে হয়?

ভাস্বতী রণেনের স্ত্রী। তার সঙ্গে নিখিলের ফস্টিনস্টি খুব জমে। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে নিখিল বলল—মেরে মুখ ভেঙে দেব একেবারে।

শুনে—জিনা হাঁ। নিজেকে চিমটি কেটে দেখে স্বপ্ন দেখছে কিনা। বলে কী রে লোকটা? সত্যি সত্যি মারবে না কি? তুমি ঢিল ছুড়েছ আমিও একটা ছোট্ট করে পাটকেল ছুড়ে দিয়েছি। এতে মারধরের কথা ওঠে কেন? নাগ-বাড়ির চৌহদ্দিতে কোনও মারধরের ব্যাপার নেই। জিনা যাকে বলে শক্‌ড্।

আর কিছুতেই সে যাবে না। কোনও বন্ধুবান্ধবের জমায়েতে সে যাবে না তো!

সাধাসাধি শুরু হল তখন।—প্রেসটিজ থাকছে না আমার। সব্বাই জিজ্ঞেস করছে তোর বউয়ের কী হল!

—বলোগে বউ ফিউজ হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে বাবা, যত খুশি ঢলাঢলি করো, আর কিচ্ছু বলব না।

—ঢলাঢলি? মানে? যাব না, আমি কিছুতেই যাব না।

বললেই কি আর জেদ বজায় থাকে! বন্ধুরাই সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হয়। টুকটাক রাঁধতেও হয়, বোতলও খুলতে হয়, হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দিতে হয়। কিন্তু সে প্রবলভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ জারি রাখে। তার স্বাভাবিক দমদম-সুলভ ফুর্তিবাজ স্মার্টনেসকে, তার বর লাস্যফাস্য ভেবে খেপে ষাঁড় না হয়ে যায়। খুশি থাকো বাবা, খুশি থাকো।

কিন্তু এই সবটাই জিনার কাণ্ডজ্ঞান। তার আপসপ্রিয়তা, শান্তিপ্রিয়তা। এর চৌহদ্দিতে কোথাও ভয় নেই। নিখিলের বহু নির্দেশ সে পালন করে চলে। যেমন চায় তেমনই থাকে, সবই ঠিক, কিন্তু এ সবই তার অকৃপণ দান। সে ইচ্ছে করলেই না দিতে পারত। যেখানে দেবে না ঠিক করে, সেখানে সে অনায়াসে নিজের মতো চলে। যেমন, শ্বশুরমশাইকে সে তাঁর নিজের ঘর থেকে সরতে দেয়নি। তিনি বলেছিলেন আমি থাকলে তোমাদের ভাগে একটা ঘর কম পড়বে। শুধু ঘর কেন, শান্তির জন্য আমি আরও অনেক বেশি স্যাক্রিফাইস করতে পারি ছোট বউমা।

মনে মনে জিনা বলেছিল—আমিও।

কিন্তু কিছুতেই ওঁকে ঘর ছাড়তে দেয়নি। দিদিভাইদের পরিবারের সঙ্গে সে ঠিক আগেকার মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এখনও গিয়ে সে দিদিভাইয়ের ভাঁড়ার গুছিয়ে দিয়ে আসে। ঝুম্পা-মাম্পিকে গান শেখাতে বসে। এখনও দাদার সঙ্গে ইয়ার্কি মারে। ভাল কিছু রাঁধলেই বাটি করে ওদের দিয়ে আসে। নিয়েও আসে। একেবারে শতকরা শতভাগ সহজ স্বচ্ছন্দ, যেন মাঝখানে কোনও পাঁচিল নেই। তোমার প্রয়োজনে তুমি পাঁচিল তুলেছ তোলো, আমার কাছে ওর অস্তিত্ব নেই। তোমার রাগারাগি করে নিজের গুরুত্ব জাহির করতে ইচ্ছে হয় করো, আমি দমছি না। ডিজাইনার ড্রেস এনে দিয়েছ? পরলে ভাল দেখাচ্ছে না। এটা আমার বিচার, তোমার চোখের বিচার বলছে ভাল। ঠিক আছে বাড়িতে পরলাম, নিভৃতে। এই জর্জেট কাপড়ের নদীস্রোতের মতো ড্রেস পরে আমি কোনও পার্টিতে যাচ্ছি না। চুল কাটতে বলেছিলে, ঘ্যানঘ্যান করে কানের পোকা বার করে দিচ্ছিলে, ঠিক আছে চুলগুলোও আমার শান্তিপ্রিয়তার আর তোমার খুশি থাকার বেদিমূলে নামিয়ে রাখলাম। কিন্তু এটা আমার পক্ষে বড্ড বেশি, মানে টু মাচ হয়ে যাচ্ছে, হয়ে গেল, এত বেশি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে একটা উলটো প্রতিক্রিয়া হয়। তুমি যদি একটা ভারী জিনিসকে ঘুসি মার, তোমার হাতে লাগবে, তখন তোমার মলম লাগবে। ব্যথাহারী মলম।

জিনা ফোনটা তুলে নিল।

—মুকুট? যাক বাবা ফিরেছিস। আমি জিনা বলছি বুঝতে পেরেছিস তো?

—বুঝতে পারব না, এমন ধারণা তোর হল কী করে? কেন?

—কী জানি বাবা, এক পৃথিবী লোকের সঙ্গে তোর ওঠা-বসা, গলা গুলিয়ে যাওয়া কোনও ব্যাপারই না।

—লোক যতই এক পৃথিবী হোক, ছোটবেলার বন্ধুর গলা একটাই হয়। যাক, কেমন আছিস?

—ভাল। শোন আমার দুপুরবেলা একদম সময় কাটে না। তুই কীসব সোশ্যাল ওয়ার্কটোয়ার্ক করিস, আমাকে একটু কাজে লাগা না।

—তোকে? সোশ্যাল ওয়ার্ক?

—কেন রে? আমি কি খুব আনসোশ্যাল, না কি অ্যানটিসোশ্যাল?

হাসির শব্দ শোনা গেল—তুই একদম একরকম আছিস।

—দু'রকম হবার চান্স আর পেলাম কই?

—জিনা তুই তো অনেক আগেই স্কুলে-কলেজে চেষ্টা করতে পারতিস!

—তোকে কি খুব বিপদে ফেললুম?

—মানে?

—যা আগে হয়ে গেছে, হতে পারত, সেসব নিয়ে কে ভাবে রে মুকুট? করিনি, করার ইচ্ছে হয়নি। এখনও করতে চাইব না। আমি একটু অন্য ধরনের কিছু চাইছি। পারিস যদি তো দেখ, তাড়া কিছু নেই।

—জিনা ফোনটা রেখে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বাজল ফোনটা। মুকুট।

—কী রে? কী হয়েছে?

—কই? কিছু হয়নি তো!

—রাগ করলি কেন শুধু শুধু?

—অনুরাগের ভাগটা আমার দিক থেকে বোধহয় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। সব জায়গায়। জিনার চোখে জল আসছে। প্রাণপণে চাপল জল। গলায় আসতে দেওয়া হবে না। মুকুট বলল, কাল যাব। থাকবি তো?

—কোথায় আর যাব?

—ঠিক আছে। কাল কথা হবে।

ফোনটা রেখে দিলে মুকুট বারান্দায় এসে বসল। বৃষ্টি নেমেছে। ঝমঝম করে না হলেও ঝিরঝিরেও বলা যায় না। একটু একটু ছাট এসে গায়ে লাগছে। এইভাবে বৃষ্টি গায়ে লাগলে খুব আরাম লাগে। চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে রেখে বারান্দার গ্রিলে পাদুটো তুলে দিল সে। আজ মুকুট পৃথিবীর কাঁহা কাঁহা মুলুকে একলা একলা কাজ করছে। কত দায়িত্ব তার, কত গুরুত্ব। আর জিনা দুপুরে-কী-করবে-ভেবে-না-পাওয়া কর্মহীন অবলা। কিন্তু দমদমের যে স্কুলে পড়তে গিয়ে ওর সঙ্গে ভাব সেখানে ওদের ভূমিকা ঠিক উলটো ছিল। জিনা ঝকঝকে স্মার্ট করিৎকর্মা ক্লাস-মনিটর। আর মুকুট ভিন্ন স্কুল থেকে আসা ভ্যাবাচাকা একটা মোটাসোটা গোলগাপ্পা মেয়ে, যাকে সব্বাই মিলে উঠতে বসতে র‍্যাগিং করছে। বাবা তখন সবে কলকাতায় বদলি হয়েছেন। ওরা থাকে এয়ারপোর্টের কাছে। মুকুট ছিল ভীষণ লাজুক, নতুন স্কুলে তার একদম ছোট করে ছাঁটা চুল, ভালমানুষ

ভালমানুষ গোল মুখ আর থতমত ভাব নিয়ে সবাই যত মজা পাচ্ছে, সে ততই গুটিয়ে যাচ্ছে। টিচাররা পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন এবং সে বলতে পারছে না। জিনা তার প্রতি যে কী শুভ দৃষ্টি দিল, ঈশ্বর জানেন। তার মধ্যস্থতায় পুরো ক্লাসের সঙ্গে মুকুটের সম্পর্ক সহজ হয়ে গেল।

জিনাদের সেই বিশাল বাড়ির কথা ভোলা যায় নাকি?

—বাবা এয়ারলাইনস-এ কাজ করেন? ও মা। ও দিদি দেখো জিনুর বন্ধু এসেছে-এ। এইটুকু বয়সেই এগারোবার প্লেনে চড়েছে-এ। জিনার এক কাকিমা চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন—আমি একবারও চড়িনি—তারপরেই তাঁর খেদোক্তি। সঙ্গে সঙ্গে লুচি রাবড়ি আলুভাজা এসে গেল। জিনার যেসব দিদি দাদা ভাইরা বাড়ি ছিল, সব্বাই ভাব করে গেল। মুকুট-জিনার এই জুটি গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত অটুট ছিল। তার পরেই দুজনের পথ আলাদা হয়ে গেল। জিনা রয়ে গেল—আশুতোষ বিল্ডিং-এ, মুকুট চলে গেল রাজাবাজার। তখনও যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মুকুট ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছিল তার কাজে। চলে গেল প্রথমেই থাইল্যান্ড। সেখান থেকে মালয়েশিয়া নরওয়ে কত দ্রুত কত কী শিখল। তারপর গেল স্টেটস। তার মামা গ্যারান্টর ছিলেন, আরও সুবিধে। মাঝখানে লন্ডনে কনফারেন্সে যোগ দিয়েছে। স্টকহোলমে গেছে। সত্যি সত্যিই বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরেছে সে। জিনার বিয়ের সময়ে সে ছিল না। জিনা ফট করে বিয়ে বসে যাওয়ায় সে একটু অবাকই হয়েছিল। এমন নয় যে নিজে প্রেমট্রেম করে আহ্লাদে গলে গিয়ে জিনা বিয়েটা করছে। ঠিক এইরকম ব্যাপারটা মুকুটের বাড়িতে কেউ ভাবতে পারে না। গলদটা সম্ভবত জিনাদের বাড়ির মনোভাবে, পরিবেশে। ঋত্বিকের সেই 'পরিবেশ'।

অনেককাল পরে কালবৈশাখীর মেঘ ঝড়বৃষ্টির মাঝখানে জিনাকে দেখল সে। চেহারায় খুব একটা বদল হয়নি। চোখা ভাবটা একটু ভোঁতা হয়ে গেছে। মোটা না হলেও একটু ভরা ভরা। খুব খাওয়াল, অনেক হাসল, ফাজলামি করল। কিন্তু কেন যেন মুকুটের ওর বাড়ির পরিবেশ ভাল লাগেনি। এমনিতেই উত্তর কলকাতার পুরনো বড় বড় বাড়িগুলোর মধ্যে কেমন একটা প্রাচীনতা গুমোট বেঁধে থাকে। তার মধ্যে অবশ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। খুব কায়দা। জিনিসপত্র অনেক। কিন্তু তার মনে হল এই জিনিসগুলোই যেন এখানে মানুষদের ব্যবহার করে। জিনাকে ব্যবহার করে। এই সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না।

জিনার বরের সঙ্গে দেখা হয়নি। ছবি দেখল। বেশ নবকুমার নবকুমার চেহারা। মাংসল মুখ, চকচকে চুল। জিনার জা বললেন জিনাকে চক্ষে হারায় নাকি! ছ বছর বিয়ে হয়ে গেছে এখন জিনার একটা বাচ্চা হওয়ার কথা। প্রথম দিনেই এসব প্রশ্ন তো করা যায় না! যতই বন্ধু হোক! কিন্তু প্রশ্নটা তার মনে উঠেছে। দম্পতির উভয়েই চাকরি করলে, বাচ্চার জন্মটা অনেকেই পিছিয়ে দেয়। জিনার তো সেরকম কারণ নেই। এবং আজ যেভাবে ও কাজকর্ম চাইছে, দুপুর না কাটার কথা জানাচ্ছে, তাতে মুকুট প্রায় নিঃসন্দেহ বাচ্চা নিয়ে একটা কোনও সংকট এসেছে

জিনার জীবনে।

তার কাজকর্ম নিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করলে মুকুট ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে থাকে। তার কারণ সে দেখেছে এই সোশ্যাল ওয়ার্ক ব্যাপারটা এখানে বেশির ভাগ লোকই বোঝে না। অনেকে মনে করে এটা ভ্যারেন্ডা ভাজা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো গোছের একটা ব্যাপার। অনেকে আবার ভাবে এটা একটা মহান কাজ। প্রচুর আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ আছে এর মধ্যে, আর বাকিরা ভাবে এটা একটা চালাকি। সোশ্যাল সার্ভিসের আড়ালে আবডালে অনেক কুকর্ম হচ্ছে, মুখোশের আড়ালে অনাচার। সবগুলোই হয়তো আংশিক সত্য, কিন্তু কোনওটাই যে পুরো সত্য নয়, এটা লোককে বোঝানো শক্ত। সোশ্যাল ওয়ার্ক যে রীতিমতো একটা উপার্জনের রাস্তা আজকাল, পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীদের দিয়ে কাজটা চলে, এবং সেখানে আবেগতাড়িত নভেলি ব্যাপারস্যাপারের কোনও জায়গা যে নেই, সোশ্যাল ওয়ার্ক করা মানেই যে সন্ন্যাসী -সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়ার দরকার হয় না—এসব আমজনতাকে বোঝানো শক্ত। তার অনেক আত্মীয়ই সভয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে থাকেন—বন্যাত্রাণে যাস? ভয় করে না? আমেরিকার জায়গায় জায়গায় তো ফ্ল্যাশ-ফ্ল্যাড হয় বলে শুনেছি। ভয়াবহ টর্নেডো হয় পশ্চিমে। বাপরে সেখানে যেতে হয় তো! এরা ভাবে সোশ্যাল সার্ভিস মানেই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটলেই সেখানে ছুটে যাওয়া। যায়নি শুনে আবার অনেকের মুখে শ্লেষের হাসি খেলে যায়। ভাবটা—দিব্যি গা বাঁচিয়ে চলছ বাবা!

এর পরে নিজের কাজের ক্ষেত্র নিয়ে কথা? ওরে বাবা! তা হলে আর দেখতে হবে না। তার অত আলোকপ্রাপ্ত বাবা মা? তাঁরাই কি খুব খুশি! ঋত্বিক বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছে শুনে দুজনেই নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। —বুঝলি মুকু। তুইও আস্তে আস্তে ঋত্বিকের প্রজেক্টটাতে চলে যা। এটা অফ করে দে।

—কেন বাবা?

—না, বাবা ঢোঁক গেলে, ঋত্বিককে তো তোর সাহায্য করা দরকার।

—সে তো করছিই। এর চেয়ে বেশি সাহায্য ওর লাগবে না, ব্যাস। আমার কাজটা আলাদা, আলাদাই থাকবে।

মা বলবে, তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। কেন, দুজনে মিলে একটা কী সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবি, এটাই তো ভাল।

মুকুট হেসে ফেলে। বলে—এটাও ভাল। ওটাও ভাল মা, বুঝলে তো? কিন্তু সবার চাইতে ভাল নিজের কাজ আর নিজের সুখ।

এখন জিনা যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চাইছে সে ওই আত্মত্যাগের, সন্ন্যাসীর স্পেশ্যাল ওয়ার্ক নাকি স্রেফ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সোশ্যাল ওয়ার্ক? সেটাই কথা।

মাঝখানের দরজাটা টুক করে খুলে জিনা ওদিকে গিয়ে দাঁড়াল। চুলগুলো খুলে দিয়েছে। গতকাল খালি মাথার পেছনে একটা পুঁটলি বেঁধে বেঁধে ঘুরে বেড়িয়েছে। কারও সামনে আসেনি। আজ একটু সাহস বেড়েছে, মন খারাপ কমেছে।

'মাম্পি-ই' —নাঃ মনে হচ্ছে মাম্পি এ তল্লাটে নেই।

ও কী! ও কী করেছিস রে! —সিঁড়ির তলায় মল্লিকা দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখ। একটা সাধারণ করে পরা নীল খড়কে ডুরে! চুলগুলো পেছন দিকে জড়ো করে একটা না-বড় না-ছোট হাতখোঁপা করা, কয়েকটা ঘুন্টিওয়ালা রুপোর কাঁটা গোঁজা তাতে, কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে হঠাৎ যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সৌন্দর্য, সাবলীলতা, অকৃত্রিমতা, কেমন একটা জ্যোতির্মণ্ডল যেন দিদিভাইকে ঘিরে, যার বাইরে সে বোধহয় চিরনির্বাসিত। সে চেয়ে থাকে রুদ্ধবাক যেন কোনও দেবীর দিকে চেয়ে আছে। সত্যি দেবী কি না জানে না, আর কারও দেবী কি না জানে না, কিন্তু তার উপাস্য দেবী। হয়তো শুধু তারই। কেননা ক্রমশই তার ধারণা হচ্ছে সে ছাড়া দিদিভাইয়ের পূর্ণ তাৎপর্য আর কেউই বুঝতে পারেনি। সম্পন্ন পরিবারে একটি মোটামুটি সুন্দর-সুশ্রী বধূর দরকার হয়। তার উৎস বড় ঘর হলে ভাল, না হলে আরও ভাল। সে ক্ষেত্রে তাকে বিনা বাধায় ভোগ করা যায়। বেচারি দিদিভাইয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া নেই। দিদি থাকেন সুদূর চেন্নাই, বাবা মারা গেছেন, কাকা কাকিমা ছাড়া কোনও আত্মীয়স্বজনের কথা আজ পর্যন্ত শোনেনি সে। বৃন্তহীন একটা মানুষ। তর্ক, ঝগড়া, নিজের মতামত জোরদার করে প্রকাশ করা—এসব নেই। তাই বলে কি ও বোবা? না মূর্খ! কোনওটাই নয়। একদিন তার অসীম ধৈর্য নিয়ে জিনা নালিশ করেছিল, তাতে মল্লিকা প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে প্রশ্নটা, বলে—তোরই বা ধৈর্য কি কম? আমি তো বুঝি তুই কতটা সইছিস! সবই তো শান্তির জন্যে?

জিনা তারপরেও তাকে চেপে ধরে, বলে, কথা ঘুরিয়ো না দিদিভাই, আমার কথার জবাব দাও।

মল্লিকা বলেছিল, আমি মতামত জাহির করবার মতো করে দিলে কে শুনবে সে মত? কে আমি? কী আমার পরিচয়? গ্রামের কলেজে পড়েছি, বি.এ-টা কমপ্লিট করিনি, সব সময়ে কারও না কারও দয়ায় বেঁচেছি। হ্যাঁ পেতাম তোর মুকুটের মতো কাউকে, তা হলে হয়তো অনেক দিন আগেই কনফিডেন্স আসত। এখন কেউ শুনবে না, আমার অন্য কোনও উপায়ও নেই। কিন্তু একটা না-একটা দিন আসবেই যেদিন আমি বলব, অন্যে শুনবে। ঝুম্পা মাম্পিকে বড় হতে দে।

—কিন্তু তুমি তো এই বাড়ির বড় বউ, গৃহিণী!

—আমার গৃহিণীত্ব ভীষণ ঠুনকো জিনা! সবাই ভাবতে ভালবাসে আমি অক্ষম, আমার জোর কম।

—বাবাও? বাবা যে তোমাকে এত ভালবাসেন!

—ঠিকই, বাবা খুব ভালবাসেন, দিদিভাই দুঃখিত গলায় বলে, কিন্তু ভালবাসা

অনেক রকমের হয় জিনা, বাবার ভালবাসাটাতে করুণা মেশানো আছে। বাবার দোষ নেই। মা ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বের মানুষ, তিনিও ভালবাসতেন। অমনি করুণা মেশানো ভালবাসতেই ভালবাসতেন, সেটাই উনি বাবার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন।

—তা হলে তোমার এই চুপচাপ থাকা, মুখ বুজে কাজ করে যাওয়া, তোমার এত ভুল... তুমি নিজেই বল তুমি অগোছালো... এ সবই তোমার একটা পলিসি?

—দুর, তুইও যেমন...একটু চুপ করে থেকে মল্লিকা বলেছিল,আমার কিছু ভাল লাগে না জিনা। সেই ভাল-না-লাগাটাকে বাগ মানাতেই মানাতেই আমার সময় কেটে যায়। জীবনও কেটে যাচ্ছে।

ভাল-না-লাগাকে বাগ মানাতে মানাতে একটা অদ্ভুত ধরনের বিষণ্ণ ব্যক্তিত্ব এক এক সময়ে ভীষণ প্রকট হয়ে ওঠে মল্লিকার চেহারায়। খুব মাঝে মাঝে। তখন তাকে চেনা যায় না। সেই চেহারা এখন। কথা বলছে পরিচিত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে। ঘরোয়া ভাষা, ভাব। যেন কিচ্ছুটি জানে না। কিন্তু আসলে সে যেন এক আমূল রহস্যময়ী, ছায়াবৃতা। মল্লিকা শুধু দিদিভাই নয়।

নিজের ঘোরটাকে কাটাতে জিনা তরতর করে নেমে আসে। হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে, দিদিভাই! যাচ্ছেতাই দেখাচ্ছে, না?

—যাচ্ছেতাই দেখাবে কেন? অন্যরকম দেখাচ্ছে! শুধু চুলের জন্যে এমন পালটে যায় চেহারা! আশ্চর্য!

—বদলটা কীরকম বলবে তো?

—তোর মধ্যে একটা দুষ্টু সরস্বতী দুষ্টু সরস্বতী ভাব ছিল, বুঝলি? এখন একটা ক্লিওপেট্রা ক্লিওপেট্রা ভাব এসেছে।

—বাপ রে! তা সে-ও তো দুষ্টুই!

—দুষ্টু কি না জানি না, একটা ক্ষমতা... প্রতাপ। ধর যেন ঘরের মেয়ে ছিলি, এখন রাজদণ্ড হাতে নিয়েছিস... গোছের।

—জান তো দিদিভাই— জিনা অমনি গলে জল— ক্লিওপেট্রা শুনলে আর কে না জল হবে! জলের চেয়েও তরল কিছু থাকত তো তাই হত।

—জান। দেড়দিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। বাবা কী ভাববেন?

—কী আবার ভাববেন? আর, কিছু যে বলবেন না সেটা তো তুই জানিস।

—বলবেন না। কিন্তু অদ্ভুত চোখে তাকাবেন, তাতেই আমার লজ্জা করবে। তোমাদের এ বাড়ি বড্ড জটিল যাই বল। আমাদের বাড়িতে বড়রা যা বলবার সোজাসুজি বলে, ধমকায় সেটা বুঝি...।

—তা যদি বলিস, এত বড় মেয়েকে ধমকানোই কি ভাল? তার যদি চুল কাটতে ইচ্ছে হয়! এটুকু ইচ্ছে পূরণ করতে পারবে না!

—ধমকানো মানে কি আর সেরকম সিরিয়াস কিছু? আমার বাবা হলে বলত— ক'দিন আসিসনি আমার সামনে। একটু সয়ে নিতে দে। জেঠিমা হলে বলত— এই যে রূপের ধুচুনি এলেন। এগুলো তো ইচ্ছেয় বাধা দেওয়া নয়। কিন্তু বেশ স্পষ্ট সমালোচনা।

মল্লিকা হেসে বলল, হয়েছে হয়েছে, আমি তো যথেষ্ট সোজাসুজি ধমকালুম! তাতেও হয়নি!

—তুমি তো আর এ বাড়ির নও! —কেমন অভিমানে বলল জিনা, যাই হোক দেখো তো তোমার ফ্রিজে গোটাদুই ডিম আছে কিনা! আমার দেখছি ডিম ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা দুটো কেন ছ'টা থাকলে ছ'টাই দাও। সবটাই করি। —বলতে বলতেই সে চমকে ওঠে। —ওই বেল বাজছে। মুকুট বোধহয় এসে গেল। —দাঁড়াও দিদিভাই... জিনা ছুট লাগাল।

মুকুট এসেছে শুনেই মল্লিকার একটা দুরন্ত আহ্লাদ হয়। কেন যে মেয়েটাকে তার এত ভাল লাগে, কেন যে এত আশ্বাস ওর সান্নিধ্যে তা সে বলতে পারে না। 'আধুনিকা', মুকুট আগাগোড়া 'আধুনিকা'। সে কি মল্লিকার ইচ্ছাপূরণ? আধুনিকা নানান প্রকারের হয়। সাজ-পোশাক-প্রসাধনে চলাফেরায় আধুনিকা একরকম। কথায়বার্তায় মতামতে আধুনিকা সে আরেকরকম। কিন্তু মুকুটের আধুনিকতা একদম স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা একটা গাছের মতো। প্রথম যেদিন এল— প্রচণ্ড একটা দুঃস্বপ্নের শেষে! জিনস্ আর শার্ট পরা। সোজা চুল কানের তলা পর্যন্ত ছেঁটে নিয়েছে, পায়ে স্পোর্টস শু। হাতগুলো খালি, শুদ্ধ, নির্মল, ঘাম চকচকে মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিচ্ছিল। কানে ছোট ছোট রিং। সোজা ভুরু, আকাশের মতো চোখ, একটু থ্যাবড়া নাক। বেশ পুরু, সুন্দর, গোলাপি ঠোঁট। মুখটা যেন ভাবুক বালিকার মতো, পুরো পুরুষ পুরুষ পোশাক সত্ত্বেও কোথাও কোনও উগ্রতা নেই। আসলে ও তো এ দেশের বাইরে বহুদিন কাজ করেছে। এই পোশাকে অভ্যস্ত। এটাতে ওর সুবিধে হয়, তাই অতশত ভাবেনি, এরকমই পরে। বাইরেটা সম্পর্কে এই একেবারে না ভাবা, সোজাসুজি ভেতরে পৌঁছে যাওয়ার অভ্যাসটা কী অদ্ভুত আরামের! যখন মল্লিকার সঙ্গে আলাপ হল, সোজা চোখের দিকে চাইল। —আপনি স্বপ্ন দেখে খুব ভয় পেয়েছিলেন? জিনা বলছিল!

—হ্যাঁ আর বলো না! দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়লে বড্ড স্বপ্ন দেখি।

—চিৎকার করেন?

—করি। আওয়াজ ফোটে না— বলতে বলতে মল্লিকা হেসে ফেলল, কেন? চিকিৎসা করবে?

—করতেও পারি একটা ব্যবস্থা— হাসিমুখে বলল মুকুট, আমার কিছু ট্রেনিংও আছে কিন্তু...।

এইজন্যে জিনা ডিম চাইছিল? কী করবে? কী? চট করে ভেবে নিল মল্লিকা। একটা বাটি করে ডিমগুলো নিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে সোজা চলে গেল জিনার রান্নাঘরে। ওর ফ্রিজে কী আছে? টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, বোতলের মটরশুটি। চিজ, পেঁয়াজ, বাঃ সবই তো আছে। নরওয়েজিয়ান ওমলেট তৈরির ইচ্ছে ছিল বোধহয় জিনার। তো হয়ে যাক। ওদের গল্পের টুকরোটাকরা ভেসে আসছে।

—তুইও তো কেটেছিস!

—আ রে! —বেশ করেছিস! চোখে পড়ল তাই...।

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছিস।

—একদিন যাব মাসিমার কাছে... তুই নিজে নিজেই চলে যাস না... হ্যাঁ রে সেবন্তীর কী খবর?

এইসব টুপটাপ কথাগুলো চারপাশে ঝরে পড়ছে। এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীর দরজায় দাঁড়িয়ে মল্লিকা। কফির উগ্র গন্ধে জিনা ছুটে এল।

—ও মা দিদিভাই!

—হয়ে গেছে —ওমলেট কাটতে কাটতে বলল মল্লিকা, নিয়ে যা... আমি কফি নিয়ে আসছি।

—আচ্ছা মল্লিকাদি, আমাকে জিজ্ঞেস করবে তো! —মুকুট বলল। —জিনা তুই জানবি আমায় কাজে কখন কোথায় ঘুরতে হয়। খিদে পেলেই আমি যেখানেই থাকি ঠিক কিছু-না-কিছু খেয়ে নিই। তাই-ই আমার আলসার হয় না। কফিটা ঠিক আছে... সে কফির কাপটা তুলে নিল।

মল্লিকার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মুকুট বলল, ঠিক আছে, যা রং আর চেহারা তোমার ওমলেটের, একটু না খেলে খেদ রয়ে যাবে।

তিনজনেই ওমলেট ভেঙে মুখে দিল। মুকুটের চোখগুলো প্রশংসায় বড় বড় হয়ে উঠেছে। —ইস, মল্লিকাদি একটা দোকান দিলে পার! আজকাল ফাস্ট ফুডের যা চাহিদা!

আগের দিন 'আপনি' বলেছিল, আজকে কত সহজে, বিনা অনুমতিতে 'তুমি' বলল, জিনার পথ ধরে যে 'দিদিভাই' বলল, তা-ও না। মল্লিকাদি! সেই স্কুল কলেজের দিনে নিচু ক্লাসের মেয়েরা যেভাবে ডাকত, তাদের ছাড়া আর কখনও কারও মল্লিকাদি হয়নি তো মল্লিকা। হয় বউমা, নয় মা, নয় মল্লি, নয় দিদি। কতটুকু জগৎটা তার? এখনও কোনও চৌকাঠ পার হতে পারেনি, মুকুটের মতো মেয়ে সে কখনও দেখেনি। টি.ভি-র পরদায় এই পোশাক কি আর দেখা যায় না! যায়! কিন্তু সেসব পুরোদস্তুর ত্বক-সচেতন, কেশ-সচেতন, পুং-সচেতন পোশাক, পোশাকও, মেয়েও। কে পুরুষের স্পর্শের লোভে ক্রিম মাখছে, কে বিয়ের লোভে ব্রণ সারাচ্ছে, ছোট ছোট মেয়েরা সহপাঠিনীকে ব্রণ-ফুসকুড়ি নিয়ে খেপাচ্ছে! মেয়েদের পৃথিবীটা কি সত্যি এরকম! কে জানে! মল্লিকা জানে না। তার কাছে বাইরের পৃথিবীর খোলা জানলা তো ওই টি.ভি স্ক্রিনই। তার অগোচরে কখন পুরো মেয়ে-পৃথিবীটা এরকম বদলে গেল? নিজের মেয়েদের দেখে অবশ্য অতটা বুঝতে পারে না মল্লিকা। ওদের স্কুল খুব কড়া, এতটুকু অতিরিক্ত সাজগোজ বরদাস্ত করে না। বড় মেয়ে সদ্য কলেজে ঢুকেছে। আরেকটু স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু তার অভ্যেস রয়ে গেছে স্কুলের। শুধু য়ুনিফর্মটাই বাদ। সেই টান টান চুলে বিনুনি। সেই ঘষামাজা তেলা মুখ, টিপ পরতে এখনও ভীষণ লজ্জা। কিন্তু সে হয়তো তারা মল্লিকার মেয়ে বলে, একজন প্রায় অনাথা অতি ভালমানুষ প্রতিবাদহীন গ্রামের মেয়ের মেয়ে। কিন্তু তার খুব ভয় করে। হঠাৎ যদি কোনওদিন দেখে ঝুম্পা তার মায়ের চৌকাঠ পার হয়ে গেছে! চোলি আর হাফপ্যান্ট পরে চোখ মারছে কোনও পুরুষের দিকে চেয়ে! ওদের বয়সি ছেলেরা! তারাও তো টি.ভি-র পরদায় কেমন বদলে যাচ্ছে। কী সুন্দর নবীন সবুজ ছিল,

বেড়ে ওঠা ছেলেদের একটা আলাদা খেলাধুলোর জগৎ থাকে। পড়াশোনার ব্যাপারেও, বিজ্ঞান, মেকানিক্স— এসবের আশ্চর্য জগৎটার ভেতর আস্তে আস্তে ঢুকে যায় তারা। মোটরবাইক জড়ো করে মেয়েদের কলেজের বাইরে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিতে তাদের নবীন সবুজ পুরুষত্ব ধাক্কা খায় না? লজ্জা করে না? ড্রাগ নেয় কেন? একটা ফ্যাশন হয়েছে। ড্রাগ নেওয়া। এসব আগে করত মস্তানরা। চিরকালই ছিল। কিন্তু একটা আলাদা জাত। সাধারণত যারা বছরের পর বছর এক ক্লাসে পড়ে থাকত তারাই এসব ড্রাগফাগ খেত, আওয়াজটাওয়াজ দিত। এখন কি মস্তান ছড়িয়ে চারিয়ে গেল সব কিশোরের তরুণের মধ্যে? না কি এ-ও বিজ্ঞাপনের তৈরি। ফিলমের তৈরি একটা ভুয়ো জগৎ! মিথ্যার জগৎ! নিজের সীমাবদ্ধ চলাফেরা দিয়ে সে বুঝতে পারে না।

প্লেটগুলো তুলে নিয়ে সে বলল, তোরা কথা বল, আমি আসছি।

মুকুট বলল, বসো না! কাজ আছে?

জিনা বলল, একটু বসতে তোমার যে কী হয়?

কিন্তু মল্লিকা জানে, মুকুট জিনার খুব বন্ধু। কতদিন বাইরে ছিল। যদি-বা ফিরে এসেছে রোজ রোজ তো আর দেখা হচ্ছে না। ওদের একটু নিজেদের মধ্যে কথা বলার সুযোগ চাই। সে বলল, হ্যাঁ, মেয়েরা যে কোনও সময়ে আসবে, আমি যাই।

—ওরা এসে গেলে, আবার এসো— জিনা বলল।

মুকুট বলল, ঘুরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

একটু পরে জিনার দিকে চেয়ে মুকুট বলল, তোর জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি।

—এরই মধ্যে?

—কেন তুই কি তৈরি নয়?

—না রে! আশ্চর্য লাগল, কাল বললুম আর আজই...।

মুকুট বলল, আমাদের একটা অ্যাডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম আছে। দুপুরবেলা যখন ভাতঘুম দিয়ে মোটা হবার সবচেয়ে রিস্‌ক তখন ক্লাসটা হয়।

—কোথায়?

—এখান থেকে বাস নিয়ে জাস্ট সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ চলে যাবি। ডাইনে হাঁটতে হবে কিছুটা, বাঁ দিকে কয়েকটা গলি পরে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট চিনিস?

—দুর, আমি এদিকে কিচ্ছু চিনি না।

—ঠিক আছে আমি তোকে প্রথম কদিন নিয়ে যাব। 'বান্ধব সমিতি' সাইনবোর্ড লেখা একটা ক্লাবঘর পাবি। ওইখানেই একটা গলির মধ্যে। কোর্সটা তোকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবে একজন। ওই অঞ্চলের মেয়েরা, ধর বারো-তেরো জন আসবে।

জিনা চুপ করে আছে দেখে মুকুট বলল, বাংলা, আর খানিকটা ইংরেজি লিখতে পড়তে বুঝতে শেখানো হয় এদের, আর বেসিক অঙ্ক।

—শহর কলকাতায় থাকে, বাংলা পড়তে লিখতে পারে না এমন লোকও আছে?

মুকুট হাসল, তোদের বাড়িতে কাজ করে যেসব মেয়ে। ওরা? ওরা পারে?

জিনা বলল, ওহ। ডলি মলি? ওদের তো বাবা মানে আমার শ্বশুরমশাই-ই লেখাপড়া শেখান। এরা কে রে? বস্তিটস্তির?

মুকুট বলল, না রে এরা গণিকা, যাকে বলিস প্রস্টিট্যুট।

জিনা হাঁ। কিছুক্ষণ কথা বার হচ্ছে না ওর মুখ থেকে। শেষে বলল, মুকুট, প্রস্টিট্যুট আমি কখনও চোখে দেখিনি রে! কীরকম দেখতে হয়।

মুকুট হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না, বলে, জিনা সত্যি তুই আমায় হাসালি। কীরকম দেখতে হয় কী রে? দুটো হাত, দুটো পা আছে আমাদের মতোই...

ঢোঁক গিলে জিনা বলল, গল্প-উপন্যাসে অবশ্য খুব পড়া যায়। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' বলে একটা গল্প পড়েছিলাম। আমার গা এত ঘিনঘিন করেছিল! একটা শিউরে ওঠার ভাব করলে সে।

মুকুট বলল, 'হিঙের কচুরি' বলে বিভূতিভূষণের একটা গল্প আছে খুব সুন্দর, পড়িসনি?

জিনা বলল, তুই বললি বলে মনে পড়ল। ব্যাপারটাকে এত ক্যাজুয়ালি নিয়েছেন, নেন এঁরা যে... আমার ভাল লাগেনি, ভাল লাগে না।

মুকুট বলল, কথাটা তুই বেশ নতুন বললি তো? ক্যাজুয়ালি নেওয়া।

—না সত্যিই দেখ, মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান, মেয়েদের... নারীত্বের এত কুৎসিত ব্যবহার— এই নিয়ে লেখকরা বেশ বিলাসিতা করেন। ভাল গল্পের মেটেরিয়্যাল। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো', 'দেবদাস'-এ কীভাবে গ্ল্যামারাইজ করা হয়েছে ব্যাপারটা। আর তার পরের লেখকরা তো রিয়্যালিজ্‌মের নামে — উঃ। হ্যাঁ রে, এঁরা কি নিয়ম করে এদের কাছে যাতায়াত করেন?

—দুর— মুকুট হেসে ফেলল, বেশির ভাগই ওপর ওপর দেখে, কল্পনা থেকে লেখা। অনেকে আবার উপাদান সংগ্রহের জন্য যান। শিল্পী লেখকদের সঙ্গে অবশ্য লালবাতি এলাকার একটা যোগ থাকেও মনে হয়। আমি খুব একটা দেখিনি।

—উপাদানটা ব্যবহার করে এঁরা নিজেরা নাম, টাকা পান। আর মেয়েগুলোর কী হয়?

—কিছু হয় না। কিছু হওয়া শক্ত জিনা। একজন দু'জনের চেষ্টায় কী হবে? তাই অনেকে মিলে চেষ্টা করছে। করবি কাজটা?

—আমি? ওদের পড়াতে যাব?

—তাতে কী? তোর মতো কত মেয়ে এদের বিভিন্ন সেন্টারে পড়াচ্ছে। গেলে দেখতে পাবি। কেউ তোর চেয়ে বড়, কেউ ছোট। মানে ভদ্রঘরের, শিক্ষিত। ওখানে তোর ক্লাসরুমের ঠিক পাশেই একটা ক্লিনিকও আছে। সেখানে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ছোটখাটো চিকিৎসাও হয়।

জিনা বলল, জানলে আমায় কুটে ফেলবে।

—কে? তোর বর?

—আবার কে? অন্যরাও পছন্দ করবে না শিয়োর।

—হ্যাঁ ট্যাবু তো আছেই, তা তুই নিজে? তোর কী মত?

—আমার গা শিউরোচ্ছে। অনেস্টলি বলছি মুকুট।

—তা হলে থাক। অন্য কাজও আমাদের আছে। কিন্তু সেখানে আপাতত ভেক্যান্সি নেই। দূরেও। এটাই তোর সবচেয়ে কাছে ছিল। ঘণ্টা দেড়েক পড়াতিস। একটা থেকে চারটের মধ্যে। সপ্তাহে তিন দিন। তোরও সময় কাটত। একটা স্যাটিসফ্যাকশনও থাকত যে মেয়েদের জন্যে কিছু করলি। সামান্য কিছু উপার্জনও হত। তোর নিজের, একেবারে নিজের উপার্জন।

—তুই এসব কাজের খোঁজ পেলি কী করে?

—বা! আমি এম এসসি-র রেজাল্ট বেরোবার আগেই থাইল্যান্ড চলে গেলাম না? তখন থেকেই এদের নিয়ে কাজ করছি। ডাবলু. এইচ. ও-র সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছি। সেই হিসেবে অনেকগুলো এন. জি. ও-তেই উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছি।

—তার মানে তোকে পড়াতে হয় না, ওখানে যেতে হয় না, সোজাসুজি ওদের সঙ্গে...।

—না রে জিনা, —বিভিন্ন সেন্টারে পড়ানো, ট্রেনিং, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সবের ওপর হাতেকলমে যে কাজগুলো হয়, সেগুলোর খবরদারি করে কয়েকজন, আমি তাদেরও ওপর খবরদারি করি। এখন বেশির ভাগটাই ডেস্ক ওয়ার্ক। তবে পরিদর্শন করতেই হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর। সমীক্ষা যাকে বলে।

—এইসব ইয়েদের নিয়ে?

—হ্যাঁ।

—কেন করিস মুকুট? যারা জাহান্নমে যাবে ঠিক করে নিয়েছে...

মুকুট তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, তুই কাগজ পড়িস না!

—পড়িই তো! শব্দজব্দগুলো রেগুলার করি, ক্রস ওয়ার্ড। মিসেলেনিগুলোর ভাল লেখাটেখা থাকলে পড়ি। পলিটিক্স আমি ছুঁই না। আর তো সব খুন, রাহাজানি, রেপ, দাঙ্গা... কী পড়বটা কী?

—এবার থেকে আর একটু ভাল করে পড়বি। দেখবি এখানে সেখানে বাচ্চা মেয়ে বড় মেয়ে পাচার হচ্ছিল। ধরা পড়েছে। গ্রামে, মফস্বলে। এগুলোর মধ্যে কিছু চুরি, কিছু জোচ্চুরি, আবার কিছু জেনেবুঝে নিজের লোকেরা বিক্রি করে দিয়েছে।

—বলিস কী? নিজের লোকেরা? মানে? মানুষ বিক্রি করা যায় নাকি?

—যায় না। কিন্তু জিনিসটা হয়। এরাই প্রধানত লালবাতি এলাকায় এসে পড়ে। তুই কখনও পড়িসনি?

—ইস মুকুট, পড়েছি হয়তো, সেভাবে মাথায় ঢোকেনি।

—শুনে রাখ জিনা দারিদ্র আর অশিক্ষার প্রথম শিকার মেয়েরা। দরিদ্র ঘরে যেই একটা মেয়ে জন্মাল অমনি তাকে নিয়ে যা-খুশি করবার অধিকার জন্মে যায় তার পুরুষ অভিভাবকদের। তার মা ঠাকুমা যারা কর্ত্রীপদে আছে তারাও সেইমতোই আচরণ করে। সবচেয়ে কম খাবার তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়, সবচেয়ে

বেশি কাজ। কোনও সময়েই ভারবাহী পশুর চেয়ে বেশি তাকে মনে করা হয় না। উপরন্তু এই পশু যেটুকু যত্ন পায়, এরা তা-ও পায় না। কিন্তু মেয়েরা দুগ্ধবতী গাভীর মতোই লাভজনক। যৌবনোদ্গম হলেই সে যৌন পণ্য। তাকে নানারকম দামে বিক্রি করা যায়। যত অল্প বয়স হবে ততই লাভ। ধর ন-দশ বছরের...

—প্লিজ মুকুট...।

—এ কী জিনা, তুই কাঁদছিস? আ রে কাঁদিসনি, কী ছেলেমানুষ তুই? কত রকমের অত্যাচার, পাশবিক, নৃশংস, চলছে কত কাল থেকে তার তুই কিছুই জানিস না। ছেলে-শিশুদের দিয়েও ব্যবসা আছে। যৌন-ব্যবসা, জকি-ব্যবসা, ভিখারি-ব্যবসা! সেসব শুনলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবি!

—তোরা এদের জন্যে কাজ করছিস? —অনেক টাকাপয়সা লাগে তো! কোথা থেকে পাস? জিনা ভিজে গলায় বলল।

—অনেক সোর্স থেকে আসে। বিভিন্ন ধনী দেশ দেয়, অনেক প্রতিষ্ঠান দেয়, ব্যক্তি দেয়। ধর একজন বারবনিতা তাঁর অনেকখানি জমি আমার এক বন্ধুকে দিয়েছেন এদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে।

—শেষেরটা বুঝলুম— জিনা বলল। কিন্তু ধনী দেশটেশ দেবে কেন? ওরা তো খালি নিজেদেরটাই বোঝে।

—কথাটা 'তুই' বললি? —হাসিমুখে মুকুট তাকায় জিনার দিকে।

—কেন, কী হয়েছে?

—না, তুই বললি না খালি 'শব্দজব্দ' 'ক্রসওয়ার্ড' এসব করিস! তা তুই যেখান থেকেই তোর এ জ্ঞান সংগ্রহ করে থাকিস জিনা, তোর হবে।

—ঠাট্টা করছিস?

—না রে। ঠাট্টা করিনি। আসলে জিনা, পৃথিবীটা, সরি মানুষ খুব জটিল আর মিশ্র জীব। বড় বড় ব্যবসাদার যারা ওষুধে ভেজাল মেশায়, দুধে খড়ির গুঁড়ো, কিংবা যারা কর্মচারীদের সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করে তারাই দেখবি কাঙালিভোজন করায়, কুম্ভে গঙ্গাসাগরে সাধুদের ভাণ্ডারা দেয়, লঙ্গরখানা খোলে। সবটাই যে পুণ্যের লোভে তা নয়। একটা কীরকম বিবেকের তাড়াও ভেতরে ভেতরে থাকে। তেমনই যে দেশ নানাপথে নিজেদের মজুত অস্ত্র বিক্রি করে আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে, বাতিল ওষুধ বাতিল শস্য পাঠিয়ে সংকট সৃষ্টি করছে, তারাই আবার অনাথ শিশুদের কল্যাণের জন্যে টাকা দেয়।

—একেবারে নিস্বার্থ? মুকুট আমার বিশ্বাস হয় না।

—তুই ঠিকই বলেছিস, গণিকাদের ব্যাপারে ওদের প্রধান স্বার্থ এডস-নিবারণ। এডস তো পুরো সভ্যতার মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা! পীতরা, কালোরা, ব্রাউনরা গেলে হয়তো সাদাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু সাদারাও তো বাঁচবে না বাঁচছে না, তা এইভাবেই একটার সঙ্গে আরও অনেক ইস্যু জুড়ে যায়। স্বাস্থ্য, বিশেষত যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেসিক জ্ঞান কনডোমের ব্যবহার... তারপরে ধর চাইল্ড লেবর নিষিদ্ধ করার পেছনেও ওদের মার্কেট বিষয়ক কোনও স্বার্থ কাজ করতে পারে। কোনটাই যে শুধু স্বার্থ এমন কথা বলা শক্ত। বিক্রির স্বার্থই যে

একমাত্র সবসময়ে তা নয়। যা-ই হোক। যা-ই থাক। যা পাচ্ছি, সেটাকে ব্যবহার করে যদি কাজের কাজ কিছু করতে পারা যায় তো মন্দ কী? চতুর্দিকে প্রচুর প্রতিষ্ঠান, স্বার্থলোভী লোক সব হন্যে হয়ে ঘুরছে, গ্রান্টটান্ট জুটিয়ে যদি নিজেরটা গুছিয়ে নিতে পারা যায়। আবার সত্যি সত্যি কাজ করতে চায় এমন লোকও আছে।

—তুই নিজের সারা জীবনটা এইভাবে উৎসর্গ করবি?

—আ রে! উৎসর্গটর্গ নয়। এটা আমার পেশা। ঠিক যেমন লোকে ব্যাকটিরিয়া নিয়ে, জিন নিয়ে রিসার্চ করে, আমিও তেমন করছি। যে কোনও কাজে পেশাদারি দক্ষতা দরকার হয়, অধ্যাপনা, ম্যানেজমেন্ট, হিসেবনিকেশ সবেতে। এটাতেও তেমনি। শুধু স্যাক্রিফাইস দিয়ে বা আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ দিয়ে কিছু হয় না রে! জনকল্যাণ কিছু চাকরিও তো সৃষ্টি করছে!

—যেমন এই অ্যাডাল্ট এডুকেশনের টিচারদের?

—রাইট। আমি এবার চলি রে জিনা, কাল খুব সকালে ট্রেন ধরতে হবে।

—তুই রাগ করলি?

—না, রাগ করব কেন! এটাই গড়পড়তা রি-অ্যাকশান। ও ভাল কথা, মল্লিকাদিকে একটু ডাক তো!

একটু পরে মল্লিকা এসে দাঁড়ালে মুকুট বলল, মল্লিকাদি, তোমার সেই বাঘের স্বপ্নটা যে সেদিন শুনলাম, ওটা নিয়ে অনেক ভেবেছি জান! যে ভাবেই ভাবি একটা ব্যাখ্যাতেই পৌঁছোচ্ছি।

মল্লিকা বলল, দুর, তুমি ও নিয়ে ভাবা ছেড়ে দাও। ওর কোনও মানে নেই।

—নাঃ, মানে আছে। স্বপ্নটা আমার কেমন চেনা চেনা লাগছিল। একেবারে টেক্সট বুক ড্রিম যেন। কদিন আমার ডায়েরিগুলো খুঁজছিলাম। একটি অল্পবয়সি ধরো তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে, খুব স্যাড কেস, মেয়েটিকে তার জনৈক বয়স্ক আত্মীয় রেপ করত, কাউকে ও বলতে পারত না। এই ধরনের স্বপ্ন দেখত। একটা বাঘ আকাশ থেকে লাফ দিয়ে ছাতে পড়ল, ছাত থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, ঘর বাড়ি সব ভেঙে.. কী হল? কী হল?

জিনা বলল—যা, মুকুট তোর কোনও সেন্স নেই। দিদিভাই! শরীর খারাপ লাগছে? সোফায় বসে পড়েছিল মল্লিকা, কুলকুল করে ঘামছে। চোখের সামনে অন্ধকার। কত দূর থেকে যেন জিনাদের গলা ভেসে আসছে। জলের ছিটে পড়ছে মুখে।

মুকুট বলল, জিনা তুই বরফ দিয়ে ভাল করে এক গ্লাস শরবত করে নিয়ে আয় তো! জাস্ট নুন-চিনি-লেবুর শরবত। চিনিটা ঠান্ডা জলে গুলতে চায় না। ভাল করে মিশিয়ে নিবি। আমি দেখছি।

জিনা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুকুট দ্রুত এগিয়ে এসে মল্লিকার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল। বলল, মল্লিকাদি জিনা এক্ষুনি আসবে, চট করে কতকগুলো কথা শুনে নাও। তোমার বাঘ যদি অতীতের হয়, তো ভুলতে চেষ্টা করো। ফিফটি পার্সেন্ট মেয়ের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, সো-জা ভুলে যাও। আর ব্যাপারটা

যদি বর্তমানের হয়, তা হলে ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই, প্রতিবাদ করো। কড়া প্রতিবাদ, সে তোমার স্বামী হলেও। সহ্য করতে থাকলে তোমার মানসিক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। তোমারও সেই লোকটিরও, ন্যাচার‍্যালি তোমার পরিবারেরও।

—অনিলা দাসী!

—উপস্থিত

—বনমালা রাহা

—উপস্থিত

—সর্বজয়া দাসী

—উপস্থিত

—পূর্ণিমা দাসী...

—লক্ষ্মী দাসী

রোলকল বন্ধ রেখে জিনা বলল, তোমরা বেশির ভাগই দেখছি দাসী লেখ! তোমাদের পদবি কি দাস?

নানা বয়সের মেয়েগুলি চোখ মটকে একে অন্যের দিকে চেয়ে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

জিনা বিরক্ত হয়ে বলল, একটু সোজা হয়ে বসতে পার না? তোমাদের কি শিরদাঁড়া নেই? সব সময়েই হেলছ! না হেসে আমার কথার জবাব দাও।

প্রায় দু'মাস হয়ে গেছে। এতদিনে জিনার জড়তা খানিকটা কেটেছে। মুকুট চলে যাবার পর সে কয়েক দিন খালি ভেবেছে, ভেবেছে আর ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে মনে হল সত্যি কী উদ্দেশ্যহীন জীবন তার! আহার-নিদ্রা-মৈথুন। দিনের পর দিন। দিনের পর দিন। স্বামীকে তার পেশাতে সাহায্য করার উপায়ও তার নেই। বাড়ির কাজকর্ম সে ইচ্ছে ক'রে করে বটে, কিন্তু সে না করলেও আটকাবে না। সামাজিক মেলামেশার সুযোগ কম। কেমন যেন শূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে সে ইদানীং। একটা বাচ্চাটাচ্চা হলে নিজেকে এরকম অপদার্থ লাগত না। হলেই হয়। অথচ কিছুতেই হচ্ছে না। এ নিয়ে হা-হুতাশ করতে তার ভাল লাগে না। আর মুকুট? দিনরাত্র ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত। সবাই ব্যস্ত। নিখিল ব্যস্ত তার চাকরি নিয়ে, দাদা ব্যস্ত তাঁর তাস নিয়ে, দিদিভাই ব্যস্ত তার সংসার, মেয়েদের চৌকশ করে তোলা নিয়ে। শ্বশুরমশাই ব্যস্ত তাঁর চ্যারিটি-ক্লাস নিয়ে। একমাত্র পূর্ণ মাত্রায় অলস, কর্মহীন সে। জিনা। দাঁতে নখ কাটার বদভ্যাসটা তার এখনও যায়নি। ভাবতে ভাবতে ডান হাতের তিনখানা আঙুলের নখ চিবিয়ে সে শেষ করে দিল। তারপর ভেবে-চিন্তে শ্বশুরমশাইয়ের ঘরে গেল।

—বাবা?

ধড়মড় করে আরামচেয়ারে উঠে বসলেন কল্যাণবাবু।

—কিছু বলছ?

—হ্যাঁ বাবা, তার ওড়নাটা জিনা ডান হাতে সাত পাক জড়িয়েই ফেলল।

—আমার বন্ধু মুকুটকে দেখেছেন তো!

—হ্যাঁ—সেদিন তো আলাপ হল।

—ও বলছিল। মানে দুপুরে তো কোনও কাজ থাকে না, তা ছাড়া এনগেজ্‌ড্

থাকা ভাল।

জিনা এত কিন্তু কিন্তু? এটা নতুন ব্যাপার মনে হল কল্যাণবাবুর।

বললেন, হ্যাঁ বলো না।

—যদি অ্যাডাল্ট এডুকেশনের একটা ক্লাস করি। একটা থেকে চারটের মধ্যে। আপনি বেরোবার আগেই ফিরে আসব।

কল্যাণবাবু বিকেলে নিয়ম করে বেড়াতে বার হন।

—আমার ফিরে আসা না-আসার জন্যে তোমার ভাববার কোনও দরকার নেই। আমাকে একটা চাবি দিয়ে দিলেই তো হয়! কিন্তু তুমি যাবে কিনা...ছোট বউমা, আমি তো তোমার গার্জেন নই!

—কেন নয়! —জিনা অপ্রস্তুত মুখে বলল— ঠিক আছে কাজটা...কাজ করাটা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় বাবা!

কল্যাণবাবু মনে মনে ভাবলেন এ মেয়ের এবার একটা বাচ্চা হওয়া খুব দরকার। এরা যে কী করছে! ডাক্তার-টাক্তার দেখাক! তিনি আরও ভাবলেন— জিনা করবে অ্যাডাল্ট এডুকেশন? সম্পন্ন বাড়ির আহ্লাদি মেয়ে, বড় চাকুরের বউ। এমনিতে খুবই কর্মদক্ষ, সুন্দর স্বভাব, হাসিখুশি, ভাল। বুদ্ধিমত্তাও খুব, কিন্তু একটু কি তরলমতি, হালকা সুখী সুখী নয়?

তিনি বললেন, তুমি তো জানো মা, আমি নিজেই অনেক দিন থেকে স্ট্রিট বয়েজদের একটা-দুটো ক্লাস নিই। এডুকেশন যাকেই দাও, যখনই দাও— আমার খারাপ মনে হবার কোনও কারণই নেই।

জিনা অমনি এগিয়ে গিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকল তাঁকে।

—তা হলে কাজটা আমি করছি বাবা, বলেই প্রায় ছুট।

—শোনো, শোনো, —কল্যাণবাবু ব্যস্ত হয়ে পিছু ডাকলেন-- আমার মতের ওপর নির্ভর করে কিছু করো না। আবারও বলছি আমি তোমায় অনুমতি দেবার কেউ নই মা!

মাথাটা হেলাল জিনা। খুব বুঝেছে।

কিন্তু নিখিলের কাছে সে আদৌ সেভাবে অনুমতি নেয়নি। স্টেপকাটিনী বউকে নিয়ে নিখিল ইদানীং খুব মেতেছে। বুটিক থেকে দামি ডিজাইনার সালোয়ার-কামিজ কিনে দিল, দুদিন শহরের দুটো বিখ্যাত নাইট-ক্লাবে নিয়ে গেল। মাতিজ ছুটিয়ে দিঘা ঘুরিয়ে নিয়ে এল। তারই ফাঁকে জিনা বেমালুম বলে দিল— আমি একটা অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টারে যাচ্ছি, জান? --দারুণ লাগছে।

—তাই? ভাল লাগল?

—হ্যাঁ, আমি বলে দিলুম, সপ্তাহে তিনদিন পড়াব, দুপুরবেলায়। কেউ তোমরা বাড়ি থাক না। বসে বসে মোটা হই আর বোর্ড হই!

—অমনি তুমি ঠিক করে নিলে? আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করলে না!

—আহা! তুমি কি আমার গার্জেন নাকি?

—ও, আমি তোমার গার্জেন নই? তো সেটি আজকাল কে হচ্ছেন?

—কে আবার? আমি একটা তিরিশ ছুঁই ছুঁই ইয়াং লেডি। একটা ক্লাস নেব,

সমাজসেবা করব তার আবার অনুমতি! গার্জেন! জিজ্ঞেস! রাখো তো!

জিনার কূটনীতির কাছে নিখিলের এই প্রথম হার। হেরে যে গেল সেটা বেচারি বুঝতেই পারেনি। কী যেন একটা সামান্য মাসির বাড়ি, দিদির বাড়ি যাওয়া বিষয়ে তাকে জানাচ্ছে, এরকম একটা উড়িয়ে দেওয়া লঘু ভঙ্গি জিনার। নিখিল কিছু বলেনি।

জিনা প্রথম প্রথম যেত যেন সে-ই সমাজ পরিত্যক্তা, অপরাধিনী, চোখ তুলে চাইতে পারত না। যখন প্রথম সংকোচটা কাটল, তখন আবার শুরু হল দ্বিতীয় সংকোচ। তার মহার্ঘ শরীর, তার ত্বকের দামি জেল্লা, বসনভূষণের ঔজ্জ্বল্য, রুচি, তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের সৌগন্ধ, সমস্ত কী মিলিয়ে সে যে ওই কালিপড়া বালিখসা ঘরে নানা বয়সের জীর্ণ মেয়েগুলির পাশে একটা ভীষণ বেমানান প্রশ্নচিহ্ন, এই বোধ কিছুতেই তাকে সহজ হতে দিচ্ছিল না। এখন কিছুটা হয়েছে। সে এদের মনে করে তার সাবালক বড় জোর বয়স্ক ছাত্রী। এর চেয়ে অন্যরকম কিছু না। সাধারণ স্কুলে যে ধরনের সভ্যতা, শৃঙ্খলা, মনোযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে দাবি করা হয় সেটাই সে এদের থেকে আশা করে। এদের আগের দিদিমণি এত কড়া ছিলেন না। একটু শিখলেই তিনি কৃতার্থ হয়ে যেতেন। শাবাশ দিতেন। যেন তারা ছেলেমানুষ। সেটাতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এ দিদিমণি সমানে সমানে মেশেন না তাদের সঙ্গে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। এতে প্রথম প্রথম একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ক্রমশ তারা বুঝতে শিখেছে এটা ঠিক 'দেমাক' নয়। দিদিমণি তো! দূরত্বটা দিদিমণিত্বের।

সবচেয়ে যেটা তাদের টানে সেটা হল দিদিমণির গল্প বলা। খুব ভাল ভাল গল্প বলেন। প্রথম দিন দুয়েক গল্প বললেন— একটা লোক চাকরি করতে গিয়ে এক নির্জন পাষাণপুরীতে আশ্রয় নেয়, সেখানে সে কীরকম সুন্দরী মেয়ের ভূত দেখে, বাদশা সুলতান, হাবশি খোজাদের ভূত দেখে, একজন আধপাগল লোক সকাল হলেই 'সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়' বলতে বলতে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম দিনেই এই গল্পটা বলে ছাত্রীদের মোহিত করে দেন দিদি। দ্বিতীয় দিন শোনালেন এক কিপটে বুড়ো কীভাবে ভুল করে তার নিজের নাতিকেই মাটির তলার ঘরে জ্যান্ত বন্দি করে যখ বানিয়ে দেয় সেই লোম-খাড়া-করা গল্প। মাঝে মাঝে আবার নতুন দিদিমণি তাদের টুকটাক মজাদার জিনিস খেতে দেন। এগুলো তাঁর নিজেরই হাতে করা কিনা সে নিয়ে জল্পনা চলছে। একজন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ধমক খেয়েছিল। —সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী? হাসি হাসি মুখখানি দিদিমণির। কিন্তু কড়া আছে।

—কী হল? জবাব দাও!

—একজন বলল, দাস নয়, আমরা দাসী-ই।

—দাসী বলে কোনও পদবি আমি কখনও শুনিনি, জিনা বলল। তখন আরেকজন বলল— আমাদের আবার পদুবী কী? বংশ নেই, ধারা নেই, বাপ নেই!

—মায়েরও তো কোনও না কোনও পদবি ছিল।

—মা-ও দাসী।

ক্লাসের শেষে, যখন সবাই চলে গেল, সবচেয়ে ভাল ছাত্রীটি যাকে সে 'ক্ষীরের পুতুল' পড়তে দিয়েছে, সে রয়ে গেল। এ প্রায় প্রতিদিনই রয়ে যায়। কিছু না-কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তার। যেমন, যকের গল্পটা সত্যি কিনা, তাদের গ্রামে এরকম দু-তিনটে যক ছিল, একজনের চেহারা সে ছোটবেলায় দেখেছে। এক্কেবারে সাধারণ মানুষের মতো, খালি হাঁ করলেই কুমির-দাঁত দেখা যায়, আর নখের ডগা ছুরির ফলার মতো। তার নিজের নখ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। দিদিমণি এর কোনও প্রতিকার জানেন কিনা...ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ তার টাস্‌ক্ ছিল— 'ক্ষীরের পুতুল'-এর গল্পটা নিজের মতো করে লিখে আনা। জিনা ক্লাসরুমে বসেই লেখাটা দেখে দিল। অজস্র বানান ভুল সত্ত্বেও গল্পটা দাঁড় করিয়েছে।

জিনা বলল, ভাল হয়েছে বনমালা, বই দেখে দেখে বানানগুলো শুধরে এনো। তাদের এখানকার পদ্ধতিতে বানানটানান নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করাই থাকে। তা হলে নাকি এদের শেখার উৎসাহ চলে যাবে। কিন্তু সে দেখেছে, বানান বা বাক্য রচনারীতির ওপর জোর দিলে মনটা পড়ায় বসে ভাল। তা ছাড়া সবার ক্ষমতাও তো এক নয়। যারা পারবে বলে মনে হয়, তাদের এগিয়ে যেতে সে সবসময়ে উৎসাহ দেয়।

আজ বনমালা মুখ খুলল, দিদিমণি, আমাদের আসল পদবি থাকলেও কইতে নাই, মানা আছে।

—কে মানা করেছে।

—বাড়ি থেকেই।

—বাড়ি থেকে? মানে?

—মেসোর কাছ থেকে বিককিরি হয়ে তো আসি! এমনি ধরুন বাপের কাছ থেকে, সোয়ামির কাছ থেকে বিককিরি হয়েও তো মেয়েছেলে আসছে। তাদের বলে দেয়, তোর আর পদুবি রইল না, বলবি দাসী।

—তুমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছ, জানতে?

—মিথ্যে বলব না দিদি, জানতুম। তবে সে বিককিরির ঠিক মানেটা কী, তা কি আর বুঝেছি! মেসো-মাসির সাতটা ছেলেপুলে, আমি বাপ-মা মরে গিয়ে উঠলুম, আটটা হয়ে গেল। খেতে দিতে পারে না। দিন রাত খ্যাঁক খ্যাঁক আর খাটুনি। একদিন একটা লোক এল, এখন বুঝি আড়কাঠি। তার আমাকে পছন্দ হল, তখন আমার ন বছর বয়স। পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল মেসোকে। মেসো বলল— যা তুই বিককিরি হয়ে গেলি, খাটবিখুটবি, খেতে পাবি পেট ভরে। আমাদের ভুলে যা। এ পদুবি এ নাম নিবি না খবদ্দার। অতশত তো বুঝতুম না। গাঁয়ে নাম ছিল বনলতা, এখানে মাসি বলল বনমালা বেশি ভাল শোনাবে। তাই, তা-ই।

—তা তুমি যে রাহা বল?...জিনা মনে মনে বলল— 'সেন' হলেই তো ষোলোকলা পূর্ণ হত।

—ওই আড়কাঠিটা তো রাহা ছিল। ওর সঙ্গেই তো প্রথম ক মাস...বলতে

বলতে দিদিমণির ছাইয়ের মতো মুখের দিকে তাকিয়ে বনমালা থেমে গিয়ে মুখ নিচু করল।

—তারপরে? —জিনা জিজ্ঞেস করে। ন' বছরের মেয়ে? ন বছর? এরা কারা? এই আড়কাঠি...এই মাসি...এদের খদ্দের...কারা?

—মুখ দিয়ে একদিন রাহা বেরিয়ে গেল দিদি। সেই থেকে রাহা হয়েই আছি। তা ওই পারুল? ওর সোয়ামি তো পুরুতঠাকুর! ভটচায্যি বামুন। ও-ও তো নিজেকে দাসী বলে। গাঁজা, আফিম, মদ কিছু বাকি ছিল না বরটার। মেরে ধামসে দিত একেবারে। তারপর নেশার জোগাড় করতে ঘরেতেই লোক জোটাতে শুরু করে। পারুল দেখলে এ তো মজা মন্দ নয়! তার গতর-বেচা টাকা দিয়ে নেশা করে লোকটা তাকেই উপুসি করে পেটাচ্ছে। ও পালিয়ে এল।

—আর?

—সর্বজয়াদিদি এখানকারই। তিন পুরুষে বেশ্যা। ওর দিদিমা ভাল নাচতে গাইতে পারত। সর্বজয়াদিদি গাইতে পারে সুন্দর। তা এখন তো খদ্দের গান শুনতে চায় না। ক্যাসেট রয়েছে কত। ওই যে দেখেন অনিলাদিদি। লোকের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করত। এক বাড়ির বাপ ছেলে দুজনেই ওকে নষ্ট করে...গতি না দেখে...

—চুপ করো বনমালা। ঘরে যাও।

জিনা হনহন করে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর খেল। আজ তার একটু দেরিই হয়ে গেছে। গলিটার যেন ঘুম ভাঙছে। সে তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ে একটা রিকশা নিল। বাড়িতে ঢুকেই সোজা বাথরুমে। সোম বুধ শুক্র তিনদিনই— এই তার রুটিন। প্রথম দু-চারদিন এমনই গা ঘিনঘিন করেছিল যে রাত্রে খেতে পারেনি। মুখে খালি জল কেটেছে। কী যে মাখে এরা? কী তেল? কী পাউডার? কী সেন্ট? উৎকট রকমের উগ্র একটা গন্ধ বেরোতে থাকে। অনেকবার মুখে এসেছে— প্লিজ তোমরা এই তেলটেলগুলো মেখে এসো না।

কিন্তু এ কথা কি বলা যায়? ওরা গন্ধ ভালবাসে। মাথায় সুবাসিত তেল ঢালবে, শাড়ির ভাঁজে সস্তার সেন্ট। মলিনা আবার কতক চাট্টি ধূপ এনে জ্বালিয়ে দিল একদিন। সেদিন জিনা আর থাকতে পারেনি, বলে ফেলেছিল— ধূপগুলো নিয়ে যাও প্লিজ, আমার মুখের মধ্যে ধোঁয়া ঢুকে যাচ্ছে, দেখো!

—দিদিমণির রকম দ্যাকো...হেসে গড়ায় সব।

সরু গলির দু ধারে বড় বড় বাড়ি। এক একটা তো বহুতলও আছে। পুরনোই বেশি। দুপুরবেলা সব চুপচাপ, নিঝুম। একতলার ঘরগুলো অন্ধকার। 'বান্ধব সমিতি' লেখা সাইনবোর্ডটা হেলে পড়েছে। বাইরের ঘরটা ক্লিনিক। কড়া টিউবলাইটের তলায় নড়বড়ে টেবিলচেয়ার, গোটা তিনেক বেঞ্চি। একটা ওষুধের আলমারি। বহু ডাক্তার তাঁদের পাওয়া ওষুধের সাম্পল্ এখানে দান করেন। পার্টিশনের গায়ে বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ওদিকে তার ক্লাস। ব্ল্যাকবোর্ড। মেঝেতে মাদুর পাতা, তার জন্য একটা নিচু চেয়ার আর টেবিল।

আগে যে পড়াত সেই সবিতা মাত্রই স্কুল ফাইন্যাল পাস। সে এখন কলেজে

পড়তে গেছে।

—তুই অমন সিঁটিয়ে বসে আছিস কেন? এখানে তো কোনও নোংরা নেই! —মুকুট বলল ফিসফিস করে। সামনে বসা একটি মহিলা ঠিক শুনতে পেয়েছে। কালো লম্বা চেহারা। কপালটা ঢিবির মতো। মুখটা খুব চালাক-চতুর। বেশ স্মার্ট। বলেছিল— ইস্কুলঘরে আমরা লোক বসাই না গো দিদিমণি! ভয় পেয়োনি। জনা দুই খিলখিল করে হেসে উঠল। একজন ধমক দিল— কাকে কী বলতে হয় জান না সর্বজয়াদিদি! ছিঃ!

এই সর্বজয়াই তাকে সবচেয়ে বেশি র‍্যাগিং করে। মহিলা সহজাত বোধে তার কুঁকড়ে যাওয়া, ভেতরের ঘৃণা, অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে পারে। একদিন ক্লাস-শেষে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুনতে পেল সর্বজয়া বলছে— ওরকম ঘরের বউ ঢের দেকা আচে, কে ঘরের মধ্যে কী করে, কী কোরে ভাতকাপড় জোটে সবাই জানে।

শুনে জিনার মধ্যে রাগ লকলকিয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম। শুনতে পায়নি এমন ভাব করে সে চলে যেতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে তাকিয়েছিল। বলেছিল— লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হলে আসবে। এর মধ্যে কোনও জোরজুলুমের ব্যাপার নেই। আমাদের আর কী! শিখতে পারলে তোমাদেরই মঙ্গল! কিন্তু শিখতে যদি আস, ভদ্র বাধ্য ছাত্রীর মতো আসবে। ক্লাসে ডিসিপ্লিন মানতে হবে, টিচারকেও মানতে হবে।

পরের দিন আসতে ইচ্ছে করেনি। অনেক দিনই নিজের অনিচ্ছার সঙ্গে একটা লড়াই করেই তাকে আসতে হয়। মুকুট অনেক বড় মুখ করে কাজটা তাকে দিয়েছে তো! ভেবেছিল সর্বজয়া দাসীকে দেখবে না। কিন্তু না। ওই তো এক দিকে থানা গেড়ে বসে আছে। পরের কয়েক দিন সে সর্বজয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। তারপর একদিন বলল— শুনেছি, অনেকে ভাল গান গাও, একটু গেয়ে শোনাও দেখি—

কয়েকজন সর্বজয়াকে ধরল, তখন সে-ও উৎসাহ দিল— গাও না, গাও।

অবশেষে সর্বজয়া তার জোরালো সুরেলা গলায় শ্যামাসংগীত ধরল— সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি...

গান শেষ হলে, জিনা বলল— বাঃ! ভাল গাও তো তুমি!

—দিদিমণি— এখন আপনি একটা গান, সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

জিনা বলল— আমি কিন্তু এত ভাল গাইতে পারি না। সে ভেবে-চিন্তে ধরল— যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।

কেন এই গান বাছল সে জানে না। গাইবার জন্য সে একেবারেই তৈরি ছিল না। ইদানীং খুব নিয়মিত সংগীতচর্চা হয়ে ওঠে না। ঝুম্পা-মাম্পি দুজনেরই লেখাপড়ার চাপ বেড়েছে। গানে আর নিয়ম করে বসতে পারে না। সে এক এক দিন আপন খেয়ালে সন্ধের মুখে গীতবিতান নিয়ে বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার করে দেয় একটার পর একটা গানে, যতক্ষণ না নিখিল বাড়ি আসে। কিন্তু সেটা পুরোপুরিই তার মর্জির ওপর। গাইবার সময়ে অবশ্য দেখল এভাবে অনিয়মিত সেধেই হোক আর বাথরুম সং গেয়েই হোক, গলাটা ভালই আছে। গানটা খুব

সচেতনভাবে বাছা নয়। কিন্তু এটুকু খেয়াল তার ছিল যে এখানে কোনও ভালবাসার গান সে গাইবে না। সে বড় ঠাট্টার ব্যাপার, অশ্লীল ব্যাপার হবে। দেশভক্তির গান? সে-ও হবে নিদারুণ ঠাট্টা। দেশ কোথায় এদের? আর ঠাকুরদেবতা? সর্বজয়া যেমন গাইল? কে জানে ভক্তিসংগীতও যেন কেমন অপ্রাসঙ্গিক এখানে। সাধারণ মানুষ তো ভক্তিসংগীত গেয়ে থাকে কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে মুখ করে। সে টিচার হিসেবে অনুভব করে সেসব আশা-আকাঙ্ক্ষার থেকে কত দূরে এসব জীবন। যে মিথ্যে শোনাতে চায়, শোনাক। তার উপলব্ধির বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না। মুকুটদের প্রতিষ্ঠান তার কাছ থেকে কী চায়, নির্দিষ্ট করে কিছু চায় কিনা, তার জানা নেই। কিন্তু তার ভেতরে একটা দেওয়ার অস্পষ্ট রূপরেখা গড়ে উঠছে। সে তার বোধের অনুগত হয়ে চলে। সে যখন সাজপোশাক করে, যেমন অবধারিতভাবে তার হাতে উঠে আসে হালকা রং, প্রসাধন করতে গিয়ে রং দিতে হাত ওঠে না, গান করবার সময়ে তেমনই গলায় উঠে এল এমন সুর এমন বাণী, যা এই অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের একতলার এঁদো ঘরের উপর্যুপরি পুরুষসহশব্রক্লিষ্ট বিকৃত গর্তের জীবনের দিনগত বাস্তব থেকে দূরে। হয়তো ওদের ভাল লাগবে না। না সুর, না ভাষা। কিছু বুঝবে না। কিন্তু তার যদি এদের কিছু দেওয়ার থাকে তা হল এই যৌনতার বাইরের জগৎ, বাইরের ভাব।

—দিদিমণি আপনি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন? —বনমালা জিজ্ঞেস করল।

—এ কথা বলছ কেন?

—ওই যে বিদায়বেলার গান করলেন? বনমালার চোখ কি একটু ছলছল করছে? অন্য মেয়েগুলিও তাকিয়ে আছে— চুপচাপ।

তবে? তবে কি এরা তাকে ভালবাসছে? বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করতে থাকে। সে বলল— না তো! যাবার কোনও ইচ্ছে তো এখনও পর্যন্ত নেই।

মুকুট প্রায়ই আসে। এখানে, বাড়িতে। আসলে এখানে জিনাকে লাগিয়ে ও বোধহয় একটা দায়ের মধ্যে পড়ে গেছে। জিনার কেমন লাগছে, জিনা কেমন আছে, এখনও অস্বস্তিতে আছে কিনা, এইগুলো হয়তো জানতে চায়।

একদিন বলল তোর মেয়েগুলোর প্রোগ্রেস খুব ভাল রে জিনা। কী করিস রে?

—কীরকম টিচার দেখতে হবে তো! জিনা হেসে বলল।

মুকুট বলল— সত্যি রে! খুব লো-কোয়ালিটি টিচার দিই আমরা। ওদেরই মধ্যে যে একটু লিখতে-পড়তে শিখেছে তাদেরই সাধারণত কাজটা দেওয়া হয়। আইডিয়াটা হল নিজেদের লোকের কাছে ওরা স্বচ্ছন্দ বোধ করবে। করেও অবশ্য। তোকে এনেছিলাম জাস্ট একটা খেয়ালে। রেজাল্ট দেখে সবাই চমকে যাচ্ছে।

—কেন? কোনও পরীক্ষা তো...

—না রে সে সব না। ওরা প্রথমত পড়াশোনা করতে চায় না। বুঝতেই তো পারিস সমাজের কোন স্তর থেকে এসেছে বেশির ভাগ! তার ওপর সন্ধে থেকে

সারা রাত ওই কাজ! মাথায় কিছু ঢোকে না। কনসেনট্রেশন বলে কোনও পদার্থ নেই। খালি প্রথম রিপু উসকে দিতে আর স্যাটিসফাই করতেই শেখে এরা। তোর মেয়েগুলোর চালচলন পালটে যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন খবরের কাগজ পড়ছে শুনছি।

—হ্যাঁ, আমি পড়াই তো।

—হ্যাঁ রে ওরা নাকি গল্পগুচ্ছের গল্প বলতে পারে! নমিতাদিকে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' শুনিয়েছে একটা মেয়ে আর একজন সেই জয়কালী নামে একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবা নিজের রাধাকান্তর মন্দিরে একটা শুয়োরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন!

—হ্যাঁ। 'অনধিকার প্রবেশ' ওরা বলেছে? সত্যি?

জিনা গল্প বলে ঠিকই। বলে বলার আনন্দে। খানিকটা কৌতূহলেও। ওদের বুঝতে না দিয়ে সে লক্ষ করে গল্পগুলোর কী ফল হল, কীভাবে নিচ্ছে ওরা সেগুলো। বাইরের জীবনকে ওদের কাছে হাজির করার অন্য আর কী উপায়ই বা আছে? এদের মধ্যে বেশির ভাগই এই পল্লিরই মেয়ে। পুরুষানুক্রমে এই করছে। কোনও সমাজ, কোনও সভ্যতাকে কখনও ভেতরে ঢুকে দেখেনি। চৌকাঠ থেকে উঁকি মেরে কতটুকুই বা বোঝা যায়! এদের সমাজ নারীপ্রধান। মা, দিদিমা, মাসি...মাতৃকুলের দিকে একমুখী বিস্তার। শিক্ষা তো নেই-ই। সামাজিক বা পারিবারিক দৈনন্দিন কাজকর্মের বৈচিত্র্যও নেই, সাধারণ রুটিন নেই। সন্তান পালন যেটুকু আছে, এদের জীবনে তার ভূমিকা খুবই গৌণ। বেশির ভাগই সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। একটা জৈব মাতৃত্বের অনুভূতি ছাড়া কিছু নেই। সেটাও বেশিদিন থাকে না। ওরা জানে এই সন্তানদের কী ভবিষ্যৎ। বা, বলা ভাল, জানে এদের ভবিষ্যৎ ঠিক কী! লেখাপড়া শেখাবার তেমন কোনও গরজ নেই, সুযোগও নেই, বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। মেয়েরা বারো-তেরো বছর বয়স হলেই ব্যবসায় নেমে পড়বে। ছেলেগুলো দালালি করবে, মারামারি, চুরি, ছিনতাই, মস্তানি। শৈশব বলে কিছু নেই। পুরুষকে এরা মাত্র একটা ভূমিকাতেই চেনে। খদ্দের। পিতা, রক্ষক, পুত্র, পালক, ভাই, বন্ধু আর কোনও পরিচয়েই নয়। যেসব মেয়েরা বাইরে থেকে এসেছে, কেউ স্বামীর অত্যাচারে পালিয়ে এসেছে, কেউ ভালবাসার লোকের কাছে ঠকে এসেছে, কেউ বা পিতা বা পিতৃতুল্য কারও কাছ থেকে বিক্রি হয়ে এসেছে। এদের সবারই কাছে পুরুষ এক ভয়াবহ, বিপজ্জনক প্রবঞ্চক, চতুর ক্রেতা। কী করে এতকাল ধরে এতগুলো দেশে মানুষ মানুষকে এমন অমানুষিক গর্তের জীবনে বন্দি করে রাখতে পারল? এইরকম একটা পৈশাচিক বাস্তব তাদের ঘরের পাশেই জিয়োনো রয়েছে অথচ তাদের চেতনায় এদের জন্য কোনও মমতা, কোনও মুক্তির ভাবনা কোনওদিনও দেখা দেয়নি। পুরুষরা এদের ব্যবহার করে, সতর্ক চতুরতার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা শ্রেণী তৈরি করে রেখে দেয়, আর মেয়েরা এদের ঘৃণা করে। যেমন সে করত। এদের কাজকর্ম, চালচলন, কথাবার্তা —এখনও করে।

একটা মজার খেলা আজকাল শুরু করেছে জিনা। তার ছাত্রীদের মোটামুটি

অক্ষর পরিচয় তার আগের মেয়েটিই করিয়ে গিয়েছিল। এরা নাম সই করতে পারে। বাংলায়, ইংরেজিতে। কিন্তু পড়বার ধৈর্যটা অনেকেরই নেই। লেখবার তো নেই-ই। যাদের আছে তাদের সে পড়তে লিখতে দেয়। কিন্তু অন্যদের বেলায় এসব করে একেবারে পড়াশোনা বিমুখ করে দেবার ঝুঁকিটা সে নেয় না। অনেক সময়ে সে একটা গল্প অর্ধেকটা বলে থেমে যায়। গল্পটা কীভাবে শেষ হবে সেটা নিয়ে এবার ওরা ভাবুক, জল্পনাকল্পনা করুক। এটাই হল খেলা। এ খেলাটা ওদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। 'দেনা পাওনা'র অর্ধেকটা শুনে ক্লাসসুদ্ধু মেয়ে রায় দিল, নিরুপমা শাশুড়ির অত্যাচারে মারা যাবে, তার বর আবার বিয়ে করবে। আশা বলে একটি মেয়ে বলল— এবার আরও বেশি টাকা চাইবে গো!

রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সঙ্গে এদের কল্পনা কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে দেখে সে চমৎকৃত। 'অতিথি' শুনে জবা নামে একজন বলল— 'ব্যাটাছেলে বলেই না বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চ। মেয়েছেলে হলে মা মেরে ধামসে দিত, কাজ কর তবে খেতে পাবি। আর অমনি পালালে? দ্যাখ না দ্যাখ লাইনে ভর্তি হয়ে যেত।' তারাশংকরের 'কালাপাহাড়' শুনে সবিতার মন্তব্য— 'নির্য্যস ফিরে আসবে মোষটা, আহা অবোলা জীব গো। মানুষের চেয়ে ওদের টান বেশি।' 'ডাইনি' গল্পের সূক্ষ্মার্থ সবটাই মাঠে মারা গেল। প্রত্যেকেই ধরে নিল, মেয়েটি সত্যিই অশুভ শক্তির অধিকারিণী। বেচারি নিজেও জানে না সে ডাইনি-সমাজের অন্তর্গত, জন্ম থেকেই ডাকিনীবিদ্যা তার রপ্ত। কে কবে ডাইনি দেখেছে, ডাইনির কথা শুনেছে, প্রচণ্ড উত্তেজনাময় সেই আলোচনাতেই সেদিনের ক্লাস শেষ হল।

—কী ব্যাপার? তোর যে খুব পা হয়েছে! কোথায় কোথায় যাস দুপুরবেলায়?

মল্লিকার সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল বাড়ির দরজার কাছে। জিনা আসছিল আপন মনে। যেন একটা ভাবনার সুতো হাতে নিয়ে আনমনে কোনও গোলকধাঁধা পার হচ্ছে। এরকম সময়ে রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া পথ-চলতি মানুষ, ধারের আবর্জনা সবই অভ্যাসে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু চেনা মানুষকে চেনা যায় না। কেননা যে মনের দ্বারা চেনাচেনিগুলো হয় সেটা অন্যত্র ব্যস্ত থাকে। তাই জিনা ভীষণ চমকে গেল।

—আরে দিদিভাই! তুমি? কোথায় গিয়েছিলে?

—তোর পাশে পাশেই তো আসছিলুম। প্রথমে ছিলুম ও ফুটপাতে, তোকে ইশারা করলুম— 'এই! এই যে শুনছেন!' বলে ডাকলুম...

—'এই যে শুনছেন!' জিনার মুখ হাসিতে ভরে গেল।

—তা কী বলব! রাস্তার মাঝখানে তোর নাম ধরব? তুই শুনতে তো পেলিই না, রাস্তা ক্রস করে তখন থেকে তোর পেছন পেছন আসছি দেখতেও পাচ্ছিস না।

—আমার বুঝি পেছনে দুটো চোখ আছে? চলো— দরজার চাবি ঘোরাল জিনা— এ দিক দিয়ে ঢুকি।

আজও জিনার দেরি হয়ে গেছে। বাবা বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। সে বলল— দিদিভাই, প্লিজ বসো, আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি। তারপর চা করব।

গা ধুয়ে বেরিয়ে সে দেখে মল্লিকার চা করা হয়ে গেছে। বলল— এত দেরি করলি? রাস্তায় কিছু মাড়িয়েছিসটিস নাকি?

জিনা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, — না, তেমন কিছু না। গরম হচ্ছিল।

চা খেতে খেতে মল্লিকা বলল, —বললি না তো কোথায় গিয়েছিলি? কোথায় যাস?

—তুমি দেখেছ? আমি রোজ যাই?

—রোজ কি না জানি না, প্রায়ই দেখি বেরিয়ে গেলি বা ফেরত এলি।

—বাবা কিছু বলেননি?

—বাবা? বাবা কেন বলবেন?

জিনা বলল— একটা কাজ করছি।

—কাজ? চাকরি?

—চাকরি ঠিক নয়। কাজ...কাজ দিদিভাই। বয়স্ক-শিক্ষা।

—পড়াচ্ছিস? সত্যি? কাদের?

—বয়স্ক মেয়েদের, ধরো সতেরো-আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ কী তারও বেশি বয়স!

—এ মুকুটের কাজ, না?

—ঠিক ধরেছ। সারাদিন কিচ্ছু করবার নেই। কোথাও যাবার নেই। কোনও মানুষের মুখ দেখি না। নবাববাহাদুরের অবরোধে একা একা। ভাল লাগে নাকি?

—এখন ভাল লাগছে?

—খুব। কারও জন্যে কিছু করছি, করতে পারছি। পরিবার-পরিজনের একেবারে বাইরে কারও জন্যে— এটা ভাবতে ভাল লাগে দিদিভাই। তারপরে আবার ইনসেনটিভ রয়েছে টাকাটা।

—এই যে বললি—চাকরি নয়!

—নয়ই তো। ওটা ধরো পথ-খরচা, বা বলো সম্মান-দক্ষিণা।

প্রথম প্রথম জিনা টাকাটা নিতে লজ্জা পেয়েছিল। এই রাস্তার চতুর্দিকের হতশ্রী দীনতা, উপরন্তু মেয়েগুলির জীবিকা! পেটের জন্য যাদের শরীর বেচতে হয়, সেই দুর্ভাগিনীদের পড়িয়ে সে টাকা কী করে নেয়? কিন্তু মুকুট বলেছিল— জিনা তোর পুরনো সমাজসেবার কনসেপ্টটা তুই ভুলে যা। আমরা যে সেটআপটা তৈরি করেছি সেখানে বাইরে থেকে অনেক টাকা গ্রান্ট আমরা পাচ্ছি। সব কর্মীর জন্যে দক্ষিণা ঠিক করা আছে। যে যা করবে দায়িত্ব নিয়ে করবে। তার সামর্থ্য, তার ইচ্ছা সবটারই মূল্য দেওয়া হচ্ছে। মনে করার কারণ নেই যে এটা ওদের স্রেফ ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

—কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এঁরা কি কাজের জন্য টাকা নেন? এঁদের কি সেজন্য দায় কম থাকে?

—এঁরাও নেন। অনবরত নিচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছেন না, কিন্তু এঁদের সঙ্ঘ, মিশন অজস্র দান পায়। তাই দিয়ে যেমন সেবামূলক কাজ চলে তেমন সেবকদের ভরণপোষণ ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনই মেটানো হয়। এঁরা যে স্কুল-

হস্টেল ইত্যাদি চালান, সেখানে কি টাকা নেন না? আমরা কোনও সঙ্ঘে নেই। আমাদের পরিবার আছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে, সেগুলো মিটবে কী করে? মেয়েরা তো টাকাটা দিচ্ছে না। আর যদি দিতও, তোর সেটা নেওয়া উচিত হত।

—কেন?

—কেন নয়? প্রথমত, ওদেরও তো মানসম্মান আছে! উপার্জন করছে, পয়সা খরচ করে কেনাকাটা করতে পারবে বলেই তো! আর দ্বিতীয়ত, ওরা যেভাবেই রোজগার করুক, তুই তো আর অসৎ কাজ করে টাকা নিচ্ছিস না!

এই যুক্তি জিনার পছন্দ হয়নি। কিন্তু তাকে স্বীকার করতেই হয়, টাকাটা তাকে অতিরিক্ত দায়বোধ দিয়েছে। চ্যারিটি করছি, সুতরাং মনের ঔদার্যে যখন যতটুকু দিচ্ছি, খুব দিচ্ছি—এ মনোভাবটা তৈরি হতেই পারল না। সে চিন্তা করে কীভাবে এগোলে, অল্প সময়ে বেশি শেখাতে পারবে, কীসে ওদের ভাল লাগবে, কীভাবে ওদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বেশি আগ্রহী করে তোলা যায়। প্রত্যেকবার টাকাটা হাতে নেয়, আর ভেতর থেকে কী যেন তাকে কামড়ায়, আশা এখনও যুক্তাক্ষর কায়দা করতে পারল না। সর্বজয়া পারে কিন্তু পড়বে না। পুতুল উসখুস করে কিছুতেই মন বসে না তার, কী করে এগোবে? কীভাবে...

মল্লিকা বলল, তোর নবাববাহাদুরকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিস তো!

—জিজ্ঞেস করার কী আছে? তার টাইমের সঙ্গে তো আর ক্ল্যাশ করছে না!

—ক্ল্যাশ করুক আর না করুক...জিনা, অনুমতি নিসনি, না?

—শাজাহানকে বলেছি।

—শাহাজানকে? মানে? ও, তা ঔরংজেব কবে শাজাহানের কথা মানল?

জবাবে জিনা বলল, —আমি তো আর দাসী-হাটে বিক্রি হয়ে আসিনি।

—বিপদে পড়বি জিনা।

—যেদিন পড়ব, সেদিন ভাবব। কুড়মুড় করে নিমকি চিবোতে চিবোতে বলল, জিনা।

—কোথায় তোদের সেন্টারটা?

—ওই তো ওই দিকে, সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু থেকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট...

—ওরে বাবা। ও জায়গাটা একেবারে ভাল না জিনা।

—কেন গো?

—খারাপ পাড়া। তোর সঙ্গে কে থাকে? মুকুট?

—যদি কেউ না থাকে? শুধু আমি থাকি আর আমার ছাত্রীরা?

—তোর পক্ষেও নিরাপদ নয়, তোর ছাত্রীদের পক্ষেও নয়। ওরা কি আর জায়গা পেল না? যত উলটোপালটা লোক যায় ওখানে।

—সত্যি, কারা যায় ওসব জায়গায় বলো তো দিদিভাই!

—কী জানি বাবা, মেয়েরা যায় না, পুরুষরাই যায় এটুকুই জানি।

—কীরকম পুরুষ? ধরো তারা কি কারও বাবা? কাকা? জ্যাঠা? স্বামী? দাদা? ভাই?

—উঃ, তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না!

—আটকাবার কী আছে? যারা যায় তারা তো আর নিঃসম্পর্ক নয় রে বাবা। কারও না কারও ছেলে তো বটেই। বাবা-কাকা, ভাই-বেরাদর তো বটে!

—ইস, কী বিশ্রী! কখনও ভাবিনি এ নিয়ে।

—তা হলে এখন একটু ভাবো।

—কেন? হঠাৎ এখন আমার কী দায় পড়ল যে খারাপ মেয়েদের কথা ভাবতে বসব? তুই এমন এক একটা কথা বলিস!

—খারাপ মেয়েদের কথা ভাবতে বলিনি গো! খারাপ ছেলেদের কথা ভাবো। কারা সেই ধিনিকেষ্ট, যাদের মজার জন্যে পাড়া ভর্তি করে করে মেয়ে পুষে রাখতে হয়, যে মেয়েদের বাবা নেই, ভাই নেই, স্বামী নেই, ছেলে নেই, ছেলেবেলা নেই, বন্ধু নেই, দিন নেই, রাতও নেই রাতের মতো। পেটের দায়ে যারা যৌনাঙ্গ ভাড়া খাটায়!

মল্লিকা বলে উঠল, ছি! ছি! জিনু দু দিন বেরিয়েই তোর মুখের ভাষা কী হয়েছে রে? গঙ্গাজল দেব? মুখ ধুয়ে আসবি?

—ধুয়েছি তো! এসেই সাবান ঘষে ঘষে সর্বাঙ্গ ধুলাম দেখলে না? আমি যে ওদেরই পড়াতে যাই?

—কাদের? —স্তম্ভিত হয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল।

—'খারাপ' মেয়েদের দিদিভাই। 'খারাপ' ছেলেদের এখনও হাতের কাছে পাইনি। হাতে যদি একবার পাই...

শেষ সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট থেকে জিনাকে বেরোতে দেখলেন কল্যাণবাবু। দেখলেন বাস থেকে। তিনি শ্যামবাজারের মোড় অবধি গিয়ে বাস বদল করবেন। জিনা একটা উজ্জ্বল সাদা রংয়ের পোশাক পরে ছিল। চুলগুলো খোলা। কপালে একটা ছোট্ট কালো টিপ। তিনি প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি। তাঁর বুড়ো চোখে এখন অল্পবয়স্ক মেয়েমাত্রই ভাল লাগে। একটি মেয়ে, যেন জীবন-যৌবন, প্রাণের যত আনন্দ সব কিছুর মূর্তি ধরে এসে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে—এরকমটাই তিনি দেখলেন। উচ্ছল নয়— ধীর, চঞ্চল নয়— গভীর। যে জিনাকে তিনি বাড়িতে দেখেন সে তো এমনটা নয়। সে ছটফটে, দৌড়ে বেড়াচ্ছে, প্রাণচঞ্চল, বকবক করছে তো করছেই। আসলে, কল্যাণবাবু প্রকৃত জিনাকে দেখেন না। যে ছোট বউমাটিকে তাঁরা সবাই খুব পছন্দ করে নিয়ে এসেছিলেন, এবং যে সমস্ত সাংসারিক ওঠা-পড়া মন-কষাকষির মধ্যেও আশ্চর্যভাবে নিজের হালকা হাসি দিয়ে বাড়িটাকে তার বাতাবরণকে লঘু, সুগন্ধ রেখেছিল, সেই জিনাকেই তিনি দেখেন। জিনা যে একটু একটু করে বড় হয়ে গেছে, বদলে গেছে সূক্ষ্মভাবে তা তিনি খেয়াল করেননি। কে-ই বা করে। কাছের মানুষকে কেউই চিনতে পারে না। এখন দূর থেকে অন্য মেয়ে অন্য মানুষ হিসেবে যখন দেখলেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জিনা, না? তারপরে তিনি আর একটা সন্দেহজনক দৃশ্য দেখলেন। জিনার পেছনে পেছনে, সাবধানে দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে দুটো লোক। ঠিক গুন্ডা-মস্তান টাইপের না হলেও, তাদের ধরনধারণ ভাল লাগল না তাঁর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তারা জিনাকে অনুসরণ করছে। জিনা সেটা জানে কি না তিনি বুঝতে পারলেন না। তারপরেই জিনা একটা রিকশায় উঠে পড়ল। এবং রিকশা বেশ জোরে জোরেই ছুটে চলল দক্ষিণমুখে। জিনা বাড়ি ফিরছে। লোকদুটি একটা হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, কথা বলতে লাগল। এর পরেই সিগন্যাল পেয়ে কল্যাণবাবুর বাস ছেড়ে দিল।

পাইকপাড়ায় বন্ধুর বাড়িতে আজ বেশিক্ষণ বসতে পারলেন না কল্যাণবাবু। গল্পগাছাও তেমন জমল না। অজিত যে এত বুড়ো হয়ে গেছে, ব্লাডপ্রেশার, ব্লাডসুগার আর ইউরিক অ্যাসিড ছাড়া তার আলোচনার আর কোনও বিষয় নেই তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি। অজিতের গিন্নি তো অজিতেরও এককাঠি বাড়া। তার আবার আছে উপরন্তু বউমার নিন্দে। ছেলে তাঁর যথারীতি সোনার চাঁদ, বউয়ের পরামর্শেই সে কানাডায় থেকে গেল। তখন কল্যাণবাবু তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানেন সোনার চাঁদ ছেলেরও নিজস্ব মাটির পা বেরোয়, তার প্রতিমাতেও প্রচুর খড় থেকে থাকে, কাজেই এইসব একপেশে কথাতে তাঁর আজকাল একটু বিরক্তিই লাগে। বিশেষত এইজন্য আরও লাগে, যে তিনিও তো জিনাকে গোড়াতে দোষ দিয়েছিলেন, মনে মনে। নিখিল যে খুব বাপের সুপুত্র নয়, কাঠগোঁয়ার একটা, এটা পুরোপুরি জেনেও তো তিনি জিনাকেই দোষারোপ

করেছিলেন। পরে নিজের ভুল যে বুঝতে পেরেছেন তাই-ই শুধু নয়, এ-ও দেখেছেন যে এক হাতেও তালি বাজে। এত সব অভিজ্ঞতার পর আর পক্ষপাতের কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগে না। তিনি উঠে পড়লেন।

তখন সাড়ে সাতটা। চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলেই শুনতে পেলেন জিনা গান করছে।

আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাহি চাই যে ভালবেসেছি
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না।
ডেকো না।

ঝুম্পা-মাম্পির গলাও এবার শুনতে পেলেন কল্যাণবাবু।

দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে
আজ অবহেলা ছলনা দিয়ে ঢেকো না
ডেকো না।

বারে বারে ঘুরে ঘুরে গাইছে। অর্থাৎ সংগীতশিক্ষার আসর বসেছে ওদের। তিনি নীচের ঘর দিয়ে সিঁড়িতে পৌঁছোলেন, সিঁড়িগুলো উঠলেন, দালান দিয়ে নিজের ঘরে গেলেন, মাঝের দরজাটা খোলা রয়েছে, ওপারেও আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে হালকা আলো জ্বলছে—ধূপের গন্ধ। তিনি ছিলেন না। কিন্তু ঘরটা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আলো জ্বালিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত ছিল। তিনি হাতমুখ ধুয়ে এলেন, জামাকাপড় বদলালেন, আলো জ্বালালেন না, আরামচেয়ারে কাত হয়ে চোখ বুজিয়ে গান শুনতে লাগলেন। অনেকদিন পর খুব বেশি করে স্ত্রীর কথা মনে পড়তে লাগল। একটা মেয়ের বড় শখ ছিল আরতির। হয়নি। ছেলেদের দস্যিপনায় অস্থির হয়ে যেত। আজ থাকলে চার-চারটি বিভিন্ন বয়সের মেয়ের উপস্থিতি দেখতে পেত। এ তো শুধু দেখারই জিনিস নয়। শোনার জিনিস, অনুভব করবার জিনিস। তাঁর ভাগ্য, তিনি দেখতে শুনতে পেলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের অভিমানের সুর যেন তাঁকে লক্ষ্য করেও ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে আসছে। এরকম তাঁর মনে হল। তারপরে তাঁর মনে হল নাতনিদুটিকে কি তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দেন? মল্লিকাকে? জিনাকে? বিমানকে? নিখিলকে? বিমানের সঙ্গে যাও-বা রাত্রে খাবার টেবিলে কথাবার্তা হয়, নিখিলের সঙ্গে সেসব বন্ধ। যবে থেকে সে অশান্তি করতে শুরু করেছে, তার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়েছে, তখন থেকেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এটা কি ঠিক? ওদের জন্যে তাঁর মনখারাপ করে কি? খুব কম। তিনি যেন নিজের জীবনে ছেলেদের প্রয়োজন ছাড়িয়ে উঠেছেন। এ বাড়িতে তাঁরা থাকেন তিনজন আধা-পরিচিত মানুষের মতো। বিমান-নিখিলের থেকে মল্লিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক বেশি। আর তাঁর প্রতি টান? ছেলেদের কি তাঁর প্রতি কোনও টান আর অবশিষ্ট আছে? বড়র যদি-বা কিছু থেকে থাকে, ছোট? বউমারা তাদের কর্তব্য অবশ্যই করে, ষোলোআনার জায়গায় আঠারোআনা। কিন্তু সত্যি সত্যি ভালবাসে কি? মেয়ে হলে যেভাবে বাসত! ক্রমশ ক্রমশ রবিঠাকুরের গানের

অভিমান তাঁর নিজের হয়ে যেতে থাকল। তাঁর বয়সের হয়ে যেতে থাকল। পৃথিবীর যত যুবক-যুবতী, তাদের প্রতিই যেন তাঁর অভিমান, সমস্ত বুড়োমানুষের হয়ে। বয়স্করা তো অল্পবয়সিদের কৃপারই পাত্র। তাদের সমস্ত যত্ন-আদর সবটাই ছলনা। সত্যি তো একজন বৃদ্ধ হল বাতিল মানুষ, তার যা দেবার সব দেওয়া হয়ে গেছে। আর নতুন কিছু তার ভাণ্ডারে নেই। বাকি জীবনটা যাকে বলে আনপ্রোডাক্টিভ। আধুনিক পৃথিবী তো অনুৎপাদক মানুষকে মূল্য দেয় না। কর্ম ছাড়া আধুনিক সভ্যতার তালিকায় আর কিছু নেই! ভালবাসা একটা বাজে সেন্টিমেন্ট। সম্পর্কের টান পায়ের বেড়ি, হাতের শেকল। এগিয়ে চলতে হলে ওসব ভেঙে ফেলাই ভাল।

তিনি গান শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' একখণ্ড নিয়ে বসলেন। অবসর নেওয়ার পর থেকে কল্যাণবাবুর বইপড়া অনেক বেড়ে গেছে। এক ধরনের বই তিনি পড়েন না। পপুলার সায়েন্স, সহজ দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস...নানা রকমের বইয়ে আগ্রহ তাঁর। আজকে গল্পগুচ্ছর একটা বিশেষ গল্প পড়ছিলেন। 'বিচারক'। গল্পটা পড়তে পড়তে তাঁর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। এই গল্পটা 'মোস্ট আনরাবীন্দ্রিক'। এইভাবেই তিনি ভাবলেন। পতিতাদের কথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আর রবীন্দ্রনাথ কতটুকু জানবেন? জানতেন না। সেইসব লোক যারা একটি স্বাভাবিক মেয়েকে 'পতিতা'য় পরিণত করে কিন্তু নিজেরা বেশ উঁচুতেই 'অপতিত' অবস্থান করে তাদেরও তিনি স্বরূপে জানতেন কিনা সন্দেহ। তবু, তাঁর স্বভাবজ পবিত্রতাবোধ, মানুষের প্রতি তাঁর অচল বিশ্বাস, তাঁর আভিজাত্য। সমস্ত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এরকম একটা গল্প লিখলেন কেন? গল্পটা তিনি যদ্দূর বোঝেন—ভাল হয়নি। বড্ড সাজানো যেন। যে বিনোদ ক্ষীরোদাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল, তাকেই জজ হয়ে বিগতযৌবনা ক্ষীরিকে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার জন্য আনতে হল এবং তাকেই হঠাৎ ক্ষীরির অনুতাপ হয়েছে কিনা দেখতে জেলখানার ভেতরে গিয়ে ক্ষীরির আংটিতে নিজের প্রতিকৃতি দেখাতে হল! সন্দেহ নেই একবার প্রলোভনে বাইরের পৃথিবীতে পা দিলে অবলা বালিকাদের ক্ষীরির গতিই হয়, এতেও সন্দেহ নেই প্রলোভনকারীর অনায়াসেই ভবিষ্যতে জজ-ব্যারিস্টার হয়ে সমাজের মুকুটমণি হয়ে ওঠাও কেউ আটকাতে পারে না। অবিচারের ধাঁচটা এরকমই, সেটাকেই রবিঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন? রবিঠাকুরের মেজাজের সঙ্গে যেন গল্পটার বিষয়বস্তু খাপ খাচ্ছে না।

কল্যাণবাবুর মনে এ প্রশ্ন জাগছিল, কেননা এই বয়সে, পুরো একটা জীবন কাটাবার পর তিনি কোনও বই-ই আর শুধু সময় কাটাবার জন্যে পড়েন না। সময় কাটাবার হলে তো তিনি তাঁর বড় ছেলের মতো ব্রিজের আড্ডাতেও যেতে পারতেন। তিনিও খুব ভাল ব্রিজ খেলতে পারেন। আর তাসে যেমন সময় কাটে অন্য কিছুতেই তেমন কাটে না। আসলে তাঁর মনে হয় সারাজীবন তিনি কিছু শেখেননি, কিছু বোঝেননি, কিছু অনুভব করেননি, অথচ জীবনটা কী ভীষণ জটিল, পৃথিবীটাও কঠিনে কোমলে কী অদ্ভুত একটা জায়গা। জানা হল না, অথচ মৃত্যু থাবা গেড়ে অদূরে বসে আছে। মৃত্যু মানে শেষ। একটা অধ্যায়েরও শেষ

হতে পারে, একেবারে শেষও হতে পারে। কিন্তু যাই হোক, তিনি ঠকে গেলেন। একেবারে শেষ যদি হয়, তো আর পাঁচজনে যা শেখে, যা জানে, যা গড়ে তিনি তার কিছুটা করলেন না, একেবারে নিরর্থক একটা অস্তিত্ব তাঁর। আর যদি একটা অধ্যায় হয় তা হলে এ অধ্যায় থেকে কিছু সংগ্রহ না করেই তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের পাতা উলটোচ্ছেন। কল্যাণবাবু তাই এখন পড়েন প্রচণ্ড আগ্রহে, দাগ দিয়ে দিয়ে, এক কথা বার বার, এক বই বার বার। কোনও বিষয়ে আগ্রহ বেড়ে গেলে বইয়ের শেষে উল্লেখপঞ্জী দেখেন। আরও পড়েন।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, মৃদু ডাকে চোখ মেললেন।

—বাবা, ও বাবা, খাবেন না?

দিনেরবেলায় কল্যাণবাবু জিনার সঙ্গে খান। রবিবার বা ছুটির দিনে নিখিল থাকলে নয় অবশ্য। একেবারে না খেলে জিনার ভীষণ অভিমান হয়। আর সত্যিই তো, সে তো কোনও অপরাধ করেনি। শুধু শুধু তার মনে কষ্ট দেবেন কেন? কিন্তু রাত্তিরবেলায় তাঁর খাওয়া বড় বউমার রান্নাঘরে। চারজনে একসঙ্গে বসেন। মোটামুটি সব এগিয়ে দিয়ে মল্লিকাও বসে পড়ে। নাতনিদের গল্পস্বল্প, খুনসুটি, বিমানের স্বল্পবাক মন্তব্য, হাসি, মল্লিকার গল্পগাছা—সব মিলিয়ে রাতের আসরটা বেশ জমজমাট হয়।

আজ দেখলেন মল্লিকা তাঁর খাবার নিয়ে এসেছে। ছোট একটা টেবিলে রেখে টেবিলটা এগিয়ে আনছে। তাঁর শরীর-টরির খারাপ হলে অবশ্য এরকম ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আজ শুধু শুধু...। তিনি বললেন, কেন বউমা? তোমরা কি ভাবলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি বলে আমার শরীর খারাপ? কিচ্ছু হয়নি। এদের গান শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে ঘুম এসে গিয়েছিল।

মল্লিকা বলল, কটা বেজেছে দেখেছেন?—সে আলোটা জ্বেলে দিল। সাড়ে দশটা।

—ওরে বাবা! ডেকে দিলে না কেন?

—ঝুম্পাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। বলল—অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ভাবলাম হয়তো কোনও কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু ঘুমিয়ে নিন। ওদের সব খাইয়ে দিয়েছি বাবা।

—তার মানে তোমার হয়নি।

—এই আপনার হয়ে গেলেই...

—না, তোমারটাও নিয়ে এসো। একসঙ্গে খাই। কিংবা চলো টেবিলে যাই। আবার দুজনে নীচে নামলেন। খেতে খেতে মল্লিকা একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল—একটা কথা বলব ভাবছিলুম বাবা।

—বলো—মনে মনে একটু শঙ্কিত বোধ করলেন তিনি। দুই পুত্রকে আলাদা করে দেওয়ার পরেও অশান্তি যায়নি। অশান্তির উৎস অবশ্য একটাই। ইদানীং জিনা খুব বুঝে চলে বলেই হয়তো অশান্তি খুব একটা টের পান না। অন্তত অশান্তিটা তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। এক ছেলে তাস পিটে, আর এক ছেলে টাকা পিটে রাত করে বাড়ি ফেরে। দুই বউমা-ই একা। দুজনেই নিজের নিজের

মতো ভাল। তবে ছোটর সন্তানহীন জীবনে প্রকৃত শূন্যতাই থাকার কথা। এ তিনি বোঝেন। কিন্তু তাঁর তো কিছু করার নেই। যা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে, আগ বাড়িয়ে সেই সমস্যায় নাক গলিয়ে তিনি করবেনটা কী? এখন ঘটা করে বড় বউমা কী বলতে চায়? নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। ঠিক ভয় না পেলেও, তিনি সতর্ক এবং অনিচ্ছুক। ঝুম্পা যদি নিজে কোনও ছেলেকে পছন্দ করে থাকে? সেই কথা? সেই বিষয়েও তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। বিমান-মল্লিকা তাদের মেয়ে সম্পর্কে যা ঠিক করবে তাই হবে। নাতনির ওপর জুলুম হলে তিনি হয়তো হস্তক্ষেপ করবেন। নইলে নয়।

—বাবা, কথা দিন কাউকে কিছু বলবেন না। যার সম্পর্কে বলছি তাকেও না।

—সর্বনাশ! এত শর্ত কেন? কী হয়েছে বউমা!

—জিনা বোধহয় আপনাকে বলেছিল ও একটা বয়স্ক-শিক্ষার ক্লাস নিতে যায়!

—হ্যাঁ, সে তো অনেকদিন হল! বছরখানেক কি তারও বেশি হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, কিন্তু এই বয়স্করা কারা বলেছে কি?

—না তো! কারা!

—মানে ওই, ওই দিকে সোনাগাছির মেয়েরা...অনেক কষ্টে কথাগুলো বলে মল্লিকা মুখ নিচু করে।

—সোনাগা....বলতে বলতে প্রচণ্ড বিস্ময়ে কল্যাণবাবু হাতের গ্রাস নামিয়ে রাখলেন। তাঁর হাতটা একটু একটু কাঁপছে। একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটায় কাঁপছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ! রবিঠাকুর! উত্তর দিয়ে গেলেন। তাঁর সারাজীবনে কল্যাণবাবু কখনও এমন আবেগমথিত হননি। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। অবাক হচ্ছিলেন। কেন? 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'অতিথি', 'মেঘ ও রৌদ্র'র রবিবাবু কেন 'বিচারক' গল্পটা লিখতে গেলেন? উত্তরটা এইমাত্র রবিঠাকুর দিয়ে গেলেন। তিনি ওটা লিখেছিলেন এক অনস্বীকার্য দায়বোধ থেকে। তিনি লেখক, যে-মুহূর্তে গল্প-উপন্যাসের জন্য কলম ধরলেন অমনই মনুষ্যসমাজ যা গল্প-উপন্যাসের প্রধান বিষয় তা দশভুজ মূর্তিতে উঠে এল তাঁর সামনে। দশভুজ, শতকোণী, সহস্রক্ষতচিহ্নিত মানুষের সমাজ। যখন তিনি সার্চলাইটের মতো তাঁর দৃষ্টি ঘোরাচ্ছিলেন এই অন্ধকার কোণে আলো পড়ল। শিউরে উঠে তিনি ভাবলেন এ নিয়ে লেখেননি তো! ভাবেননি তো! ভাবলেন, যতটা ভাবলেন লিখে উঠতে পারলেন না। রোমান্সের হাত ছিল, করুণার হাত ছিল, কিন্তু ঘৃণার হাত ছিল না তাঁর। তাই ক্ষীরির হাতে ফাঁসির সময়েও প্রেমের আংটি নিয়ে আকুলতার কথা তিনি লিখতে পারেন। আজকের লেখকদের হাতে পড়লে ওই আংটিটাকেই ক্ষীরি আগে ফাঁসি দিত। কিন্তু সত্যিই দিত কি? তিনি জানেন না পতিতাদের মধ্যে ঘৃণাও শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে কি না।

শ্বশুরের রকম দেখে মল্লিকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কী দুর্বুদ্ধি যে তার হয়েছিল!

কল্যাণবাবু বললেন, একটা এন.জি.ও-র স্কিমে কাজ করছে না জিনা!

—হ্যাঁ, ওর ওই বন্ধু মুকুট...আপনি একটু ডেকে যদি বলে দেন, কাজটা ভাল

নয়...তা হলেই...

—কেন বউমা? এর মধ্যে তুমি খারাপ কী দেখলে? আশ্চর্য হয়ে বললেন কল্যাণবাবু, এডুকেশনের কাজ, সে তুমি যাদের জন্যই কর, সব সময়ে ভাল, এটা জানবে মা। এত বড় দেশ! এত সমস্যা! একা সরকারের সাধ্য কী সব দিকে খুঁটিয়ে নজর দেয়! আমাদের সাধারণ নাগরিকদের, যাদের হাতে সময় আছে, অসুবিধে নেই, তারা যদি একটুও পারে, সে তো মস্ত আশার কথা। আমরা সকলেই যদি ভাবি— আমার ছেলেমেয়ে করবে না, ওরা করুক, ওদের ছেলেমেয়ে করুক, তা হলে আর কী করে কাজ হবে?

মল্লিকা দ্বিগুণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেনই বা বাবার প্রথমে অমন বাকরোধ হয়ে গেল? তারপর কেনই বা এত উদারতা দেখাচ্ছেন? মানুষটি রহস্যময়। এতদিনেও তাঁকে সে বুঝতে পারল না।— কিন্তু বাবা, জিনার ফিরতে প্রায়ই আজকাল সন্ধে হয়ে যাচ্ছে। ও নিজেই বলছিল ওই সময়ে আজেবাজে লোক ঘোরাফেরা করে। যদি কোনওদিন বিপদে পড়ে?

কল্যাণবাবুর দপ করে মনে পড়ে গেল—দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের মোড়ে জিনা দাঁড়িয়ে আছে মাধুর্য ও গরিমা বিস্তার করে, পেছনে দুটো সন্দেহজনক লোক। তিনি সামান্য একটু ভেবে নিয়ে খুব সহজভাবে বললেন, পাঁচটা নাগাদ তো? আমি ওকে আনতে গেলে হবে?

অতঃপর কল্যাণবাবু আসেন, যান। জিনার ছাত্রীরা বলে ওঠে—'ও দিদিমণি, ওই আপনার চলনদার এসে গেছেন।' জিনা কবজি উলটে দেখে তাই তো কাঁটা অনেকক্ষণ চারটে ছাড়িয়ে গেছে। দু-চারজন মেয়ে ক্রমে সাহস করে কাছে এসে বলে, মেসোমশাই পেন্নাম হই।

—আহা হা কর কী! কর কী! রোজ রোজ আবার পেন্নাম কী? কল্যাণবাবুর মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, তাঁর প্রৌঢ় মুখের সঙ্গে মানানসই ধবধবে সাদা চুল, মুখের শান্ত, ধীরভাব এগুলো মেয়েদের আশ্বস্ত করেছে। কাছে টেনেছে।

দুজনে ধীর কদমে বেরিয়ে আসেন। জিনা আর রিকশা করে না। হাঁটতে হাঁটতে চলে। কল্যাণবাবু জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে জিনা পড়ায়, কী কী শেখায়। সে যে যোগাসন, আর গানও শেখাচ্ছে, সিলেবাসের বাইরে হলেও, শুনে সমর্থনের মাথা নাড়েন তিনি। 'গল্পগুচ্ছ' আর 'গীতবিতান' অবলম্বন করে জিনা এগিয়েছে শুনে হতবাক হয়ে ছোট বউমার দিকে চান তিনি। বলেন, ঠিক বুঝেছ, এই মানুষটি একসঙ্গে এমন কাছে আবার এমন দূরে! জিনা মানে জিজ্ঞাসা করে এ কথার। তখন তিনি ব্যাখ্যা করেন কাছের রবীন্দ্রনাথকে ধরে কীভাবে দূরে সুদূরে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার পাথেয় তিনি নিজে পান। চেনা মানুষ, চেনা ঘটনা অথচ কোথাও এক জায়গায় তারা অচেনা হয়ে যান, আমাদের দৈনন্দিনতার জড়ানো পাঁক থেকে উঠে আসবার জন্যে ডাক দেন। এই ডাক আছে ঘটনাক্রমে চরিত্রগুলোকে উপস্থাপিত করবার ধরনে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে আছে ভাষায়। বাড়ি ফিরে দুজনে ঝুঁকে পড়েন 'গল্পগুচ্ছ'র ওপর। 'গীতবিতান' নিয়ে বসেন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া/বুকের

মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া' কিংবা 'বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে'—এইসব অতি পরিচিত পঙ্‌ক্তির জীবনে কতরকম প্রয়োগ হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা চলে। ক্রমশ এই আসরে মল্লিকাও যোগ দেয়। এবং অনতিবিলম্বে জিনার পাশে আর একটা ঘর জোগাড় করে আর একদল মেয়ের ক্লাস নিতে আরম্ভ করেন কল্যাণবাবু। এরা বাচ্চা মেয়ে, বালিকা, কয়েকটি ছেলেও আছে। গণিকাদের সন্তান। কয়েকটি মেয়ের তো ব্যবসায় নামবার বয়স হয়ে এসেছে। মুকুটের মতে—এদের বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই মায়েরা চাইছে না এরা ব্যবসায়ে নামুক। কিন্তু অন্য দিক থেকে চাপ আছে। খুব বেশিরকম। এবং সেই চাপ দেনেওয়ালারা চাইছে না কল্যাণবাবু বা আর কেউ এদের নিয়ে ক্লাস করুন।

জিনা বলল, কেন রে?

—ওদের ধারণা এইসব ক্লাস করলে মেয়েগুলোকে ব্যবসায় নামানো শক্ত হবে। মা আর মেয়ে দুজনে মিলে বেঁকে দাঁড়ালে ওদের মুশকিল।

কিন্তু তোদের সংস্থা যে এখানে কাজ করছে, এই এত মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, তাতে তো ওদের আপত্তি হচ্ছে না?

—হচ্ছে না, কেননা মেয়েগুলো তো ব্যবসা ছাড়ছে না। ছাড়লেই ওদের কাট-মানিতে টান পড়বে, তখনই ওদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে।

—কিন্তু তোদেরও তো শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য এদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা...

মুকুট একটু ইতস্তত করে বলল, জিনা তুই বোধহয় একটু ভুল বুঝেছিস রে। এখনও এইরকম টার্গেট আমাদের নেই।

—তা হলে?

—আমরা চেষ্টা করছি ওদের বেসিক এডুকেশন দিতে। স্বাস্থ্য-সচেতনতা জাগাতে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করে দিয়েছি, কতকগুলো ট্রেনিং সেন্টারও খুলেছি। যারা এইগুলো অবলম্বন করে স্বেচ্ছায়, নিজেদের কৃতিত্বে বাইরে চলে আসতে পারে আসবে। তবে দুঃখের বিষয়, বয়স্ক বা যাদের এখানে রুজি নেই তারা ছাড়া বড় একটা আসছে না কেউ এখনও পর্যন্ত। এতজনের কর্মসংস্থান করি, সে সাধ্য আমাদের কই? তাই ওসব বলি না।

জিনার হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় মুকুটের অস্বস্তি হল। সে বলল, দারিদ্র আর জনসংখ্যা এই দুটো ফ্যাক্টর সমস্ত উন্নয়নের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় রে জিনা! তুই আগে জীবন রক্ষা করতে পারবি, তবে তো গুণমানের প্রশ্ন উঠবে? এত জীবন, এত! এত! একেবারে দুঃস্থ। পোকামাকড়ের মতো জন্মে যাচ্ছে। এরা তো তবু নিজেদেরটা যেমন করে হোক জুটিয়ে নিচ্ছে। আরও কত মানুষ আছে কোনওক্রমে আস্তাকুঁড় ঘেঁটে জীবনধারণ করছে। কতজন আছে—কৃষক ছিল, জমি গেছে, কারখানার শ্রমিক ছিল, কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। দেখছিস তো কাজ জানা লোকগুলো না খেতে পেয়ে কীভাবে আত্মহত্যা করছে।

উত্তরে জিনা বলল, তা হলে...তা হলে মুকুট এডস্ তো বেশ ভাল জিনিস ছিল রে! জনসংখ্যা কমাবার নিশ্চিত উপায়। হোক না। হয়ে যাক না! বাধা দিচ্ছিস

কেন?

—বলছিস কী? পুরো সভ্যতা, পুরো মানবসমাজই যে শেষ হয়ে যাবে রে?—মুকুট অবাক।

—সভ্যতা কাদের নিয়ে বল—জিনা বলল। সমাজটাই বা কাদের জন্যে? সবাইকে নিয়েই তো সভ্যতা! না কী? জীবনের গুণমান উন্নত করার নামই তো সভ্যতা। তা বেশির ভাগ মানুষই যদি এইভাবে বাঁচে, তা হলে মুষ্টিমেয়র সুখ আর নিরাপত্তার জন্যে প্রাণপণ এইসব চেষ্টায় তো ঠিক সভ্যতার বাঁচার প্রশ্ন থাকে না আর! সম্প্রদায়ের বাঁচা হয়ে যায়—সেটা সভ্যতা না অসভ্যতা! বেশ এসেছিল এডস্‌টা সময় বুঝে। কী সুন্দর ফাঁকা হয়ে যেত রাস্তাঘাট। বেড়ে উঠত বনজঙ্গল, বহুতল উঠত না, গ্রাউন্ড ওয়াটার শূন্য হয়ে আসত না। ইতিহাসে লেখা থাকত—কী করে মৃত্যু হল এই সভ্যতার। বইপত্তরের তো আর এডস্ হয় না! তারপর যে কটি লোক বেঁচে থাকত আবার নতুন করে শুরু করত! তাদের গাইড করার জন্যে বইপত্তরগুলো রয়ে যেত।

মুকুট আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল জিনার তীব্র মুখভঙ্গির দিকে। সুদ্ধু সময় কাটছে না বলে যে সুখী সম্পন্ন গৃহবধূ মেয়েটিকে সে সামান্য একটা আংশিক সময়ের প্রোগ্রামে ঢুকিয়েছিল, সে যে এমন সব প্রশ্ন তুলতে পারে তা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয় শত হোক এ তো সেই জিনাই যে ক্লাস-মনিট্রেস ছিল। আন্তরিকভাবে যে ক্লাসে শৃঙ্খলা ও সুবিচার রাখার চেষ্টা করত। সেই জিনা যে একটি মুখচোরা নতুন মেয়েকে ক্লাসসুদ্ধু মেয়ের ও টিচারদেরও মানসিক অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে ছিল। পরে, নিজেদের পরিবারের দাবি ওর ওপর ক্রমাগত বেড়ে গেছে। পরিবারের সংস্কার পরিবেশ ওকে একটা ঘরোয়া, নিষ্ক্রিয় জীবন বেছে নিতে বাধ্য করেছে। তবু এ তো সেই জিনাই। একেবারে সেই যাকে সে ছোটবেলায় কিশোর বয়সে চিনেছিল!

ঋত্বিকের 'রোচনা' চলছে রমরম করে। আসল বাড়িটা শেষ হওয়ার আগেই এক দিকে একতলা সাময়িক হস্টেল খাড়া করা হয়েছে। কিছুটা জমি একেবারে নিরঙ্কুশ খেলার মাঠ হিসেবে পিটিয়ে সমান করা। পুকুরটা চতুর্দিক থেকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের দোলনা, স্লাইড ইত্যাদি হয়েছে একটা আলাদা পার্কে। পঞ্চাশজন বোর্ডার দিয়ে শুরু হয়েছিল রোচনা। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এদের। নানান বয়সের ছেলেমেয়ে। ঠিক কারা কোন কোন জায়গা থেকে আসবে এ নিয়ে মুকুটের সঙ্গে ঋত্বিকের একটু মতভেদ হয়। ঋত্বিকের মতে শুধু ছ' বছরের বেশি, এবং বারো বছরের কম বয়সি ছেলেমেয়েদের রাখা হোক। যত জনকে বিনা বাছাবাছি রাখা যায় ততই ভাল, এ বিষয়ে অবশ্য দুজনেই একমত ছিল। কিন্তু জায়গা সীমিত, একটা না-একটা মানদণ্ড স্থির করতেই হয়। মুকুটের ইচ্ছে ছিল দশ বছর থেকে শুরু করে ওপরের দিকে যত দূর পর্যন্ত পারা যায়, রাখা। তার যুক্তি এই বয়সটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। মেয়েগুলোকে এই সময়ে ব্যবসায় নামানোর তোড়জোড় শুরু হয়। এবং কী মেয়ে, কী ছেলে এই সময়টায় সচেতন হয়ে ওঠে। তারা কে, তাদের অবস্থান কী, সমাজ তাদের কী চোখে দেখে, এসব সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠতে থাকে এই সময়টাতেই। কিছু কিছু মা মেয়ের জন্য ভিন্ন ভবিষ্যৎ চায় বই কী। কিন্তু সেখানেও একটা 'বিয়ে' বাদে আর কিছু দেখতে পায় না। মেয়ে বিয়ে করে ঘরসংসার করবে এটাই তাদের সবচেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্থানীয় ছেলে, অর্থাৎ বারাঙ্গনাদেরই পুরুষ সন্তানদের সঙ্গে এদের তথাকথিত বিয়ে যে হয় না, তা নয়, কিন্তু শেষোক্তদের বলতে গেলে কোনও উপার্জনই নেই। তারা বউকে খাটিয়ে, তার রোজগারেই খায়, আর মস্তানি করে। এই অপেক্ষাকৃত বড়দের কিন্তু ঋত্বিক 'রোচনা'য় স্থান দিতে একেবারেই ইচ্ছুক নয়। সে বলে—আমরা এখানে রিফর্মেটরি স্কুল খুলছি না মুকুট। পুনর্বাসনও আমাদের লক্ষ্য নয়। যদিও রিফর্মেটরি ও রিহ্যাবিলিটেশনের গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমাকে ঠিকঠাক দক্ষভাবে কাজ করতে হলে আমার লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নিতে হবে আগে; তারপর সেই লক্ষ্যবস্তুর চারপাশের অনাবশ্যক বাহুল্য ছেঁটে ফেলে দিতে হবে। আমার লক্ষ্যবস্তু হল এই যাচ্ছেতাই আবহাওয়া থেকে বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো। কে কোথায় জন্মাবে সেটা যখন বেচারিদের হাতে নেই, তখন যে-শিশুরা দৈবাৎ বারোয়ারি মাতৃগর্ভে জন্মেছে, তাদের জীবনগুলো যাতে অভিশপ্ত হয়ে না ওঠে, সেটা দেখাই আমাদের লক্ষ্য। ওদের একটা চান্স পাওয়া উচিত। ছয় থেকে দশের মধ্যে ছেলেমেয়েগুলোকে এখানে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরও কাজ হতে পারে, কিন্তু সেটা হবে আলাদা। তোদের প্রজেক্টে তোরা এরকম কিছু করার চেষ্টা কর না, সাহায্য করব। কিন্তু আমার কাজ হল—এইটা।

পঞ্চাশটা বাচ্চার জন্য আপাতত পাঁচটা ছোট ছোট ডর্মিটরি হয়েছে। প্রত্যেক

ডর্মে একজন করে সুপার বা দিদি থাকেন। এই দিদিরাই এদের খাওয়াদাওয়া খেলাধুলো পড়াশোনা সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য মোট চারজন লোক আপাতত রাখা হয়েছে। আর আছে বন্দুকধারী দারোয়ান। সকালে একজন, বিকেলে একজন। মাস্টারমশাইরা বাইরে থেকে যাতায়াত করেন। প্রতি মাসে একবার করে ঋত্বিক নিজে এদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। রবিবার এদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। একটা বাস কিনে দিয়েছেন একজন শুভার্থী। বেড়াতে যাবার দিনে এদের সঙ্গী হন পরিচালন-সমিতির সভ্যরা, নিজেদের ইচ্ছে এবং সুবিধামতো, বাচ্চাদের মায়েদেরও পালা করে তাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়।

বাচ্চাদের এখানে নেবার আগে প্রত্যেক পল্লিতে ঋত্বিকরা ঘুরে ঘুরে প্রচার করে। সেই প্রচারের ফলে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের 'রোচনা'র অভিভাবকত্বে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে, তাদেরই নেওয়া হয়েছে। অল্পস্বল্প প্রতিবন্ধী বাচ্চাদেরও ফেরায়নি ঋত্বিক। একটি মেয়ে আছে কুশ পা, একটি ছেলের মাত্র তিনটি আঙুল। একটি আছে বামন। কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে স্বাভাবিক। এদের যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও সে করেছে। বলা বাহুল্য, আরও অনেক আবেদন এসেছিল। তাদের মধ্যে থেকে প্রথম পঞ্চাশটি গ্রাহ্য হয়েছে।

ভালভাবে চালু হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠান। একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। এইসময়ে দুটি স্থানীয় মস্তানের সঙ্গে বেশ কয়েকটি মেয়ে তাদের এক 'বাবু'র নেতৃত্বে এসে হাঙ্গামা শুরু করল।

—কী ব্যাপার? কী চান আপনারা?

—আপনি যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের হস্টেলের নাম অনাথ আশ্রম দিয়েছেন কেন? ওরা তো অনাথ নয়।

'রোচনা'র পরিচয় হিসেবে প্রচারপত্রে বলা আছে এটি একটি পরীক্ষা ও গবেষণামূলক উচ্চশ্রেণীর অনাথ আশ্রম।

ঋত্বিক জবাব দেয়, স্ট্রিক্টলি স্পিকিং, ওরা অনাথই। নাথ কথাটার মানে এখানে বাবা। শিশুদের দায়িত্ব বাবারই নেবার কথা। সেই হিসেবে...

বাবুটি বলল, বাবা নেই, কিন্তু মা আছে। আমি একজন যৌনকর্মীর ছেলে। বুক বাজিয়ে বলব— ইয়েস, আমি যৌনকর্মীর ছেলে, তো হয়েছে কী?

—কিছু হয়নি। ঋত্বিক বলল, আবার হয়েছেও।

—কী বলতে চান আপনি? এখন উন্নত দুনিয়ায় 'সিঙ্গল পেরেন্ট' সিস্টেম চালু হয়ে গেছে। শুধু মায়ের পরিচয়েই পরিচয় গ্রাহ্য হচ্ছে। আর এখন আপনি বলছেন এরা অনাথ!

—দেখুন, সিঙ্গল পেরেন্ট বলতে যা বোঝায় এদের সেরকম কিছুও নেই। এদের মায়েরা এদের রক্ষণাবেক্ষণ, পালন করতে পারে না। এরা স্রেফ রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়, পড়ে থাকে।

—সে তো পালন অনেকেই করে না। আপনাদের বড় বড় চাকুরে বিবিরা কে কত বাচ্চা দেখে তা জানা আছে।

—অনেকে দেখতে পারে না ঠিকই। কিন্তু তবু বাচ্চাটার তো একটা আশ্রয় থাকে! সন্ধে থেকে তো তাকে ঘর থেকে বার করে দেয় না মা। দেয়? দেখাশোনা করার জন্য কাউকে না কাউকে মাইনে দিয়ে হলেও রাখা হয়। অনেক সময়ে হস্টেলেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

—বেশ তো সেইসব হস্টেলের নাম কি অনাথ আশ্রম?

—তা অবশ্য নয়। তবে যদি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, দান-নির্ভর হয়, তাকে তো 'অরফ্যানেজ'ই বলবে। যেমন অনেক ক্রিশ্চান 'অরফ্যানেজ' আছে। বহু দরিদ্র মা, বাবা, বা দুজনেই সেখানে ছেলেমেয়েদের অনাথ পরিচয় স্বীকার করেই দিয়ে আসে।

—ও, চ্যারিটি বলেই এত অছেদ্দা?

—অছেদ্দাফেদ্দা নয় মশাই। আর শুনুন চ্যারিটি করছি বলে নয়। কিন্তু দেহ-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এই পরিচয়ে বড় হলে ওদের পরবর্তী জীবনে কাজকর্ম পেতে অসুবিধে হবে, বড় হলে পরিচয়টার মানে যখন জানবে, তখন নিজেদেরই হয়তো ছোট চোখে দেখবে।

—কেন দেখবে? আমি তো দেখি না! ইন ফ্যাক্ট, আমি গর্বিত!

ঋত্বিক এবার বিরক্ত হয়ে বলল, যাচ্চলে, গর্বিত হবার তো কোনও কারণ দেখি না। হ্যাঁ, এই পরিস্থিতিতে জন্মেও আপনি যদি বড় কিছু করতে পারেন, তখন গর্বটর্ব করতে পারবেন। না হলে জন্ম নিয়ে গর্ব করবার মতো কী ঘটেছে? আপনার মতো সৎসাহসই বা কতজনের আছে? আপনি পাড়ার গণ্ডির বাইরে কাজটাজ করতে গেছেন কি? যাননি। 'রোচনা'র ছেলেমেয়েদের আমরা নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। ছেলেরা যদি বা ওই পরিচয়ে বাঁচতেও পারে, মেয়েদের অসুবিধে হাজার গুণ। কেউ সুস্থভাবে বাঁচতে দেবে না।

—কেন? আমরা কি সুস্থভাবে বেঁচে নেই?

—একথার জবাব দিয়ে লাভ নেই। আপনি কি চাইছেন আপনাদের পাড়ায় যে মেয়েগুলো জন্মাচ্ছে, তারা ঘুরে-ফিরে এই ব্যবসাতেই আবার ফিরে আসুক?

পিছনে মেয়েগুলির মধ্যে একজন এইসময়ে বলে উঠল, আমাদের ব্যবসা খারাপ কী? ভিক্ষে তো করছি না। লোকে চাইছে তাই দিচ্ছি। এর মধ্যে আমরা অন্যায় কিছু দেখি না।

ঋত্বিক বলল, যাঁরা এরকম ভাবছেন, তাঁদের মেয়েদের আমরা রাখতে পারব না, তাদের এখান থেকে নিয়ে যান।

ছেলেটি বলল, কথাটার তো জবাব এড়িয়ে গেলেন। অন্যায় কী দেখলেন, বোঝান?

ঋত্বিক বলল, মাফ করতে হল ভাই, এ প্রশ্ন যে করতে পারে, তাকে ন্যায়-অন্যায় বোঝানো আমার কর্ম নয়। আর দেখুন একটা সময় ছিল, যখন এই মেয়েরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারত দেহ বিক্রি করে শুধু যৌনতা-সম্বল প্রাণী হয়ে থাকা অপমানকর, লজ্জাকর, অমানবিক, কিন্তু এখন আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ডকে গ্রাস করার জন্যে যে প্রচার আর চক্রান্ত চলেছে, তাতে এদের

আপনাদের সহজ বুদ্ধিটি ঘেঁটে যাচ্ছে। এরপর তো বলবেন শিক্ষকরা বিদ্যা বিক্রি করেন, ডাক্তাররা চিকিৎসা বিক্রি করেন, লেখকরা কল্পনা বিক্রি করেন। সেক্স বিক্রিটা আলাদা কীসে? ওসব বহুৎ শোনা আছে আমার, আমি আমার নিজের শর্তে সুস্থ মানুষ তৈরি করব এখানে। যাঁরা এখানে ছেলেমেয়ে পাঠাচ্ছেন তাঁরা এই শর্তই পছন্দ করছেন। আপনারা এবার আসুন।

স্থানীয় মস্তানদুটির দিকে একবারও তাকাল না সে। খুব ভাল করেই তার জানা আছে কনট্র্যাক্টরের কাছ থেকে মোটা দর্শনী আদায় করে ছেড়েছে ছোকরাদুটি। এখন অন্য ফ্রন্টে ভিড়ে চাপ সৃষ্টি করার মানে কী? দুর্নীতিরও একটা নিয়ম আছে। সেটা পালন না করলে বিপদে পড়তে হয়। তারও ওপরমহলে কিছু মামা-কাকা আছে। বেশি ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করলে সে এদের দেখে নেবে।

মুকুট জিনাকে নিয়ে সেদিন সামান্য আগে ঢুকেছিল। গোলমাল দেখে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। দলটা ক্যাচরম্যাচর করতে করতে চলে গেল। মেয়েগুলোর দাপট ছেলেটির দ্বিগুণ। চোখ ঘুরছে, হাত নড়ছে, মুখ নড়ছে।

ঋত্বিকের ভুরু কুঁচকে ছিল। মুকুটের সঙ্গে তার বান্ধবীকে দেখেও সোজা হয়নি। রুক্ষ স্বরে বলল, কী রে? বসতে বলতে হবে নাকি?

মুকুট মিটিমিটি হেসে বলল, এত মেজাজ খারাপ করলে হবে?

—দেখ মুকুট—ঋত্বিক বলল, এটা আমার কেরিয়ার ঠিকই। কিন্তু মিশনও। আমি আমার স্বার্থের জন্যে কালোকে সাদা আর সাদাকে কালো বলতে পারব না। অন্য কেউ বলবার চেষ্টা করলে, কেন বলছে বুঝতে তো আমার বাকি থাকে না। দাবড়ানি খাবেই।

—ধৈর্য! ধৈর্য ধরে না বোঝাতে পারলে তোর কাজটাই মার খাবে।

—রাখ তো! অন্ধকে তুই আলো চেনাতে পারবি? জন্মান্ধকে যদি বলিস এই যে ভাই এই ফুলটা লাল, এখন চাঁদ উঠেছে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক, সে বুঝতে পারবে? তাকে প্রথমে মেনে নিতে হবে। মেনে নিয়ে এবার সে তার অন্য বোধগুলো দিয়ে ধরবার চেষ্টা করুক চাঁদ ওঠাটা কেমন, ফুলের লাল রংটা কেমন...। নিজের মতো করে বুঝুক। এখন যদি কেউ তাকে বোঝায়— ও হে, ওসব চক্ষুটক্ষু কিছু নেই, পৃথিবীটাকে তুমি যেরকম বুঝছ পৃথিবীটা সেরকমই। আর এই যে তোমার চারপাশে অন্ধকার এটা নিয়ে দুঃখু করবার কিছু নেই, এটা একটা চমৎকার অবস্থা। তা হলে সেই লোকগুলোকে কী বলতে ইচ্ছে করে বল!

জিনার দিকে তাকিয়ে ঋত্বিক গলা নিচু করে বলল, স্যরি। তারপর মুকুটের দিকে তাকিয়ে বলল, যা না তোরা যা, আমি একটু পরে আসছি।

মাঘের রোদ বাসন্তী রঙের। ঘাসের রং গাঢ় সবুজ। ইংরেজি বড় হাতের ই-শেপ বিল্ডিংটার ঢালাইয়ের কাজ হয়ে গেছে। কাজেকর্মে, মিস্ত্রিদের জটলায় ওদিকটা সরগরম হয়ে আছে।

জিনা আগে যখন এসেছে কাজ এতটা এগোয়নি। এখন ব্যাপারটা কত বড় ভাল করে বোঝা যাচ্ছে। শ'তিনেক বাচ্চার ব্যবস্থা থাকছে। বারোজন

অ্যাসিসট্যান্ট সুপার, একজন চিফ।

সকলকেই তো মহিলা-ই রাখতে হবে! —জিনা জিজ্ঞেস করল।

—এইটাই আমাদের খুব ভাবাচ্ছে রে জিনা... মুকুট বলল, ছেলেগুলোর একটু পুরুষ-অভিভাবক চাই-ই চাই। আর ছেলেমেয়ে সবারই একটা ফাদার ফিগার প্রচণ্ড দরকার। সেইজন্যেই মাস্টারমশাইদের সবাইকে পুরুষ রাখা হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে রাখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তাতে বিপদ আছে বুঝিসই তো! হস্টেলে যেটা হয়, ছেলেদের হস্টেলে ছেলে, মেয়েদের হস্টেলে মেয়ে— এই ভাগটা এখানে করা যাচ্ছে না, বুঝলি?

—কেন? ছেলেদের আর মেয়েদের একদম আলাদা ব্যবস্থা করলেই তো পারতিস!

—সেটা সংখ্যার ওপর খানিকটা নির্ভর করছেই! ধর এখন যে পঞ্চাশজনকে নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে চল্লিশজনই মেয়ে।

—বলিস কী রে? এরকম কেন?

—এইরকমই রেশিও ছেলেমেয়েদের। এটা আমরা আগে বুঝিনি। কাজ করতে গিয়ে নজরে এসেছে। এ নিয়ে কোনও সার্ভে নেই। এখন সত্যিই রেশিও এই, না মেয়েগুলোকেই এরা হস্টেলে বেশি পাঠাচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে বড় যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে মোটে তিনজন ছেলে। ধর, বারো বছর থেকে মোটামুটি ওদের মেল সুপারের কাছে থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি। বছর তিনেক সময় হাতে পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে হবে কী করা যায়। বিদেশি মডেলগুলো স্টাডি করতে হবে। মুশকিল কী জানিস? এসব কাজে 'মেল' পাওয়াও এখানে খুব দুষ্কর। মানে 'কোয়ালিটি মেল'। তুই বিজ্ঞাপন দে, অজস্র দরখাস্ত পাবি, কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে, বিশেষত এই বাচ্চাদের সারাদিন দেখাশোনা করতে রাজি হবে এরকম 'মেল' তুই পাবি না। বকাটে ছেলে, কিংবা এক্কেবারে ভোঁদা, কোথাও কোনওরকম গতি হচ্ছে না, এরকম আছে। কিন্তু তাদের নিলে কাজের থেকে অকাজই হবে বেশি। অথচ তুই ফিমেল খোঁজ যথেষ্ট পেয়ে যাবি। ভদ্র, সভ্য, বাচ্চাদের ওপর একটা স্বাভাবিক মমতা আছে, দরকার হলে শাসন করতেও পারে, ডিসিপ্লিন্‌ড্‌, সবচেয়ে বড় কথা ইচ্ছুক, দক্ষতা যদি একশো ভাগ না-ও থাকে, কিছু এসে যায় না। শিখে নেয়।

—তা উপায় যখন নেই, ফিমেল দিয়েই চালা।

মুকুট বলল, কী জানিস, ফ্যামিলির গঠনে পুরুষদের একটা মস্ত বড় ভূমিকা থাকে। যতই তুই 'সিঙ্গল পেরেন্ট' কনসেপ্ট চালু কর।

—সেটা তো নিরুপায় হয়েই করা, তাই নয় কি?—জিনা জিজ্ঞেস করল।

—তা তো বটেই। পরিবার হবে ব্যালান্সড্‌। নারী পুরুষ উভয়ে নিজের নিজের জায়গায় থাকলে ভারসাম্য থাকে। এইসব পল্লিতে পুরুষ-সংসর্গহীন যে ছেলেগুলো বেড়ে ওঠে তারা কেমন আধাপুরুষ মতো তৈরি হয়, এদিকে আধাপুরুষ, ওদিকে আবার অত্যাচারী শোষক টাইপ, মায়েরা খুব আশকারা দেয় তো! তো আমরা সেইজন্যেই টিচারদের সব পুরুষ রেখেছি। আর যখন ওরা

বেড়াতে যায় তখনও মাস্টারমশাইদের ডিউটি দেওয়া হয়।

কথা বলতে বলতে দুজনে গাছের তলার দুটো ক্লাস পার হল। শীতের রোদ গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে গায়ে এসে পড়েছে। বছর আট-নয়ের জনা দশেক বাচ্চার দল। একটা দল নামতা মুখস্থ করছে, আর এক দল একসঙ্গে কবিতা বলছে—বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপু রে...। বাকি তিরিশজন ভেতরের ঘরে পড়াশোনা করছে। আপাতত ওদের ছবি আঁকার সময়। রং-পেনসিল আর কাগজ নিয়ে বসে গেছে।

জানলা থেকে দৃশ্যটা দেখছিল দুজনে। ব্রাউন আর সাদাতে পোশাক ওদের। পরিষ্কার ইস্ত্রি করা। চুলগুলো পাট করে আঁচড়ানো; ছেলেমেয়ে উভয়েরই চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখতে দেখতে জিনা বলল, দেখলে একদম বোঝা যায় না।

—কী?

—এই...যে...বাবা নেই!

—বাবা তো একটা না-একটা আছেই—মুকুট হেসে বলল, তা ছাড়া সবাই কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন নয়। কারও কারও পাড়াতেই বাবা রয়েছে, দালাল-টালাল। অনেকের আবার রেগুলার্স থাকে তো। 'বাবু' যাকে বলে। এদিকে আয়, ওই যে পুঁচকেটা বসে আছে দেখ...খাড়া খাড়া চুল, গোলচোখো...ওইটা তোর বনমালার ছেলে। বনমালার ভদ্রলোক বাবু আছে। তারই ছেলে।

—কী মিষ্টি বাচ্চাটা, বলতে বলতে জিনার মুখটা তালশাঁসের মতো সজল, ভারী হয়ে এল। সে বলল, দেখ মুকুট, কোনও কিছু নিয়েই খুব একটা হা-হুতাশ করবার অভ্যেস আমার নেই। যারা পালন করতে পারবে না, তাদের না-চাইতেই কেমন বাচ্চা, অথচ আমি চাই, একটা হলে বেঁচে যেতাম, অথচ কী অবিচার দেখ...

মুকুট বলল, দুর, তোর কি সময় চলে গেছে? কতটুকু বয়স তোর?

—না আর হবে না—গোঁয়ারের মতো বলল জিনা।

—কেন? ডাক্তার দেখিয়েছিস! ছোটখাটো অসুবিধে থাকলে সার্জারি করিয়ে নে। চিকিৎসা করা।

—কিচ্ছু নেই। ডাক্তার দেখিয়েছি। আর চান্স নেই। জাস্ট ব্যাড লাক।

—ডাক্তার বলেছেন?

—বলেননি। আমি বলছি।

—যাঃ, তুই তো এ রকম হতাশ-টাইপ ছিলি না!

—এখনও নেই, এই ব্যাপারটাই আমার কেমন ডিফিডেন্স এসে গেছে।

—তোর বর? বরকে দেখিয়েছিস?

—ওরে বাবা, তাকে কে বলবে? এক ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দেবে। বলবে আমাকে যে কিম্পুরুষ প্রমাণ করবে সে এখনও মায়ের পেটে।

—খুব দোর্দণ্ডপ্রতাপ নাকি রে, তোর বর?

—ওরে বাবা!

—তা সে যত দোর্দণ্ডই হোক, অনেক সময়ে অনেক কারণে হয় না। ডাক্তারের পরামর্শ নে। নিতে বল। এটা ঠিক করছিস না।

এইসময়ে ঋত্বিক পেছন থেকে এসে বলল, খালি সব্বাইকে ঠিক করছিস না, ঠিক করছিস না...ভেবেছিস কী বল তো!

ওরা চমকে পিছনে তাকাতে ঋত্বিক বলল, ঠিক করা না-করা বিষয়ে মুকুট নিজের সিদ্ধান্ত দিনে কতবার ঘোষণা করে জিজ্ঞেস করো তো জিনা...

সকাল দশটা নাগাদ নিখিল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে জিনা। বেশির ভাগ দিনই নিজের ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রোচনায় আসবার সময় পেলেও সারাদিন কাটাতে পারে না। আজ সারাদিনের প্রোগ্রাম করে এসেছে।

ঋত্বিক বলল, আমাদের একজন মূল্যবান যোগ হয়েছেন!

জিনা বলল, মানে?

মুকুট বলল, ভ্যালুয়েবল অ্যাডিশন বলতে চাইছে রে।...দুজনে হেসে অস্থির।

ঋত্বিক অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, একজন নতুন সুপার এসেছেন। চমৎকার মানুষ, ঠিক আছে তো?

যেখানে বাচ্চাদের ডাইনিং রুমে সব লাইন করে নিজেদের স্টেনলেস স্টিলের খোপ খোপ থালি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে ইশারায় দেখাল ঋত্বিক। জিনা চাপা গলায় বলল, ইনি? তোমার মূল্যবান যোগ।

ঋত্বিক ঠাট্টা-ইয়ার্কি গ্রাহ্যই করল না। বলল, এঁর হিস্ট্রি শোনো। এক বৃদ্ধাশ্রমে তিন মাস ছিলেন। দুই ছেলে দুই বউ দুজনেই ছোট্ট ছোট্ট কৌটোর মতো ফ্ল্যাটে থাকে। ছেলেমেয়ে বড় হতে আর মায়ের জায়গা হতে চায় না। নিজের উইডো-পেনশন আর কিছু এফ.ডি-র সুদ হাতে ছিল, সেই সম্বল করে উনি বৃদ্ধাশ্রমে এসে উঠেছিলেন। ভাল লাগছিল না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একদিন সোজা এখানে এসে উপস্থিত। বললেন—গ্র্যাজুয়েট না হতে পারি, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিলুম। হিস্ট্রি, ইকনমিক্স, লজিক ছিল, ফোর্থ সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র মুখস্থ, রবীন্দ্রনাথ সব পড়েছি বলতে পারব না, কিন্তু প্রায় সব। কত যে গল্প জানি তার ইয়ত্তা নেই। নাতি-নাতনিদের সমস্ত ভার ছিল আমার। তুমি আমাকে এক মাস রেখে দেখো।

মুকুট বলল, উনি এদের পরিচয় জানেন?

—অফ কোর্স।

—কী বললেন?

বললেন?—ঋত্বিক হাসতে হাসতে বলল, উনি ছড়া কেটে বললেন—শিশু হল শিশু, শিশু মানেই যিশু, আমার কোনও ইতর বিশেষ নেই।

—তারপর?

—তারপর...ওঁকে তো এরা দিদা বলে। ভীষণ পপুলার...রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর একটা গল্প বলার সেশন হয়। বাচ্চারাও শোনে, তাদের দিদিরাও শোনে। উনি আমার এক অমূল্য...

জিনা বলল, 'যোগ'—না না—ঋত্বিক বলল—মনে পড়েছে 'সংগ্রহ'—'অমূল্য সংগ্রহ'। থ্রি-টিয়ার ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের সবচেয়ে ওপরের স্তরটা না চাইতেই এইভাবে পেয়ে গেছি। এর মধ্যে উনি আবার বাচ্চাদের জ্বর, পেটের গোলমাল,

কানব্যথা এ সব আমাদের সাহায্য ছাড়াই সারিয়ে দিয়েছেন। সারা অঘ্রাণ মাস বড়ি দিলেন, ছেলেমেয়েরাও ওঁর সঙ্গে বড়ির নাক তুলল টেনে টেনে। আচারও করেছেন প্রচুর। সরস্বতী পুজো আসছে, বলছেন—কিচ্ছু ভেবো না বাবা, সমারোহ করে সরস্বতী পুজো করব। রান্নার মেনু ঠিক করেন, কীভাবে কী করতে হবে বলে দেন। সব্বাই বলে মা। সব্বাই মেনে নিয়েছে। আমরা বলি সুধাদি।

জিনা যেখানে পড়াতে যায় আর ঋত্বিকের এই 'রোচনা' দুটোতে পরিবেশের দিক থেকে আকাশ-পাতাল তফাত। খুব লোভ হচ্ছিল এখানে কাজে যোগ দেবার। কিন্তু তার কাজটাও তো একটা চ্যালেঞ্জ! সে কি চেষ্টা করলে এই বাচ্চাদের মায়েদেরও এরকম একটা সুন্দর জীবন দিতে পারে না? সবাইকে না পারে, কয়েকজনকে সে এ প্রফেশন ছাড়াবেই! খুব ভাল প্রোগ্রেস করছে তার পূর্ণিমা আর বনমালা। রাখিও মন্দ করছে না। বাকিদেরও মন লেগেছে। পূর্ণিমার লেখাপড়ায় মাথা বেশি। বিশেষ করে অঙ্কে। এত তাড়াতাড়ি সে পাটিগণিতের যাবতীয় সমস্যা ধরে ফেলতে পারছে যে তার দিদিমণিই এক এক সময়ে বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে। তাকে অঙ্কগুলো নিয়ে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে বসতে হচ্ছে অনেক সন্ধ্যায়। বনমালা অত মেধাবী নয়। কিন্তু সে পড়তে ভালবাসে। গোয়েন্দাগল্প পড়ার শখ খুব। গান শিখেছে খুব ভাল। গলাটা অন্যদের মতো অমার্জিত নয়। বেশ একটা ঝঙ্কার আছে গলায়। কিন্তু জিনার জেদ, পূর্ণিমা আর বনমালাকে একসঙ্গে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসাবে। সিলেবাস ধরে ধরে একটু একটু পড়াতে শুরু করেছে সে। মুকুট অনেকবার বলেছিল—ওদের পরীক্ষা পাস করাবার কোনও প্রয়োজন নেই। নিজেদেরটা বুঝে নেবার মতো শিখলেই হল। কিন্তু জিনা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। মুখে সে আজকাল কিছু বলে না। তর্ক করে তো কোনও লাভ নেই। কিন্তু তার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী কাজে কারওই বাধা দেওয়ার অধিকার নেই বলে সে মনে করে। কল্যাণবাবুও মোটের ওপর তার সঙ্গে একমত। যদিও তিনি জিনার মতো অতটা আশাবাদী নন।

একটা সেবামূলক কাজের পথ ধরে যে জিনার জীবনে একটা লক্ষ্য এসেছে, স্থিতি এসেছে, এতে কল্যাণবাবু ভেতরে ভেতরে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করেন। তাঁর ধারণা যদিও জিনা খুবই ভদ্র মেয়ে তবু এই সন্তানহীনতার সূত্রে স্বামীর সঙ্গে তার একটা তিক্ততার সম্পর্ক হয়ে যেতে পারত। নিখিলের কোনও হেলদোল নেই। সে পিতা হতে পারল কি পারল না, তার স্ত্রী সুখী কি সুখী নয়, যদি না হয় সেজন্য কী করা দরকার, কিছু করা দরকার কি না, এ সমস্ত চিন্তাই যেন তার চরিত্রের বাইরে। সে আজকাল রাত দশটা-এগারোটা করে বাড়ি ফিরলে নিজের ঘর থেকেই কল্যাণবাবু অনেক সময়ে শুনতে পান জিনা সিঁড়ির ওপর থেকে অর্ধেক হাসি অর্ধেক অনুযোগের সুরে বলছে—এই যে 'নমো যন্ত্র?' এলেন? নমো যন্ত্র, নম টাকায়, নম অফিসায়, নম অফিসস্য চেয়ারায়, নমো নমঃ।

নিখিল বলছে, ছ্যাবলামি করো না রাতদুপুরে।

—রাতদুপুরে বাড়ি ফিরলে ছ্যাবলামিটা তো রাতদুপুরেই শুনতে হবে। আর কখন শোনাব?

যেদিন ওদের ক্লাবে বা অন্য কোথাও পার্টিতে যাবার থাকে, জিনা ক্লাস সেরে তাড়াতাড়ি ফেরে, কল্যাণবাবুকেও তাঁর ক্লাস তাড়াতাড়ি ছাড়তে হয়। ফিরতে ফিরতে জিনা বলে—আচ্ছা বাবা, ওদের ক্লাবের মিসেস কাপুর, মিসেস নায়ার, মিসেস কারনানিদের একদিন করে একটু অবিনাশ কবিরাজে ক্লাস নিতে বললে কেমন হয়? বেশ বলব—দুপুরের কিটি-পার্টিটার বদলে একদিন আপনাদের একটা দুর্দান্ত জায়গায় নিয়ে যাব। বলেটলে...সার সার ওপেল, এস্টিম, হোন্ডা সব থাকবে সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু-এর ওপর...বলতে বলতে জিনা তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা হাসতে থাকে। এখন সে কল্যাণবাবুর সঙ্গে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছে। পুরনো শ্বশুর-ছেলেবউ সম্পর্কটা যেন একটা নতুন সমীকরণে এসে দাঁড়িয়েছে। নিখিলের থেকে জিনা তাঁর অনেক বেশি কাছের মানুষ। এমনকী কাকে তিনি বেশি চেনেন, কার সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্কটা এটাও অনেক সময়ে গুলিয়ে ফেলছেন কল্যাণবাবু।

বিয়েবাড়ির পরে

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে অবশেষে ঋত্বিক-মুকুটের বিয়েটা ঘটল। দু জনেই জানে বিয়েটা হবে, অথচ কেউই উদ্যোগ করে কথাটা পাড়ছিল না। ঋত্বিকের দিকে বাবা-মা কেউই নেই। কিন্তু মুকুটের আত্মীয়স্বজন অগুনতি। মুকুটের মা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, মুকু, তুই-ই বরং ওকে প্রপোজ কর, ছেলেটা কাজপাগল তো! ভুলো-মতো।

মুকুট হাঁ হাঁ করে উঠেছিল। কিন্তু তার বাবা শ্লেষের হাসি হেসে যখন বললেন, 'এই তোর আধুনিকতা? এই তোর নারীবাদ!' তখন বেচারি হার স্বীকার করে নেয়। পরদিনই ঋত্বিককে গিয়ে বলে—তোর পাগলামোর জন্যে আমাকে আর কত গালমন্দ শুনতে হবে?

ঋত্বিক অবাক হয়ে বলে, আমার জন্যে তোকে? গালমন্দ? ব্যাপার কী বল তো!

—বিয়েটিয়ে করবি তো আমাকে? না শুধু ওয়ার্কিং পার্টনার? খোলাখুলি বল তা হলে আমি অন্য জায়গায় মানে অন্য পাত্রফাত্র খুঁজি। —মুকুট বলে।

—যাচ্চলে! তো এ কথাটা এতদিন বলিসনি কেন? অন্য পাত্রফাত্র হাটা। আমি রেডি।

তবে বিয়ে উত্তর-আধুনিক। নো পুরোহিত, নো সপ্তপদী, নো সম্প্রদান, নো বরমাল্য, নো সিঁদুর। মুকুটের মা রাগ করে বললেন, রেজিস্ট্রেশনটাই বা তা হলে ইয়েস কেন? লিভ-টুগেদার করলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

রিসেপশন হল মুকুটদের বাড়ির কমিউনিটি লন-এ। নিমন্ত্রিত বেশি নয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব। তবে জিনাদের পুরো পরিবার নিমন্ত্রিত। কেননা, ক্রমশ ক্রমশই জিনার দিদিভাই, জিনার বাবা অর্থাৎ শ্বশুর, জিনার দুই ভাসুরঝি—এদের সঙ্গে মুকুটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। জিনা ছাড়াও মল্লিকার সঙ্গে মুকুটের কথাবার্তা হয় ফোনে। কল্যাণবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও মুকুটের কম হয় না ইদানীং।

দেখা গেল মুকুট আর ঋত্বিকই আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানোদাওয়ানোর ব্যাপারটা সামলাচ্ছে। মুকুটের মা আশ মিটিয়ে সেজেছেন। কাকিমা, মাসিমা, বোনেরা সবাই। খালি মুকুটই কোনওমতে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীল রঙের একটা সিল্ক। কিন্তু বাকি চেহারা সেই একরকম। কোনও গয়না-ই সে পরবে না। পরলে নাকি তাতে গোরুচোরের মতো দেখাবে। ঋত্বিক আর এক কাঠি বাড়া, ধুতি পাঞ্জাবি তো নয়ই, পায়জামা পাঞ্জাবি পর্যন্ত নয়। সুটফুটও নয়। সে স্রেফ আগের দিনে পাটভাঙা ট্রাউজার্সের সঙ্গে একটা ধোপদুরস্ত শার্ট পরেছে। টি-শার্টটা নাকি কোনওক্রমে খোলানো গেছে। তার ওপরে লেখা ছিল ক্যালিফোর্নিয়া ব্লু।

তবে জিনাদের উপভোগের ঘটনা বড় কম ঘটল না। এক মাসি মুকুটকে খুব সুন্দর কানবালা উপহার দিয়েছেন। তাঁর আবদার সেটা তাকে এক্ষুনি এখানেই

পরতে হবে। মুকুট অবলীলায় জমকালো কানবালাগুলো কানে গলিঁয়ে নিল। কান পর্যন্ত ছোট চুল, তেলা মুখ, চুল উড়ে কপালটা ঢেকে গেছে। শাড়িটাকে অদ্ভুতভাবে পরেছে। আঁচলটা পুরো সামনে টেনে এনে কোমরে গুঁজে নিয়েছে। হঠাৎ কানে ঝলমলে কানবালা পরায় যে মজাটা হল তাতে ঋত্বিকও যোগ দিল। মুকুট বলল, দেখ আমার কোনও ইয়ে নেই। মাসি আদর করে দিয়েছে, না পরলে কান্নাকাটি করছে, তো ঠিক আছে বাবা, পরে নিচ্ছি।

সেই শুনে তার এক কাকিমা ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, 'এত বড় কথা। মাসিরটা পরবি, আর কাকিরটাই দোষ করল? আমার হারটা যদি না পরিস তা হলে কেউ আর আজ আমাকে জলগ্রহণ করাতে পারবে না।' তিনি একটা জমকালো হার পরিয়ে দিলেন মুকুটের গলায়। এভাবেই হাতে বালা পরানো হল, কোন পিসি আত্মঘাতী হবেন বলায়।

তখন ঋত্বিকের কাকা একটা আংটি নাচিয়ে বললেন, 'বাপধন, সকলকার সব কথাই যখন থাকছে, তখন তোমার এই বৃদ্ধ কাকার কথা মেনে আংটিটি না হয় বউমার আঙুলে পরিয়েই দিলে!'

কাকার বয়স বোধহয় সবে পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে।

শুনে ঋত্বিক হঠাৎ তৎপর হয়ে বলল, 'আংটি? পরাতে যদি হয়ই কাকু তা হলে তোমার আংটি কেন, নিজের আংটি আমি নিজেই পরাব।'

ওস্তাদ জাদুকরের মতো সে শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা চমৎকার মুক্তোর আংটি বার করল এবং শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে সেটা মুকুটের আঙুলে পরিয়ে দিল।

মুকুটের মা নিশ্বাস ফেলে জিনাকে বললেন, যাক বাবা, তোর বন্ধুটা তা হলে একেবারে ছন্নছাড়া বাউন্ডুলের পাল্লায় পড়েনি। মিনিমাম একটা সেন্স আছে।

মুকুট কিন্তু রাগ করে বলল, ও যেন এক্সপেক্ট না করে আমিও ওকে এখন আংটি পরাব। কেননা, আমাদের মধ্যে পরিষ্কার কথা হয়ে গিয়েছে যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোনও রকম অনুষ্ঠানই আমরা পালন করব না। আংটিমাংটিই যদি হবে তা হলে মালাই বা কী দোষ করল?

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই কে বা কারা রজনীগন্ধার দুটো মোটা মালা একটা মুকুটের হাতে আরেকটা ঋত্বিকের হাতে ধরিয়ে দিল। মালাবদলও হয়ে গেল তুমুল হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে। ঋত্বিক সঙ্গে সঙ্গে মালাটা খুলে জিনার হাতে দিয়েছিল। মুকুট কিন্তু সেই মালা গলায় পাঁচমিশালি গয়না পরেই কোমরে আঁচল গুঁজে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়ার তদারকি করতে লাগল।

বরকে অনেক কষ্টে নিয়ে এসেছে জিনা। বিমান কিছুতেই এলেন না। চেনেন না, শোনেন না, স্ত্রীর পরিচয়ে নেমন্তন্ন যাওয়া এমন কথা তিনি নাকি কখনও শোনেননি। নিখিল এসেছে জিনাকে নিয়ে। কল্যাণবাবু বাকিদের নিয়ে এসেছেন। নিখিলের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় ঋত্বিক এবং মুকুটেরও।

বাড়ি এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে এক এক করে গয়নাগুলো জিনা খুলছে, নিখিল একটা পা টুলটার ওপর তুলে দিয়ে বলল, তারপর জিনারানি! তোমার বন্ধুবান্ধবরা যে এত প্রোগ্রেসিভ তা তো জানা ছিল না?

জিনাও ওদের বাড়াবাড়িতে একটু বিরক্ত। যতই কেন সারা পৃথিবী ঘোরার অভিজ্ঞতা থাক, দেশাচার হল দেশাচার। সে বলল আমিই কি জানতাম! একটু সিঁদুর পরাতে কী আধুনিকতা নষ্ট হয় আমি বুঝি না বাবা!

—সিঁদুর? তোমার মুকুট সিঁদুরফিঁদুরের মর্ম কী বুঝবে? তুমি তো আগে বলনি মেয়েটির প্রস্টিট্যুটদের সঙ্গে ওঠা-বসা!

—ওঠা-বসা আবার কী? ও তো একাধিক এন.জি.ও-র স্পেশ্যাল অ্যাডভাইজার। বিরাট দেশজোড়া ব্যাপার। ওদের উন্নয়নের জন্যে... জিনা মনে মনে একটু ভয় পেয়েছে। এই যদি নিখিলের মনোভাব হয় তা হলে জিনার কাজকর্মের কথা জানতে পারলে ও কী করবে?

ঠুকে ঠুকে পাইপে তামাক ভরছিল নিখিল। পাইপটা এবার দাঁতে চেপে বলল, দুটোয় কোনও তফাত আছে বুঝি?

—তফাত নেই? জিনা অবাক।— ছ বছর থাইল্যান্ডে, নরওয়ে, ইংল্যান্ড, আমেরিকায় ইউ.এন.ও-র চাকরি করেছে মুকুট। সোসিওলজিতে ডক্টরেট ওর কর্নেল য়ুনিভার্সিটির।

—হাই-ফাই বেশ্যা কাকে বলে জান? নিখিলের গলায় সংযত শ্লেষ।

—বাজে কথা বলো না। ছিঃ!

—এইসব এন.জি.ও যারা চালায় তারা লেখাপড়া জানা ফান্ডা-অলা স্মার্ট আধুনিকা মেয়েদের কাজের নামে কবজা করে বুঝলে ম্যাডাম? তারপর তাদের সেরকম হাইক্লাস কাস্টমারের কাছে পাঠায়। ইউ.এন.ও-র অফিসার, এমব্যাসিট্যাসির সাহেবসুবো... কে যে এজেন্ট আর কে খদ্দের বুঝতেই পারবে না তোমার মতো গর্দভরা... দেখো হয়তো ওই ঋত্বিকই ফার্স্টক্লাস এজেন্ট একটা। নামে বিয়েটাও রইল...

—তুমি চুপ করবে?

—সত্যি কথা শুনলে রাগ হয়ে যায়, না?—বলতে বলতে নিখিল জিনার গয়না খোলা ডান হাতটা হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল—বেলেল্লাপনা অনেক দূর এগিয়েছে মনে হচ্ছে? আর কোনওদিন ওই মুকুটফুকুটের সঙ্গে দহরমমহরম করেছ তো, একটা মোচড় দিল সে জিনার হাতে, জিনা ককিয়ে উঠতে ছেড়ে দিল হাতটা।

—পতিতোদ্ধারিণী! হুঁঃ!

হাতটা টনটন করছে। হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে নিখিল।

একে কিছু বোঝাতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এটুকু জিনা বুঝে গেল। এ থাকে এর নিজস্ব ধারণার জগতে। নিজেকে বা অপর কাউকে বদলাবার কথা ভাবে না। এর মনের বাড় নেই, ধ্যানধারণার অগ্রগতি নেই। তেমন তেমন জায়গায় এ আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে! ডান হাতের লাল পলার মতো দাগটার দিকে সে একবার তাকাল। আদিম যুগের পুরুষ প্রথম কি এভাবেই শাসন করেছিল তার নারীকে? সেই আদিম এখনও এইভাবে বেরোবার সুযোগ খুঁজছে? সে ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ বার করল, ঠান্ডা কমপ্রেস দিতে থাকল কবজিতে

অনেকক্ষণ। বাড়ির এ অংশে তাদের একটাই শোবার ঘর, আর একটা শ্বশুরমশাইয়ের। তৃতীয় একটা ঘর আছে। সেটাকে তারা বলে টি.ভি-র ঘর। সোফা-কোচ এসব আছে। কিন্তু শোবার কোনও ব্যবস্থা নেই। তা হোক সে নিঃশব্দে টি.ভি-র ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। এই এটুকু ছাড়া তার কোনও আড়াল নেই। আর কোনও জায়গাও নেই।

অনেক অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারেনি জিনা। ভাবতে ভাবতে একসময়ে মনে হল সত্যিই তো সে কতটুকু জানে? বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে বলতে গেলে তার কোনও জ্ঞানই নেই। মুকুট আর ঋত্বিক তাকে যতটুকু দেখিয়েছে, যতটুকু বুঝিয়েছে তার ওপর নির্ভর করেই তো তার সব ধারণা। তবে ঋত্বিক যে সত্যি সত্যিই মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটা ভালর দিকে পরিবর্তন আনতে পেরেছে এটা সে দেখেছে নিজের চোখে। কিন্তু মুকুট? মুকুট কেন বলল এদের খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়েই ছেড়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য! কেন নিরুৎসাহ করল জিনাকে যখন সে মেয়েদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার কথা বলল? নমিতাদি নামে যে প্রজেক্ট ডিরেক্টরের সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত, তিনি তো ওর কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। এখন যদি জিনা বলে ওঁরা এইভাবে একটা সাক্ষর বারবনিতা সম্প্রদায় সৃষ্টি করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন, সব দেশে চালান দিতে পারবেন বলে? কী উত্তর দেবেন ওঁরা? বিভিন্ন দেশে বসবাস এবং কথাবার্তা, কাজ চালানোর জন্যে যতটুকু দরকার শুধু ততটুকু নিয়েই তো এঁদের মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে। পরীক্ষা দেওয়া বা ডিগ্রি ডিপ্লোমা লাভ করলেই যে স্বর্গলাভ হয় না, তা সবাই জানে। কিন্তু ওটা তো একটা ছাড়পত্র। যে কোনও চাকরি, উচ্চতর শিক্ষা, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ-এ যাবার একটা অনুমতিপত্র। ন্যূনতম। এইটুকু থাকলে একটা মানুষের ভেতরে জোর আপনি আসে। পৃথিবীর দরজা তার সামনে খুলে যায়। সে বেরোতে চাক বা না চাক। অথচ এই সামান্য কথাটা নমিতাদিরা বুঝতে চান না। হয়তো নিখিল যা বলছে তা ঠিক, মুকুটের ক্ষেত্রে ঠিক নয়, কিন্তু অন্য অনেকের ক্ষেত্রে ঠিক। এবং মুকুট এটা জানে। এরকম ঘটনা ঘটছে, অথচ মুকুট জানে না এটা তো হতে পারে না! এত বছরের অভিজ্ঞতা! জিনার মতো ভ্যাবাকান্তও নয়, খাঁচার পাখিও নয়। এইসব ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে যেতে থাকল। নিখিলের ভয় বা রাগ তো হতেই পারে! গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ, রাগও প্রচণ্ড, ওর দুশ্চিন্তার চেহারা ওইরকমই হবে! এর আগে কোনওদিন জিনার গায়ে হাত তোলেনি ঠিক, কিন্তু হাত না তোলার মতো মার্জিত, সুভদ্র মানুষ তার স্বামী নয়, এটা সে বুঝে গেছে!

এইভাবে কখনও ঋত্বিককে, কখনও মুকুটকে, কখনও নিখিলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে করাতে, তাদের হয়ে জবাবদিহি দিতে দিতে তার শেষ রাতের ঘুমটা এসেছিল। ঘুমের মধ্যে মানুষ অনেক কিছু বিস্মৃত হয়ে যায়। দরজায় টোকা শুনে সে পরিস্থিতি একেবারে ভুলে গিয়ে ঘুমচোখে দরজা খুলে দিল।

—খুব লেগেছে? —নিচু গলায় নিখিল জিজ্ঞেস করল, দেখি?

জিনা হাতটা সরিয়ে নিল। তার চোখে সহসা জল আসে না, এখন সে টের পায়

ঘুমভাঙা চোখে অশ্রুর কামড়।

—জিনা, তুমি তো জান আমি একটু... এসো, ঘরে এসো।

অনুনয়ের সুর তার গলায়। জিনা সামান্য একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ও দিকের ঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ পেয়ে সে আর দেরি করে না। পত্রপাঠ ফেরত আসে।

—তুমি তো জান, আমি কাজে এত ব্যস্ত থাকি ন'টা-দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। তোমার জন্যে কি আমার ভাবনা হয় না! নিশ্চিন্ত থাকতে না পারলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তুমি ওই মুকুটটুকুটের সঙ্গে মেলামেশা করো না জিনা। শি ইজ ডেঞ্জারাস। এনিওয়ে ওদের সমাজটমাজ আলাদা। বাবা পাইলট ছিলেন, ওর মাকে দেখলে না? দিব্যি তো জিন উইথ লাইম পেগের পর পেগ ওড়াচ্ছিলেন! তুমিও তো আমার সঙ্গে পার্টিফার্টিতে গেছ, কখনও সফ্‌ট্‌-ড্রিংক ছাড়া কিছু নিয়েছ! ওদের এড়িয়ে চলো। কোথায়, কখন, কী ফাঁদে পড়ে যাবে, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না।

জিনার তর্ক করতে ইচ্ছে করছিল না। তখনও চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে। শেষ রাত। তা ছাড়া এসব বিষয়ে ভাল করে ভাবনা-চিন্তা না করে, না জেনে-শুনে আলোচনার মধ্যে সে আর যাবে না। প্রথম সুযোগেই মুকুটকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করবার আছে তার। সে পাশ ফিরে চোখ বুজল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল—ঘুম অত সহজ নয়। কেননা নিখিল বউয়ের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের শারীরিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এই শেষ রাতে। ভাল লাগছে না, তার এখন এসব ভাল লাগছে না, মন না থাকলে শুধু শুধু শরীরকে উত্তেজিত করে কিছু লাভ হয় না। এরকম মনহীন মিলনে সে আনন্দ পায় না। অন্যজনও কি পাবে? তার ভেতরের বিমুখতা স্পর্শ করবে না ওকে? কিন্তু উপায়ই বা কী!

—হ্যালো

—মল্লিকাদি, কেমন আছ?

—ভাল, কিন্তু জিনা তো এখনও ফেরেনি মুকুট!

—জানি। তোমাকেই ডাকছিলাম।

'ডাকছিলাম।' কেমন অদ্ভুত কথাটা। কেউ তাকে ডাকে? ডেকেছে কখনও? সে বলল, বলো।

—মুসৌরি যাচ্ছি। মল্লিকাদি, তোমরা যাকে বল 'হনিমুন'। তুমি গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, শাশুড়ি সহযোগে, পুরী।

হাসির শব্দ ভেসে এল।

—তুমি যা ভিতু, তোমার সব সময়েই একটা প্রোটেকশন দরকার হয়। না?

—না মুকুট। তুমি যা ভাবছ আমি সেরকম না।

—সেই দুপুরের স্বপ্নগুলো...দেখ? ম্যমির মতো লোক তাড়া করেছে...

শিউরে উঠে মল্লিকা বলল, না। অনেকদিন দেখিনি। তুমি কি এখনও সেই নিয়ে ভাবছ?

—ঠিক আছে। কেন জানি না বেড়াতে যাবার সময়ে তোমার কথা মনে হল। ভাল থেকো।

মুকুট শেষ কথাটার জবাব দিল না।

—চেষ্টা তো করি। বিপদে পড়লে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকতেই হয়। —মল্লিকা বলল।

—'বিপদে আমি না যেন করি ভয়—' এই মন্ত্র জপ করবে। বুঝলে?

—বুঝলাম। যাও, তোমরা আনন্দ করে এসো। তাড়াতাড়ি ফিরো। আমাদের ভুলে যেয়ো না।

একই পৃথিবীতে নানান মানুষ জন্মাচ্ছে। প্রত্যেকের জিভে জীবনের স্বাদ কেন আলাদা রকম? সে বুঝতে পারে পৃথিবীটা কোথাও খুব সুন্দর, জীবনটাও খুবই চমৎকার। কিন্তু তার অনুভবে ব্যাপারটা ধরা দিতে দিতেও দেয় না। এই অল্প বয়সের দুঃখ-কষ্টের চোঁয়াঢেঁকুর কি সারা জীবনই উঠতে থাকবে? কেন? কেন সে এর ওষুধ খুঁজে পায় না? অথচ, তার তো সবই আছে। দিদি মাঝে মাঝে চিঠি লেখে—'মল্লি, তুই খুবই ভাল আছিস জানি। আমার একমাত্র ছেলেটা লন্ডনে সেট্‌ল করে গেল, কাউকে বোঝাতে পারি না এ কষ্ট।' এ কি কাউকে তেমন করে ভালবাসতে না পারার কষ্ট? এ কথাও মল্লিকার এক এক সময়ে মনে হয়। সে কাউকে ভালবাসেনি, তাকেও কেউ ভালবাসেনি। কেউ নেই যাকে বিশ্বাস করে নিজের সব কথা বলা যায়। শাশুড়ি যথেষ্ট আদর দিতেন, কিন্তু তাঁকে বলতে পারেনি, স্বামী সদাশয়, তাকেও বলতে পারেনি—সবাই যেন বড্ড দূরে দূরে। হাত বাড়িয়ে সে কাউকে ছুঁতে পারে না। ভেতরে কথা জমে, কান্না জমে, বুকটা পাথর হয়ে থাকে। তার যদি একটা সত্যিকারের বাবা থাকত! সেইসব গল্পের বাবার

মতো যাঁরা মেয়ের সুখশান্তির জন্য কোনও কাজেই পিছপা হন না! একজন অগতানুগতিক বাবা!

গা ধুয়ে একটা হলুদ খড়কে ডুরে পরে সে আয়নার সামনে দাঁড়াল। কপালে ভাল করে একটা টিপ আঁকছে। রঙিন কুমকুম দিয়ে। ফোনটা বাজল। এইসময়ে সাধারণত রং নাম্বারগুলো আসে। ঝুম্পা-মাম্পির বন্ধুরা জানে ওরা এ সময়ে থাকবে না। জিনার বাপের বাড়ির ফোনগুলোও আসে সন্ধের পর।

—এটা কি তেত্রিশ নম্বর ডাফ স্ট্রিট?

—আপনি কাকে চাইছেন?

অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ বলল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত'জ ক্লিনিক থেকে বলছি। মল্লিকা দেবী কি আছেন?

—হ্যাঁ। কেন? বলছি।

—আপনার বাবা কল্যাণবাবুর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আপনারা যে যে আছেন, চলে আসুন। ওঁকে হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।

মল্লিকার হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল। কেমন গা-বমি করছে। বাবা? অ্যাকসিডেন্ট? বাসের তলা, না ট্রাকের তলা! দলা পাকানো রক্তাক্ত একটা দেহ ছাড়া চোখের সামনে সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কী করবে? এসব সময়ে কী করতে হয়? সে বিমানের অফিসে ফোন করল। বেজে যাচ্ছে। অফিস বন্ধ। বিমান বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে পারবে না। অন্তত ঘণ্টা দুই সময় তো লাগবেই! তা হলে? নিখিল? না, নিখিল না। কোনওক্রমেই নিখিল নয়। কিন্তু নিখিলও তো বাবার ছেলে। তারও তো খবর পাওয়া উচিত! বোতাম টিপল সে ফোনের। দীর্ঘদিন তার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই মল্লিকার।

—হ্যাললো।

গলা কেঁপে গেল তার।

—বউদি বলছি। বাবার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত'জ ক্লিনিকে আছেন।

এক মুহূর্ত চুপ। তারপর কণ্ঠ ভেসে এল—বাড়িতে থাকো। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

প্রতি মুহূর্তে বিমানকে আশা করছে মল্লিকা। জিনা। অন্তত জিনাও তো আসতে পারে। কোথায় 'রোচনা' না কী এক প্রজেক্ট নিয়ে মেতেছে। —ঋত্বিকের ব্যাপার। ওরা সম্ভবত জিনাকে একটু দেখাশোনা করতে বলে গেছে।

বেলের শব্দ। কেমন শীত শীত করছে তার। সে দরজা খুলে দিল। নিখিল। সময় নষ্ট না করে বলল, এসো। দরজায় চাবি দিয়ে কোনওমতে গাড়িতে উঠল মল্লিকা।

সামনের দরজাটা খুলে ধরেছে নিখিল, অন্ধের মতো সে উঠে গেল।

—কী হয়েছে?

—কিচ্ছু জানি না। শুধু ওইটুকু বলেই ওঁরা ফোন রেখে দিলেন।

—জিনা কই?

—জানি না। কোথাও বেরিয়েছে। —খুব সাবধানে জিনার গন্তব্যস্থল গোপন রাখে মল্লিকা। ভীষণ রাগ হয় জিনার ওপর। সে যদি থাকত এরকম আতান্তরে পড়তে হত না তাকে। পরক্ষণেই রাগটা নিজের ওপর এসে পড়ে। একটা কাজও কি সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে করতে পারে না! কী হত ফোনটা করেই ডক্টর সেনগুপ্তর ওখানে চলে গেলে! নিখিলের সঙ্গে এক গাড়িতে যাবার গ্লানি তা হলে তাকে ভোগ করতে হত না। বাড়িতে কাউকে কোনও মেসেজ দেওয়া গেল না। কারও কাছে চাবি নেই। সে বাড়িতে থাকে বলে, বিমান সবসময়ে ডুপ্লিকেট রাখে না। কী ভাবে ঢুকবে ওরা?

ক্লিনিকে গিয়ে পরিষ্কার হল ব্যাপারটা। পা ছড়িয়ে ডাক্তারের বেড-এ শুয়েছিলেন। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। মাথায় ব্যান্ডেজ।

ডাক্তার বললেন, মাথা ফেটেছে। সতেরোটা স্টিচ দিতে হয়েছে। কিন্তু বাঁ পায়ে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। হসপিট্যালে যেতে হবে। খুব সম্ভব অপারেশন করতে হবে।

—কী করে হল? রাস্তায় কি মাথা-টাথা ঘুরে পড়ে গেলেন?

—পড়ে যাবেন কী? ডাক্তার বললেন, মারা হয়েছে ওঁকে পেছন থেকে। লাঠির বাড়ি। সোনাগাছির ব্যাপার...কী কারণে কার ওপর রাগ হয়েছে, মেরে দিল বুড়ো মানুষটাকে...

—সোনাগাছি? —নিখিলের হতবুদ্ধি মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন—আরে—এদিকে উনি বাচ্চাদের কী সব ক্লাস-ট্লাস নেন।

—সোনাগাছিতে?—নিখিল মল্লিকার দিকে তাকাল—বাবা ক্লাস নেবার আর জায়গা পেলেন না?—মল্লিকা কোনও জবাব দিল না।

শ্যামবাজারের দিকে একটা নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করে পরের দিনই অপারেশনের প্রস্তুতির কথাবার্তা বলে ফিরতে ফিরতে রাত নটা বেজে গেল। মল্লিকা কয়েকবার ভাবল নিখিলের ওপর এবার সবটা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে নিশ্চয় এখন হুলুস্থুল পড়ে গেছে। কিন্তু নিখিল এত গম্ভীর আর বাবা এমন করে তার ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে আছেন! দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যন্ত্রণাও হচ্ছে খুব। সে কিছুতেই কথাটা বলতে পারল না।

কিন্তু বাড়িতে এসে দেখল, আলো জ্বলছে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। নিজের চাবিটা সে খুঁজে পেল না, বেল শুনে দরজা খুলে দিল ঝুম্পা। পেছনে মাম্পি। —'কোথায় গিয়েছিলে মা?' বিমান নাকি স্থির করেছিল সাড়ে নটা অবধি দেখে পুলিশে খবর দিতে যাবে। জিনাই আগে আসে, সে-ই সবাইকে দরজাটরজা খুলে দিয়েছে। হারানো চাবিটার কথা কয়েকদিনের ডামাডোলে মল্লিকা বেমালুম ভুলে গেল।

জিনার অনুপস্থিতিতে আসলে তার কাজটা কদিন চালিয়ে দিচ্ছিলেন কল্যাণবাবু। পূর্ণিমা আর বনমালাকে তিনি একটু আলাদা করে কোচ করছেন। এদের দুজনেরই ক্লাস ফোর-ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যা ছিল। মাথা ভাল। অন্যদের অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। সেদিন পাঁচটা বাজে দেখে তিনি উঠে পড়েছিলেন। তখনও দু-একটা শক্ত অঙ্কের সমস্যা মাথায় ঘুরছিল। অনেকদিন

আগের বিদ্যে তো! মরচে পড়ে গেছে। বান্ধবসমিতির চৌকাঠ থেকে দশ-বারো গজও যাননি মাথার পিছনে একটা প্রচণ্ড আঘাতে চোখে সর্ষেফুল দেখলেন কল্যাণবাবু, একটা লাঠি আর গোটা দুই মানুষের আবছা আকৃতি, ব্যস আছড়ে পড়লেন রাস্তায়। অজ্ঞান। লাঠির বাড়ি খেয়ে আঁক করে একটা শব্দ হয়তো করেছিলেন। শোনবার মতো কেউ কাছাকাছি ছিল না। দোকানপাটও তখন সব ঝাঁপ বন্ধ। পূর্ণিমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরের সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল বনমালা। তখনই দেখে দৃশ্যটা। হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন কল্যাণবাবু, মাথা থেকে একটা রক্তের ধারা নেমে পাঞ্জাবির পিঠ ভিজিয়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে। তারপর তাদের সাহায্যে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তোলবার সময়ে একবার চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে যান কল্যাণবাবু। তখনই বোঝা যায় পা-ও ভেঙেছে। সামান্য পরে জ্ঞান আসতে বাড়ির ফোন নম্বর তিনিই বলেন।

পরের দিন তাঁকে দেখতে গিয়ে জিনা চুপিচুপি বলল, বাবা, ও কিন্তু এখনও জানে না আমিও ওখানে যাই। জানলে তুলকালাম করবে। কিন্তু আপনাকে মারল কে বলুন তো?

এ কথা কল্যাণবাবুও অনেক ভেবেছেন। তাঁর ধারণা লাঠিটা ছিল অন্য কারও জন্য। ভুল করে তাঁর মাথায় এসে পড়েছে। তবু তিনি আর ঝুঁকি নিতে চান না। জিনার আর ওসব জায়গায় না যাওয়াই ভাল। জিনাকে পাহারা দিতেই তো তিনি ওখানে ঢুকেছিলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল দুটি বাজে লোককে পিছু নিতে দেখেন তিনি বাস থেকে। তবে? তবে কি তাঁর মতো একজন সঙ্গীকে জিনার পাশ থেকে সরানোই কারও উদ্দেশ্য ছিল? এখন কতদিন তিনি অচল হয়ে থাকবেন কে জানে? জিনা একা যাতায়াত করবে?...সর্বনাশ! যতক্ষণ না পরদিন বিকেলে জিনা নার্সিং হোমে এল তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

বিকেল চারটে না বাজতেই আসে জিনা আর মল্লিকা। এ সময়ে ছেলেরা আসে না। নাতনিরাও নয়। এ সময়টুকু তাই প্রাইভেট। অপারেশনটা হয়ে গেছে। ফিমার ভাঙেনি এই রক্ষা। কিন্তু হাঁটুর তলায় সাপোর্টিং রড ঢোকাতে হয়েছে।

জিনা বলল, ইস বাবা, আমার জন্যেই আপনার এত দুর্ভোগ।

তখনই কল্যাণবাবু সুযোগ পেয়ে গেলেন, বললেন, বুঝে বলছ? না না-বুঝে কথার কথা বললে?

—কথার কথা? বাবা?—জিনা রীতিমতো অভিমান করে—আমি কি জানি না—আমার জন্যেই আপনি...

—কথাটা তা নয় জিনা। আজকাল ছোট বউমাকে জিনাই বলেন কল্যাণবাবু, যেটা আমাকে ভাবাচ্ছে সেটা হল কেন এই ঘটনাটা ঘটল।

মল্লিকা বলল, কেন ঘটেছে, অত বৃত্তান্ত ভাবতে হবে না। আপনারা তো দিব্যি মানবেন না। নইলে বলতুম আমার মাথার দিব্যি রইল—আপনারা দয়া করে আর ও পাড়ায় যাবেন না।

—আদেশ নাকি?—কল্যাণবাবুর মুখে মৃদু হাসি।

—তাই বলেন তো তাই। একটু হাসি মল্লিকারও মুখে। পরক্ষণেই সেটা মুছে গেল। সে বলল, বাবা এত জানেন শোনেন, এভাবে বাস্তব বুদ্ধি কী করে লোপ পায় আপনাদের আমি জানি না। মুকুটরা করছে, তাদের পেছনে একটা পুরো প্রতিষ্ঠান আছে, আপনারা কার ভরসায় করছেন এসব? একার চেষ্টায় এসব করা যায় না বাবা!

জিনা বলল, একা তো নয়! আমাদের দায়িত্ব তো মুকুটদেরও আছে। আমারটা তো আছেই। আমাকে ওরা পে করে। বাবারও বইপত্তর, ব্ল্যাকবোর্ড সবই তো দিয়েছে। দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

মল্লিকা বলল, উঁহু, জিনা তুমি মুকুটদের কাজ পুরোপুরি করছ না। তুমি নিজের মতো করে করছ। ওদের গাইড-লাইন তুমি মান না, নিজেই বল সে কথা। বল না?

—দিদিভাই, তুমিও কি ওদের মতো বলবে— এইসব মেয়েরা এইভাবেই থাক। অন্ধকার পার হতে না পারুক। আমরা ভাল আছি, ভাল থাকব, আমাদের মুক্তির জন্য, ভাল থাকার জন্য কত চিন্তা, আর এই পৃথিবীতেই দেশে দেশে মেয়েদের একটা বিরাট অংশ এইভাবে... তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

কল্যাণবাবু বললেন, ঠিক আছে মা, এখন ক'দিন যাক না! পরে ভেবে দেখা যাবে কী করা যেতে পারে। কিছু না-কিছু একটা উপায় বার হবেই।

ফেরবার পথে ওরা নিখিল বা বিমানের সঙ্গে ফেরে। আলোচনা থেমে যায়।

সকালবেলা মল্লিকা একাই আসে। সেদিন এসে দেখল দুটি মেয়ে বসে আছে। তাদের সঙ্গে কল্যাণবাবুর রীতিমতো আলোচনা হচ্ছে কোনও এক অজ্ঞাত বিষয়ে। সে অবশ্য দুয়ে দুয়ে চার করতে পারল। কিন্তু সত্যিই, মেয়েদুটিকে দেখে বোঝবার জো নেই তারা কোথায় থাকে, কী করে। ছোটটি তার ঝুম্পার মতো, ঝুঁটি করে চুল বাঁধা একটা ক্লিপ দিয়ে। মেয়েটি মনে হয় খুব কান্নাকাটি করেছে, চোখদুটো লাল, ঈষৎ ফুলে আছে। শামলা রঙের মুখখানি ভেজা ভেজা। একটু দরিদ্রের ঘরে যেমন লাবণ্য অভাবের তলায় চাপা পড়ে থাকে, এর চেহারার জাত সেইরকম। তা নয়তো বেশ বাড়ন্ত, তরুণীসুলভ। সালোয়ার-কামিজ পরে রয়েছে মেয়েটি, ছাপা কাপড়ের। কোনওরকম প্রসাধন নেই। কল্যাণবাবু বললেন, এর নাম পূর্ণিমা, আমাদের ছাত্রী, ইনি মল্লিকা, তোমাদের দিদিমণিরও দিদিমণি। আর এর নাম বনমালা।

দুজনেই টিপ টিপ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে ফেলল। মল্লিকা বাধা দেবার সময় পেল না।

বনমালা মেয়েটি একটা মিলের ছাপা শাড়ি পরেছে। ছোটখাটো, মল্লিকারই ধরনের, তারই মতো দোহারা কাটাকাটা চেহারা, মুখের আদলটা প্রতিমা-ধরনের, যদিও তেমন কোনও শ্রী নেই। এর চুলও তারই মতো ঈষৎ কোঁকড়া। চুলটা ছড়ানো ছিল। মেয়েটিকে দেখে কী যে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হল মল্লিকার সে বলে বোঝাতে পারবে না। মেয়েটির মাথায় সিঁদুর, ভুরু প্লাক করা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়ির

বউয়ের মতো অবিকল।

পূর্ণিমা সঙ্গে করে একটা খাতা আর বই এনেছে। অঙ্ক বুঝে নিচ্ছে কল্যাণবাবুর কাছে।

ওরা চলে গেছে, তবু মল্লিকা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। ঝুম্পা আর পূর্ণিমা, সে আর বনমালা কীরকম এক অথচ আলাদা। ঝুম্পা ফিজিক্স নিয়ে বি. এসসি পড়ছে, আর একবার জয়েন্ট দেবে, চান্স পেলেই ইলেকট্রনিকস এঞ্জিনিয়ারিং-এ চলে যাবে। আর ঝুম্পার বয়সি এই মেয়েটি? দেহ খাটিয়ে অন্নসংস্থান করে। কেউ নেই, বাবা, মা, ভাই, বোন, কোনও অভিভাবক যে একে পালন করবে। একভাবে জন্ম, আলাদা জীবন, আলাদা নিয়তি। আর ওই বনমালা? যদি ওর বদলে তারই কোনও অজগাঁয়ে গরিব চাষির ঘরে জনমজুর-খেতমজুরের ঘরে জন্ম হত, আর বনমালার কোনও বিপত্নীক কমপাউন্ডারের ঘরে! ও-ই যদি কোনও আরতি দে সরকারের চোখে পড়ে যেত! তা হলে তাদের ভাগ্য বদলাবদলি হয়ে যেত। আরতি দে সরকার যদি তাকে পছন্দ করে না ফেলতেন, তবে তারই বা কী গতি হত! ভাবতে ভয় পেয়ে গেল মল্লিকা। চুপচাপ সে টিফিন ক্যারিয়ারটা নিজের ব্যাগের মধ্যে থেকে নামিয়ে রাখল। ছোট্ট মিটসেফটার ভেতরে সন্দেশ জমে গেছে, বাকসোগুলো আয়াদের ডেকে দিয়ে দিল। পুরনো টিফিন ক্যারিয়ারটা ভরে নিল। দুটো বই নামিয়ে রাখল টেবিলে। আস্তে বলল—বাবা এবার যাই?

কল্যাণবাবু চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। এবার খুলে বললেন, রাগ করো না বউমা।

মল্লিকা অবাক হয়ে বলল, রাগ? রাগ করব কেন?

—আমি তোমার আপত্তির কথা জানি। ইউ আর জাস্টিফায়েড। তোমার মতো একজন শুচিশুদ্ধ বাড়ির বউ এদের সংস্পর্শ সহ্য করতে পারবে না, পারার কথা নয়, এটুকু বুঝতে আর অসুবিধে কী! আমরাই কি আগে পেরেছি? জিনাও পারেনি। কিন্তু একবার ব্যাপারটার ভেতর ঢুকলে বড় আত্মগ্লানি হয়! আজকের পৃথিবীতে, এখনও, এত মানবাধিকার কমিশন, এত নারীমুক্তি, এত সর্বহারার একনায়কতন্ত্র হচ্ছে, এরই মাঝখানে মেয়েদের এভাবে সেক্স-স্লেভ করে রেখে দেওয়াটা চলছেই। কারও মনে প্রশ্ন পর্যন্ত ওঠে না। একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া আর চিন কিছুকালের জন্য বন্ধ করেছিল জিনিসটা। এদের মধ্যে ভ্যালুজ গড়ে উঠতে পারেনি তেমন করে, তবু কাজটা জঘন্য, এরকম একটা বোধ এদের এখনও আছে। সেটাকেও কিন্তু নষ্ট করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। অর্গ্যানাইজ্‌ড্ ইনস্টিট্যুশন্যাল লিগ্যাল একটা বিশ্বজোড়া মেয়েবাজার তৈরির চেষ্টা চলছে মা। আমাদের কতটুকুই বা শক্তি। কতটুকু পারব, প্রাণপাত করলেও পারব না। কিন্তু এই পূর্ণিমার মতো মেয়েগুলোর জন্য বড় কষ্ট হয়। স্বাভাবিক মেয়ে, বেশ মেধাবী। এসব পাড়ায় বেশির ভাগই বুদ্ধিবৃত্তিতে সাব-হিউম্যান স্তরে রয়ে গেছে। কিন্তু এ মেয়েটা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিল। ইচ্ছে ছিল, আছে। ধরো, ও যদি সুযোগ পেত! কেন একটা স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ ও পাবে না? মানব-সম্পদের কী বিপুল অপচয় হচ্ছে বুঝতে পার? প্রজননের ক্ষমতা আছে বলে মানুষ প্রজননের

সীমা কোথাও টানবে না? পৃথিবী যত মানুষকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ভার চাপিয়ে দেওয়া হবে তার ওপর, সৃষ্টি হবে উদ্‌বৃত্ত মানুষ, আর উদ্‌বৃত্তকে নিয়ে চলবে বাকি মানুষদের। প্রিভিলেজ্‌ড্‌ মানুষদের অমানুষিক ব্যবহার? বনমালার তবু একটা আশ্রয় আছে। একটি লোকের সঙ্গে থাকে। একজনই। ঠিক আছে বাবা, সামাজিক পরিচয় না-ই হল, তবু তো একটা অর্থ আছে, শৃঙ্খলা আছে তার জীবনযাত্রার! কিন্তু পূর্ণিমা? আর বনমালার ওই লোকটিই বা কী? কেন দেবে না পরিচয়? কেন এভাবে মার্জিন্যালাইজ করে রাখবে? কেন?

—বাবা, আপনি বড্ড বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন, মাথায় সতেরোটা স্টিচ আপনার! —মল্লিকা বলল।

একটু অসন্তুষ্ট হলেন কল্যাণবাবু, বললেন, সত্যি, আমি অনর্থক নিজের চিন্তা নিয়ে তোমায় বিরক্ত করছি। তোমার নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন। তুমি কেন এসব ভাবতে রাজি হবে! আমারই ভুল!

মল্লিকা ছিল তাঁর মাথার দিকে। লজ্জা পেল, দুঃখও পেল ভীষণ। বলল, বাবা, আমি আপনার কথা সব শুনেছি, সবটা বুঝেছি বা মানছি তা বলব না, কিন্তু আপনার উদ্‌বেগ, কষ্ট এ সবই আমি বুঝেছি বাবা। তবে কী জানেন, আপনারা যেটাকে মনে করেন নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন, তেমন কিছুও কিন্তু খুব কম আছে। অনেক অনেক জট চারিদিকে, আমার মতো নিরীহ মেয়েরা হয়তো সেইসব জট কী করে খুলবে ভাবতে ভাবতেই জীবন কাটিয়ে দেয়। সে আবার আর একরকম অন্ধকার।

কল্যাণবাবু চমকে বললেন, তুমি একবার এদিকে আমার সামনে এসো তো!

তিনি একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেয়েছেন। বড় বউমাকে এভাবে কথা বলতে তিনি কখনও শোনেননি। অন্ধকার? কীসের অন্ধকার? মল্লিকা কেন এত দুঃখ পেল তাঁর কথায়!

মল্লিকা সামনে এসে দাঁড়াল। প্রশান্ত মুখ। বলল, এবার আসি? ওয়ার্নিং বেল বেজে গেছে।

কল্যাণবাবুকে চিন্তিত রেখে সে নীচে নেমে গেল।

নীচে নামতেই কে ডাকল—দিদিভাই! পাশের দিকের একটা বেঞ্চে বসে আছে পূর্ণিমা আর বনমালা। অর্থাৎ তারই জন্যে অপেক্ষা করছে।

পূর্ণিমা এগিয়ে এসে বলল, দিদির সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার। কী করি বলুন তো? দিদি তো এখন বেশ কিছুদিন আসবেন না!

মল্লিকা ভাবছিল। বনমালা বলল, যদি দিদির বাড়িতে যাই? একটুখানির জন্যে? ওখানে কি অনেকে থাকেন? বাইরের ঘর থেকে একটু কথা বলেই চলে আসব।

—কী কথা? আমাকে বলা যায় না! অবশেষে বলল মল্লিকা।

মেয়েদুটি মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

ওদের দিকে চেয়ে হঠাৎ মল্লিকার মনে হল চল্লিশের কাছে বয়স হল তার।

আজ অবধি একটা বিষয়েও নিজের বুদ্ধিতে, কাউকে জিজ্ঞেস না করে সামান্যতম কাজও করেনি সে। আজ, এতদিন পরে, একটা না-হয় করলই। এখন সকাল এগারোটা। দুই বাড়িতেই কেউ থাকবে না। তার বাড়িতে তবু মলি নামে কাজের লোকটি থাকে এইসময়ে। জিনার বাড়ি একেবারে ফাঁকা। সে বলল, চলো।

—যাব?

—হ্যাঁ, এসো—সে বেরিয়ে একটা ট্যাকসিকে হাত দেখাল।

—আজই যাব?

—বলছিলে যে জরুরি? এখন গেলে কথা বলতে পারবে।

জিনার বেল টিপল মল্লিকা।

—খুলে অবাক হয়ে গেল জিনা। এদিক দিয়ে তো মল্লিকার আসার কথা নয়!

—কী ব্যাপার? দিদিভাই! পরক্ষণেই মেয়েদুটিকে দেখতে পেল সে।

—তোরা? —ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল জিনা।

মল্লিকা অপেক্ষা করল না। চলে গেল।

বনমালা বলল—দিদি পূর্ণিমার ওপর ওরা যা-নয়-তাই অত্যেচার করছে।

—কে?

—মাসি। পাড়া থেকে কেনাদের দলকে ডেকে এনেছে। কাল সারা রাত দফায় দফায় কেনাদা রবিগুন্ডা সবাই মিলে ওকে রেপ করেছে। মাসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করিয়েছে এসব। আমি খবর শুনে গিয়ে ছাড়াই।

শিউরে উঠে জিনা বলল—কেন? হঠাৎ?

—এর কোনও 'কেন' সবসময়ে থাকে না দিদি। ওদের পাওনা-গন্ডার শেয়ার না দিলে, মাসির রাগ হলে এসব যখন-তখন হয়। ও আসলে বলে ফেলেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, কলেজে পড়বে।

—কেন বললি? তোকে এসব বলতে বারণ করে দিয়েছিলাম না?

পূর্ণিমা ক্লান্ত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—আমি অঙ্ক কষছিলাম দিদি। লোক বসাতে ভাল লাগছিল না। বলেছিলুম—আজকের দিনটা আমায় ছেড়ে দাও না! তাইতে বলল—কেন? বিদ্যেধরী, জজ-ম্যাজিস্টর হবি, না কি? তাতেই বলে দিয়েছি—হবই তো, এ পাড়া আমি ছাড়বই ছাড়ব, কলেজে পড়ব, আইন পড়ব...তারপর তোমাদের দেখে নেব... বলেছি স্বীকার করছি দিদি। আমার মনে হচ্ছে মাসি আমাকে বিককিরি করে দেবে। কেনাদার সঙ্গে কাবলেমতো একটা লোক কথা বলছিল, আমার খুব ভয় করছে দিদি, ওরা আমাকে কোন দূরদেশে পাঠিয়ে দেবে।

তারই জন্য কি এ মেয়েটির জীবনে আরও অন্ধকার ঘনিয়ে এল? অন্ধকারেই ছিল। তাকে এত অন্ধকার বলে জানত না। এখন জানে। তার বাড়িতে থাকার জায়গা দেওয়া যায়। কিন্তু সেটা নিখিলের অনুমতিসাপেক্ষ। কত আর মিথ্যে কথা সে বলবে? দিদিভাইয়ের বাড়িতেও সেই এক প্রবলেম! তার ওপরে আছে দুটি কাজের লোক। তাদের অসীম কৌতূহল। পূর্ণিমার আসল পরিচয় খুঁজে বার করতে তাদের দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আচ্ছা 'রোচনা'য় নিয়ে গেলে

হয় না? ঋত্বিকের অনুপস্থিতিতে সেই এখন কাজ চালাচ্ছে। কারও অনুমতি নেবার দরকার নেই। সে বলল—এক্ষুনি এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। এখুনি যেতে হবে কিন্তু।

—এখুনি? জামা কাপড়? টাকা পয়সা? সবই তো...

বনমালা তাড়া দিয়ে বলল, সেসব আনতে গেলে আর ফিরতে পারবি না পূর্ণিমা। ওরা কি তোর ওপর নজর রাখেনি ভেবেছিস? যা-ই এখন পুরো পাড়া ঘুমোচ্ছে, তাই বেরিয়ে আসতে পেরেছিস। দিদি যা বলছেন শোন—আমি তোর যতটুকু পারি উদ্ধার করে দেবার চেষ্টা করব।

জিনা বলল, জামাকাপড়ের প্রবলেমটা আমি এখুনি সল্‌ভ্‌ করে দিচ্ছি। দাঁড়া। সে চটপট নিজের কিছু শাড়ি, ব্লাউস, সালোয়ার-কামিজ ইত্যাদি একটা জুটের ব্যাগে ভরে ফেলল। টাকা পঞ্চাশেক নিজের সঞ্চয় থেকে একটা পার্সে ভরে দিল। তারপর জামাকাপড় বদলে এসে বলল, বনমালা তুই ফিরে যা। পূর্ণিমা চল।

পূর্ণিমা ভয়ে ভয়ে বলল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ দিদি? লোকের বাড়ি কাজ করতে কিন্তু আমি পারব না।

—না, লোকের বাড়ি কাজ করতে নিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু সেভাবেও অনেকে বড় হয় জানিস? কাজকে ভয় করিস কেন?

—কাজের কথা হচ্ছে না। পুরুষ মানুষ থাকলে সে-বাড়ি আমি যাব না দিদি—পূর্ণিমা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জিনা বিরক্ত হয়ে বলল, বললাম তো কারও বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না!

—কোনও হোমটোমেও আমি যাব না।

—না রে বাবা, হস্টেল হয়েছে 'রোচনা' শুনেছিস তো? সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

—ওখানে তো আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েও আছে, যদি জানাজানি হয়ে যায়?

—অত ভয় করতে হবে না। আমি তো আছি। ওখানে বন্দুক হাতে দারোয়ান পাহারা দেয়। যে-কেউ ফট করে ঢুকতেই পারে না।

'রোচনা'তে সুধাদির জিম্মা করে দিল সে পূর্ণিমাকে। বেশি কথা বলল না, খালি জানাল—মেয়েটি কিছুদিন থাকবে। একটু বিপদে পড়ে গেছে। তাকে যেন কোনওমতেই বাইরে পাঠানো না হয়।

আসবার সময়ে পূর্ণিমা ডাকল—দিদি!

—কী?

—তুমি কিন্তু আর অবিনাশ কোবরেজে যেয়ো না।

—কেন?

—তুমি আমাদের পড়াও বলে অনেকের রাগ।

—মুকুটরাও তো পড়ায়।

—ওঁদের পড়ানো আর তোমাদের...ও অনেক আলাদা দিদি। ওঁরা তো শুধু অক্ষর চেনান। মাসিরা সব জোট বেঁধে বেঁধে বলে—তোমরা আমাদের ব্যবসা

ছাড়িয়ে দেবে। এত এত টাকার লোকসান হয়ে যাবে। কেনাদা রবিদারা বলে অত লেখাপড়া শেখার তোদের কী দরকার? মেসোমশাই ওইজন্যেই লাঠি খেয়েছেন। তুমি থাকলে তোমাকেও মারত। অনেক খুনে গুন্ডা আছে ও পাড়ায়। তোমাকে ওরা মারের বাড়া করবে। বিশেষ, আমি চলে আসাতে। বনোদিদি ঠিকই বলেছে। আজ গেলে আমি আর ফিরতে পারতুম না।

কেউ তাকে মারতে চায়? মারের বাড়া? জিনা নামে ঊনত্রিশ বছরের একটি মেয়ে, যে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম.এ পাস করে আর করার মতো কিছু না থাকায় বাবা-মা ইত্যাদি অভিভাবকদের কথায় চোখ বুজে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে, যে ইদানীং হাতে কিছু কাজ না থাকায়, নির্দোষভাবে করবার মতো কিছু চেয়েছিল এবং বন্ধুর মাধ্যমে এই কাজটা পেয়ে সর্বান্তঃকরণে নিঃস্বার্থভাবে কাজটা করছিল, তাকে মারবে? প্রথমটা সমস্ত মন পঙ্গু হয়ে গেল তার। সব জায়গায় সে সম্মান, আদর, প্রশংসা এইসব পেতেই অভ্যস্ত। প্রথমত মেয়ে, দ্বিতীয়ত ভদ্র বাড়ির মেয়ে ও বউ, উপরন্তু আছে তার নিজস্ব রূপ-গুণ। জীবনে করবার মতো কাজ সে কিছুই করেনি কোনওদিন, করতও না, করতে হয় তা-ও জানত না। প্রথম যে কাজটা করতে গেল সেটাতেই গুবলেট করে বসে রইল? কই, মুকুট এত বছর ধরে কাজ করছে, ঋত্বিক করছে, নমিতাদি করছেন, এদের তো কোনও বিপদে পড়তে হয়নি? এরই নাম পেশাদারিত্ব। মুকুট তাকে অনেকবার বলেছে—জড়িয়ে পড়িস না জিনা, বড্ড বেশি ইনভল্‌ভ্‌ড্‌ হয়ে যাচ্ছিস। এ রকম করলে কাজ করবি কী করে? আশ্চর্য! তার ধারণা ছিল লোকহিতকর কাজ করতে গেলে জড়িয়ে পড়তেই হয়। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বালবিধবাদের দুঃখে হাউ হাউ করে কাঁদতেন, বাছুরকে বঞ্চিত করা হয় বলে গোরুর দুধ খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের অমন স্পিরিচুয়াল কেরিয়ার? তাকে গৌণ করে দেশ, দেশবাসীর দারিদ্র, জাতিভেদ এই সমস্ত নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে করতে অকালে জীবন দিলেন। একই কথা আরও বেশি করে খাটে সিসটার নিবেদিতার ক্ষেত্রে। সর্বোত্তম লোকহিতের এইসব নমুনাকেই তো চিরকাল আদর্শ বলে মেনে এসেছে সবাই! আর আজকে! হঠাৎ উলটো কথা শুনতে হচ্ছে? এত ইনভলভ্‌ড্‌ হয়ে গেলে কাজ করবি কী করে? কথাটা তো মুকুট ভুলও বলেনি। অতিরিক্ত ইনভলভ্‌মেন্টের জন্যেই কি আজ কাজের পথ তার সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না?

কল্যাণবাবু বাড়ি এসে বসবার ক'দিন পর জিনা কথাটা পাড়ল তাঁর কাছে। এ কদিন সে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। যদি তাদের বাড়িতেই একটা ক্লাস বসানো যায় দুপুরে? তা হলে আর কাউকেই ও পাড়ায় যেতে হয় না। মেয়েরা, যারা তাদের ক্লাস চালিয়ে যেতে চায়, নিজেদের পাড়ার সঙ্গে বোঝাপড়া যারা নিজেরাই করতে পারবে, তারাই শুধু আসবে। মুকুটদের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক থাকবে না এটার।

কথাটা শুনে কল্যাণবাবু বুঝলেন জিনা মনে মনে বেশ জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁকে তো আর ছেলেমানুষি করলে চলবে না! এমনিতেই বিমান একেবারে নিখিলের উপস্থিতিতেই তাঁকে অনুরোধ করেছে বার বার, এসব গোলমেলে ব্যাপারে তিনি যেন আর জড়িয়ে না পড়েন। কিছু ঘটলে যখন সেই ছেলেদেরই সামলাতে হবে তখন তাদের মতামতের মূল্য তাঁকে দিতেই হয়! মল্লিকারও সায় আছে বিমানের কথায়। তিনি বললেন, কাজটা একেবারেই ঠিক হবে না জিনা।

—আপনিও বলছেন এ কথা?

—শোনো জিনা, ব্যক্তিগত জীবন আর কর্মক্ষেত্র আলাদা রাখতে হয়। দেখো, আমিও তো স্ট্রিট বয়েজদের পড়াতাম। কোনওদিন কি তাদের বাড়িতে এনে তুলেছি? দুটো এক হয়ে যায় কোথায়? সংঘে, সেবাশ্রমে। সেখানেও ব্যক্তিগত আব্রু, ব্যক্তিগত নিভৃতির প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করে না। এভাবে ভেবো না মা, কিছুদিন অপেক্ষা করো, একটা না-একটা উপায় বার হবেই। তা ছাড়া এ বাড়ি তো নিখিলেরও, তাকে না বলে এমন একটা স্টেপ তুমি নিতে পারো না।

—তা হলে যদি একজন-দুজনকে কোচ করার ব্যবস্থা করি।

কল্যাণবাবু হাসলেন, বুঝেছি, ওই পূর্ণিমা আর বনমালার ওপর তোমার বড্ড মায়া পড়েছে, তাই না?

জিনা চুপ করে রইল। সে বলতে চায় না, শুনতে চায়। পূর্ণিমা, বনমালা তার কাছে শুধু দুজন মেয়েই নয়, তার প্রচেষ্টার ফল, তার সাফল্য, তার সৃষ্টিও।

—ওরা যদি নিজেরা আসতে চায়, শুধু ওই মেয়েদুটিই...দেখো ভেবে। তবে জিনা...একটু হার মানতেও কিন্তু শিখতে হয় মা। আমাদের বেশি সামর্থ্য, বীরত্ব নেই। শহিদ হতে তো চাচ্ছি না। যা নেই তা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। তোমার পরিস্থিতিতে তুমি যতটা পেরেছ করেছ, এর পরে... দেখছই তো, তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই এসব ঠেকানোর। কোথায় এখানে কার কী স্বার্থ জড়িয়ে আছে ; বাইরে থেকে আমাদের বোঝবার উপায়ই নেই।

তখন জিনা তাঁকে পূর্ণিমার ব্যাপারটা পুরো বলল।

—এই মেয়েটিকে কি আমরা সাহায্য করতে পারি না?

তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণবাবু বললেন, ও, তাই সেদিন মেয়েটিকে কেমন কেমন দেখলাম! আমি চেষ্টা করব যথাসাধ্য। কথা দিচ্ছি। কিন্তু এবার তুমি আমায় কথা দাও ও জায়গায় তুমি আর যাবে না!

জিনা হতাশ হয়ে বলল—ক্লাসই যদি না নিই, শুধু শুধু আর যাব কেন!

জিনা এখন মনে করবার চেষ্টা করে বছর দুই আগে ঠিক কীভাবে সে সময় কাটাত। কেমন ছিল সে, কী ছিল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা? আশ্চর্য হয়ে সে বোঝে তার স্পষ্ট কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না কিন্তু। তার মা, কাকিমা, দিদিরা যেভাবে বেঁচেছেন, রান্না করে, খেতে দিয়ে, টি.ভি দেখে, আড্ডা মেরে, দল বেঁধে বেড়াতে গিয়ে সেটাই তার কাছে ছিল বাঁচার মডেল। কিন্তু ভাবেনি, এসব নিয়ে কখনও ভাবেনি। সুখী ছিল কি? হ্যাঁ, খুব হাসিখুশি ছিল। মনের মধ্যে দিয়ে সবসময়ে একটা ফুরফুরে বাতাস বইত। সেটা যে কোন সুখের সমুদ্র থেকে বইত, কেন যে আদৌ বইত অনেক ভেবেও সে স্থির করতে পারল না। কিন্তু গত দেড়-দু'বছর সে এত নিমজ্জিত ছিল কতকগুলো কাজে, কতকগুলো চিন্তায় যে কতটুকু আড্ডা দিয়েছে, নিখিল কতটা মেজাজ খারাপ করল বা বাড়ি ফিরতে কতটা দেরি করল এগুলো নিয়ে মোটে মাথাই ঘামায়নি। উপরন্তু তার আগে মনে হত সে একজন যে-কেউ। জেঠুর জিনপরি ঠিকই। কিন্তু সে-তো একটা অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের নাম ছাড়া কিছু নয়। অথচ এখন তার মনে হয় সে এক জন, এক বিশেষ জন, অনেকের মাঝখানে সে আলাদা, সে জিনা। অন্য কেউ নয়। এখন উদ্দেশ্য ছাড়া, কাজ ছাড়া বাঁচতে তার কেমন লাগবে? ঘরের দেয়ালে দেয়ালে তার চোখ ঘুরে যায়। অপরিচিত লাগে। এইসব দেয়ালের, দেয়ালে লম্বিত ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, ছবি এসবের যেন কোনও মানে নেই। তবে কি সে কাজটা সম্পূর্ণ নিজের জন্যেই করতে গিয়েছিল? নিজেরই জন্যে করছিল? পূর্ণিমা বা বনমালাদের জন্যে নয়?

আর একটু পরে তার মনে হল—নিজের ভাললাগার জন্যেই যদি তার কাউকে বাঁচাতে ভাল লাগে তো তাতেই বা দোষের কী আছে? সেভাবে দেখতে গেলে সব দায়বোধ সব ভালবাসাই তো স্বার্থপর! শিশুকে ভাল না লাগলে মা কি তাকে ভালবাসত! শিশু আর মায়ের চিন্তা মাথায় আসতেই তার বনমালার বাচ্চাটার কথা মনে হল। কুটুস। ছোট্ট পুঁচকে। এত মিষ্টি বাচ্চাটা যে বলার নয়। জিনার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে কুটুস। গোড়ায় গোড়ায় যখন সে রোববারে ওদের সঙ্গে বেড়াতে যেত, তখন থেকেই কুটুসের প্রতি তার একটু পক্ষপাতিত্ব জন্মেছে। সে কুটুসকে হাত ধরে বাঘের খাঁচার কাছে নিয়ে যাবে, সে কুটুসকে পাখি চেনাবে, সে কুটুসকে কোলে করে ঘরের মধ্যে শুয়ে-থাকা শজারু দেখাবে। ভারী সুন্দর একটা দুধে গন্ধ বেরোয় কুটুসের গা থেকে। অনেকবার চুপিচুপি কুটুসকে পিপারমিন্ট দিয়েছে জিনা। চুপিচুপি গল্প বলেছে। হঠাৎ তার চোখ চকচক করে ওঠে। সে ঋত্বিককে বলবে 'রোচনা'য় একটা কাজ দিতে। 'রোচনা'য় অবশ্য এখন সবচেয়ে দরকার সুপারিন্টেন্ডেন্টের। সুপারদের সারা দিনরাত থাকতে হয়। সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর কিছু? আর কিছু? যদি টাকা পয়সা না-ও দেয়, সে রাজি আছে, ওরা রাজি হলেই হয়। ওরা। ওদের সিসটেম!

—কী রে ঘুমিয়ে পড়লি? তোর ফোন।—মল্লিকা হ্যান্ড সেটটা জিনার হাতে দিল।

—কে?

—আমি মুকুট বলছি। কী হয়েছে রে মেসোমশাইয়ের?

—কেন, শুনিসনি? তোর লোকেরা বাবাকে মেরেছে!— জিনার গলা ঈষৎ রুক্ষ।

—আমার লোকেরা? —মুকুট অবাক হয়ে বলল—তোরা নাকি পুলিশে এফ. আই. আর. পর্যন্ত করিসনি!

—অত সব জানি না, আমার বর ছিল আর দিদিভাই। তখন বাবাকে সামলাবে না এফ. আই. আর. করবে?

—আশ্চর্য! তক্ষুনি করার তো দরকার ছিল না। কিন্তু পরেও তো করতে পারতিস!

মুকুট বলল, জিনা তোর জানা দরকার সোনাগাছির কোনও গুন্ডার ক্ষমতা নেই যে আমাদের প্রজেক্টের কাউকে মেরে পার পাবে। এদের তুষ্ট করবার জন্যে আমরা যথেষ্ট পয়সা খরচ করি, চাকরি দিই, পুলিশের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রোটেকশন দিই। কাল তুই একটা নাগাদ প্রস্তুত থাকিস। আমি তোকে নিয়ে ওখানে একবার যাব। একটা মিটিং ডেকেছি। ঋত্বিক, নমিতাদি সবাই থাকবে। প্রজেক্টের আরও অনেকে। সাক্ষী হিসেবে বনমালা থাকবে, কালই একটা হেস্তনেস্ত করব।

—বাবাকে যে কথা দিয়েছি আর ওখানে যাব না।

—ও। ঠিক আছে, সে আমি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নেব।

পরের দিন মুকুট আসতে কল্যাণবাবু অবশ্য অনুমতিটা দিলেন, কিন্তু সেটা শুধু সেইদিনের জন্য। ও অঞ্চলে জিনার কাজ করায় তিনি স্পষ্টই আপত্তি করলেন। বললেন, দেখো মুকুট, জিনা অ্যাডাল্ট, কোনও কাজের জন্যেই ওর অনুমতি লাগার কথা নয়। কিন্তু ওর নিরাপত্তার কথা তো আমাদের ভাবতেই হয়। তুমি ওকে আর ও কাজ করার অনুরোধ করো না। তা হলে আমি বিপদে পড়ে যাব।

—তা আমি করছি না মেসোমশাই। কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনি যতটা উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন তেমন কোনও কারণ নেই, সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি। তা ছাড়া এরকম একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় আমাদের তো কিছু স্টেপও নিতে হয়।

তখনই জিনা তার নিজের শর্তের কথা বলল, মুকুট আজ আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে, খালি একটা কথা দিতে হবে।

—কী কথা? সর্বনাশ! তুই আবার কথাটথা চাইছিস কেন?

—না, তেমন সর্বনাশের কিছু নেই। তোর জানা দরকার, তোদের না জানিয়েই পূর্ণিমাকে আমি 'রোচনা'য় আশ্রয় দিয়েছি। ওকে তোরা ভালভাবে বাঁচবার সুযোগ দিতে যা করতে হয় কর। মেয়েটা এখনও পর্যন্ত একরকম লুকিয়ে আছে।

—আচ্ছা সে হবে, এখন তো তুই চল।

পূর্ণিমার কেসটা মুকুট আগেই জানে। মুসোরি থেকে ফিরে এসেই খবরটা ওরা পেয়েছে। এই নিয়ে ঋত্বিক অত্যন্ত বিরক্ত। ঋত্বিক বলে মুকুট, আমার 'রোচনা'টা বাচ্চাদের হস্টেল, এক ধরনের সর্বোদয় কেন্দ্র। কিন্তু বাচ্চাদের। এটাকে যদি

তোরা উদ্ধারাশ্রম বানাতে চাস আমি কিন্তু আপত্তি করব। নষ্ট হয়ে যাবে আমার কাজটা। আজ একটা মেয়ে এসেছে, মেয়েটা সভ্য, ভদ্র আমি ওকে দেখেছি, ওর সম্পর্কে ভাল রিপোর্টই পেয়েছি। কিন্তু ওই পথ ধরে কালকে আরও মেয়ে আসতে শুরু করলে আমি কী করব? মেয়েগুলো আসবে, তাদের পেছনে পেছনে দালালফালাল, বাড়িওয়ালি মাসিফাসি আসতে থাকবে...আর জিনারই বা আক্কেল কী? উদ্ধার করতে চায় সে নিজে করুক, আমার ঘাড়ে বন্দুক রাখাটা আমি মোটেই পছন্দ করছি না।

মুকুট ওকে অনেক করে বোঝায়—জিনার পক্ষে স্বামীকে না বলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। পূর্ণিমার পরিচয়ের কোনও মেয়েকে পরিবারের মধ্যে রাখাও অনেক ঝুঁকি। কিন্তু ঋত্বিকের সেই একই গোঁ। এভাবে সে তার 'রোচনা'র নিয়মকানুন নিয়ে ছেলেখেলা করতে দেবে না। পৃথিবীতে দুঃস্থ, দুঃখী, অত্যাচারিত, উদ্ধার প্রার্থী কোটি কোটি মানুষ আছে, তাদের সকলের দুর্দশা দূর করার সামর্থ্য ঋত্বিকের নেই। সে একটা বিশেষ শাখা বেছে নিয়েছে। ওভাবে এলোমেলোভাবে এগোনো যায় না।

ঋত্বিক যা বলছে তারও যুক্তি আছে। ঠিকই। আবার পূর্ণিমার কেসটাও অত্যন্ত জরুরি। জিনার যুক্তি, উপরন্তু আবেগও মানবিক। মুকুট কোনদিকে যাবে? অদ্ভুত সংকট। করছে সমাজসেবা, অথচ সমাজ যখন একটি অত্যাচারিত মুক্তিকামী মেয়ের বেশে তার দ্বারস্থ তখন তাকে ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবতে হচ্ছে সমাজসেবারই স্বার্থে।

মুকুট নমিতাদি তিন-চারজন ডাক্তার এবং আরও বেশ কয়েকজন অচেনা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের বান্ধব সমিতির ঘরে মজুত দেখল জিনা। এঁরা সকলেই মুকুটদের সংস্থার। ডাক্তাররা সবাই বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করেন এদের। রাস্তার মোড়ে, পাশে জায়গা খালি রেখে একটা ছোট অনাড়ম্বর মঞ্চ তৈরি হয়েছে। একজন গম্ভীর দেখতে তরুণ ডাক্তার প্রথম মাইক্রোফোন হাতে নিলেন।

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। এই পাড়ার মধ্যে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বয়স্ক ভদ্রলোকের মাথায় লাঠির আঘাত পড়েছে। এর দায়িত্ব গোটা পাড়ার। তাঁদের যেটুকু রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে তা ব্যবহার করে তাঁরা সারা পাড়া রেইড করাতে পারেন ইচ্ছে করলে—এই তাঁর প্রথম ধমক। দ্বিতীয় ধমক হল, তাঁরা এই গোটা পল্লির স্বাস্থ্যের জিম্মাদারি নিয়েছেন। গত তিন বছর ধরে এই পাড়ায় বুড়ো, নারী, পুরুষ এমন কেউ নেই যে এই চিকিৎসার সুফল পায়নি। গোটাটাই প্রায় দাতব্য। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে যা-কিছু ঝামেলা তাঁদের সংস্থাই পোয়ায়। দ্বিতীয়ত, তাঁরা কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে এলাকার মেয়েরা এখন অনেক সচ্ছল। শুধু মেয়েরা নয়, মাসি-শ্রেণীর মহিলারাও। তাদের একটা ভবিষ্যনিধির মতো ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত সুযোগ সম্পূর্ণ বিনা চেষ্টায় বিনা খরচে পাচ্ছে তারা। উপরন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের

লেখাপড়া শিখে মেয়েরা নিজেদের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেয়েছে। —এই সুযোগগুলো সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হবে পত্রপাঠ, যদি তারা এই হামলার প্রতিকার করতে না পারে, এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে ষোলোআনা প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে।

নমিতাদি উঠে বললেন—আমি খুব ভাল করে জানি এখানে কোন কোন স্বার্থচক্র কাজ করছে। কেন করছে। হয়তো একজনকে আমি শনাক্ত করতে পারব না, কিন্তু কারা কাজটা করে থাকতে পারে—আমি জানি। তাদের কীভাবে টিট করতে হয় তা-ও আমার জানা আছে। আমি এখুনি একটি তালিকা পড়ছি। তাদের ওপরই আমার সন্দেহ। সারা পল্লিকে আমি অনুরোধ করছি এদের বয়কট করতে। মানদা মাসি, কেনারাম আচার্য, রবি গুছাইত। এই তিনটি নাম এখুনি করতে পারি। সামনের শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অমনি একটা রই রই রব উঠল,—কী প্রমাণ, এরা কেউ কাজটা করেছে, কোন অধিকারে তিনি পাড়ার মধ্যে বিভেদ ঘটাতে চাইছেন। মানদা মাসি ও কেনা মস্তান কোমর বেঁধে সামনে এগিয়ে আসছিল। ডক্টর সাহা নামে এক ভদ্রলোক তখন বললেন—কল্যাণ সরকারকে কে মেরেছে আমরা ঠিকঠাক না জানলেও পূর্ণিমা দাসীকে কারা মেরেছে, কারা পাচার করেছে তা আমরা জানি। নারী-পাচার চক্রের পাণ্ডা হিসেবে মানদা ও কেনারামের বিরুদ্ধে থানায় এফ. আই. আর. করে এসেছি আমরা। হাতে প্রমাণ মজুত।

প্রচণ্ড একটা হট্টগোল শুরু হল এবার। কেউ বলছে হ্যাঁ, কেউ বলছে না। দু-চারটি বয়স্কা মহিলা অকথ্য গালাগালের স্রোত বইয়ে দিল। কিন্তু তারই মধ্যে বনমালা চেঁচিয়ে আঙুল তুলে তুলে সাক্ষ্য দিল সে কেনারাম, মানদা ও রবিকে পূর্ণিমার ওপর অত্যাচার করতে দেখেছে। সে গিয়ে না থামালে মেয়েটা মরেই যেত। পূর্ণিমার বয়সি অনেকগুলি মেয়ে তখন ক্যাচরম্যাচর করে বনমালাকে সমর্থন করল বটে, কিন্তু গজগজ করতেও ছাড়ল না।

বনোদিদির আর কী! ঘরে বাঁধা বাবু রয়েছে। আমাদের ওপর এরপর হামলা শুরু হবে। তখন যে কী করব?

তিন-চার শ্রেণীর স্ত্রীলোকের অশ্রাব্য গালিগালাজ আর মস্তানদের চেঁচামেচি মুখখিস্তির মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে থামল। মুহূর্তে ফরসা হয়ে যেতে লাগল গলিপথ। টপাটপ কয়েকজনকে গাড়িতে তুলে নিল পুলিশ। মানদা মাসি, কেনারাম উভয়েই উঠে গেল পুলিশের গাড়িতে।

সব ফাঁকা হয়ে গেলে ডক্টর সাহা বললেন, মুকুট এখুনি কিন্তু আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। সত্যিই মেয়েগুলোর ওপর হামলা হতে পারে। আমরা বরং ক্লাবঘরে একটু বসি।

বনমালা বলল, সেই ভাল। দিদিরা আপনারাও তা হলে আমার ঘরে একটু এসে বসুন না! যা ঝামেলা গেল!

নমিতাদি বললেন, সেই ভাল, চলো, এখানে তো আর জায়গাও নেই। ডক্টর সাহা আপনি ওই রবি গুন্ডাকে ডেকে বেশ করে একটু সমঝে দিন। কী মনে করেছে কী?

উঁচু উঁচু সিঁড়ির কোণে কোণে ছত্রিশ দেবতার টালি। তা সত্ত্বেও আশেপাশে পানের পিক। তা সে তো বড় বড় অফিসবাড়িতেও দেখা যায়, আবাসনের ফ্ল্যাটে পর্যন্ত দেখা যায়! সঙ্গে মুকুট এবং নমিতাদি, তার ওপরে সকাল থেকে কুৎসিত ভাষা, অঙ্গভঙ্গি, পুলিশ, সব মিলিয়ে জিনার মানসিক অবস্থা এমন বিভ্রান্ত ছিল যে খেয়াল ছিল না সে কোথায় যাচ্ছে। বনমালা যখন তালা খুলতে ব্যস্ত হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়ালে এল তার। তাকিয়ে দেখল—সরু প্যাসেজের ধারে ধারে ঘর। টানা বারান্দার ওধারে উঠোন, বারান্দার গোঁজের ভেতর পায়রা বকবক করছে, তার কেমন গা ঘিনঘিন করে উঠল। সে একজন বারবনিতার ঘরে যাচ্ছে। এইসব ঘর অবৈধ, বিকৃত, দাম-দিয়ে কেনা যৌনক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট। তার মনে হল—দরজা খুললেই সে কোনও কুৎসিত দৃশ্য দেখতে পাবে।

বনমালা বলল, মুকুটদিদি এসেছে আগে, নমিতাদিও বোধহয় একবার, না নমিতাদি? আপনি কিন্তু একবারও আসেননি দিদি। তার মুখে খুশির বিগলিত হাসি। চোখে মুগ্ধতা। জিনাদিদি তাদের হিরোইন।

দুটো ঘর। প্রথমটা বসার। সোফা-কোচ দিয়ে দিব্যি সাজানো। মাঝখানে আবার একটা কার্পেট। ভারী পরদা ঝুলছে দরজায়। জানলায় ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড। বনমালা বেশ গর্বের সঙ্গে এ. সি. চালিয়ে দিল। তারপর ফ্রিজ থেকে ঠান্ডার বোতল বার করল। ফ্রিজ ভর্তি হুইস্কি, রাম, বিয়ারের বড় বড় বোতল। পরিষ্কার সাদা গ্লাসে তিনজনকে ঠান্ডা পরিবেশন করল বনমালা, নিজেও একটা গ্লাস তুলে নিল। দু চুমুক খেয়েছে কি না খেয়েছে বাইরের দরজা ঠাস করে খুলে ঘরে ঢুকলেন এক উত্তর-চল্লিশ সুপুরুষ ভদ্রলোক। পরনে গ্রে স্যুট।

—কী রে বনো, হঠাৎ আপিসে তলব? তোকে নাকি কারা থ্রেট্‌ন্ করছে?

কেমন একটা মস্তানি ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক। যা তাঁর পোশাক, চেহারা কিছুর সঙ্গেই যাচ্ছিল না। যেন আমের খোসার ভেতর থেকে চালতা বেরিয়ে এসেছে।

ঘরের চৌকাঠ পেরিয়েই গোঁত্তা খেয়ে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। সামনে সারি সারি তিন মহিলা। একজনের হাত থেকে গেলাস পড়ে চুরমার হয়ে গেছে, কার্পেট খাচ্ছে এখন ঠান্ডা পানীয়। অন্য আর একজন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে, হাতে গ্লাস, মুখ হাঁ। বুনো ষাঁড়ের মতো একটা ঝটকা দিয়ে পেছনে ফিরল লোকটি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাবার একটা ঝড়ো শব্দ হল।

বনমালা বলল—কী হল? ফটিকবাবুকে দেখে আপনারা অমন ভয় পেলেন কেন? এমনিতে উনি তো খুব ভাল লোক!

জিনা মূর্তির মতো বসেছিল। আপাদমস্তক শক্ত, খাড়া, সাদা। ভারী অথচ পলকা। যেন এক ঘা মারলেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।

—জিনা-আ—মুকুট ডাকল একটু পরে, এই জিনা! সে তাকে হাত দিয়ে সামান্য একটু ছুঁল। জিনা হঠাৎ কৌচের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। বনমালা না ধরলে একেবারে তালগোল পাকিয়ে পড়ত।

কোনওক্রমে কৌচের ওপর তাকে লম্বা করে শুইয়ে বনমালা ব্যস্ত হয়ে

বলল—ডাক্তার ডাকব মুকুটদিদি? জিনাদিদির কি ফিটের ব্যারাম আছে নাকি গো?

—তুমি একটু ঠান্ডা জল আনো।

জলের বোতল বার করতে করতে বনমালা বলল, ফটিকবাবুই বা অত ঘাবড়ালেন কেন?

নমিতাদি আস্তে বললেন, সত্যিই! মালটি পালাল কেন? অফিসার লোক। মান গেল নাকি?

বলবে কি বলবে না মুকুট? কিন্তু এ তো চাপা থাকবার নয়, তাই মুকুট চাপা গলায় বলল, নমিতাদি, উনি জিনার স্বামী। নিখিল দে সরকার। নমিতাদি মুখটা হাঁ করেছিলেন কিছু বলবেন বলে, সেই অবস্থাতেই থেকে গেলেন।

বনমালা জলের বোতলটা ধুপ করে নামিয়ে বলল, কী বললে মুকুটদিদি? কী বললে?

—তোমার বাবুটি জিনাদিদির বিবাহিত স্বামী—শুনলে তো। মুকুটের গলার স্বর রুক্ষ।

—কী বলছ? এ হতে পারে না দিদি, তোমাদের ভুল হচ্ছে, উনি ফটিকবাবু। জে. সি.টি-তে মস্ত কাজ করেন।

—হ্যাঁ, তা করেন বোধহয়।

—উনি...উনি যে বলতেন...আধপাগল বউ... দেখতে কুচ্ছিত, ওঁকে খুশি করতে পারে না...ও মা! বলতে বলতে বনমালার মুখ ভেঙেচুরে যাচ্ছিল।

—চুপ করো বনমালা, প্লিজ চুপ করো, যে কোনও মুহূর্তে ওর জ্ঞান ফিরবে।

—কেন চুপ করব মুকুটদিদি? কেন? তোমরা অন্তত শোনো, আমি জেনেশুনে জিনাদিদির সব্বোনাশ করিনি গো! আমার জানতে ইচ্ছে হত বিয়ে-থা হয়েছে, বড়লোকের ছেলে, বড় কাজ করে সে কেন আমার মতো...বললে বিশ্বাস করবে না দিদি আধপাগল বউ সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরলে কী খোয়ার করে সেসব প্রতিদিন আমায় শোনাত! বিছানায় নিতে পারে না বউকে... সে এমন। নানা পাড়ায় ঘুরে তবে আমাকে পছন্দ হয়ে যায়। বলত, সম্পত্তি সব বউয়ের নামে। খান্ডারনি বউ...। ডিভোর্স দিতে পারছে না সেই নিয়ে কত কেচ্ছা... পাগল বউটাকে পার করতে পারলেই আমায় নিয়ে থাকবে...ওমা! কী সব্বনাশের কথা! ও জিনাদিদি গো..। আমায় দোষী ঠাউরো না গো...

—তুমি চুপ করবে বনমালা? এবার কিন্তু তোমায় একটা চড় মারতে হবে আমাকে—

—আমার কী দোষ? আমাকে কেন এতদিন পরে 'তুমি' করে বলছ মুকুটদিদি? আমি থাকতুম ঠিক গেরস্তর মাগের মতো গো! আজ ছ বছর অন্য লোক করিনি। জিনাদিদি যে আমাদের সরস্বতী ঠাকুর! হায়! হায়! মারো, মারো, তোমরা আমাকে খুব করে মারো গো—হাঁউমাউ করে কাঁদতে লাগল বনমালা।

জিনা আস্তে আস্তে চোখ মেলল। সামান্য একটু ঠোঁট ফাঁক করে বলল, একটা ট্যাকসি।

ছুটে বনমালা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জিনার সারা শরীরে বিনবিন করে ঠান্ডা ঘাম। চোখের সামনে হলুদ কালো ফুটকি ফুটকি ফুটকি। অনেক দূর থেকে কার কণ্ঠ ভেসে আসছে... কোন উন্মাদিনীর... আধপাগল বউ... ভীষণ কুচ্ছিত... বিছানায় নিতে পারে না... চুপ করবে বনমালা? চুপ করবে? চুপ করো, চুপ করো, চুপ...চুপ...

ঘোরটা কাটবার পরও সে চোখ খুলতে পারেনি। চিরকালের জন্যে যদি চোখ বুজে থাকা যেত!

প্রচণ্ড শকে মানুষের যেটা হয়, জিনার সেটা হল, সেটা আত্মপরিচয়লোপ। পাগলের মতো নয়। ঠিক তার আগেকার বিভ্রান্ত অবস্থা। হাত-পাগুলোর দিকে সে অপাঙ্গে তাকিয়ে থাকে, এ কার হাত? কার পা? এগুলো তো সে চেনে না। সে কি একটা স্বপ্নের মধ্যে বাস করছে? এই যে মানুষটার ছায়া পড়ে রোজ আয়নায়, লাল ব্লাউজ কালো তাঁত, নীল ব্লাউজ সবুজ ছাপ। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ঘাড়ে পিঠে কাঁধের পাশে, চোখের তলায় কালি, নাকটা জেগে আছে,—এই মানুষটা কে? একে যেন কত জন্ম আগে কোন আলাদা গ্রহে চিনত সে—এ কোথা থেকে এল? 'জিনা জিনা' বলে কাকে ডাকছে ওই লক্ষ্মীশ্রী মুখ! ও-ই বা কে?

—হ্যালো...ও মাসিমা? হ্যাঁ আমি মল্লিকা বলছি। জিনা? জিনা তো বাথরুমে। বেরোতে একটু দেরি আছে। কিছু বলব মাসিমা?

—না, খোঁজ নিচ্ছিলাম। ভাল তো সব?

ভাল নয়। কিন্তু ভাল-ই বলতে হয়।—হ্যাঁ সবাই ভাল। হ্যাঁ বাবা একটা লাঠি নিয়ে; 'হ্যাঁ তেপায়া মতো লাঠি...। হিল দিয়েছে একটা। একটু তো দেরি হবেই।

ভারী নিশ্চিন্তে আছে দমদম।

—জিনা একটু খেয়ে নে...

—চিবোতে পারছি না...অবশেষে সে বলে।

মল্লিকা তরল খাবার আনে। খেয়ে নেয় জিনা। কল্যাণবাবুর পরামর্শে ওষুধ দেয় মল্লিকা, জিনা চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে।

তৃতীয় দিনও নিখিল বাড়ি এল না। বিমান বলল, এবার তো একটা খোঁজ নিতে হয়। অফিসে খোঁজ নেব?

কল্যাণবাবু বললেন, তোমার দরকার থাকে নাও, আমার দরকার নেই।

ডাক্তার এনেছে মুকুট, সঙ্গে ঋত্বিক। পরীক্ষা করলেন। কঠিন খাবার গিলতে পারছে না জিনা। সব শুনেছেন ডাক্তার। ইশারায় সবাইকে সরে যেতে বললেন। তারপর সামনে বসে বললেন, আমার দিকে তাকান তো দেখি একবার। হ্যাঁ, দেখি! চোখের মণির মধ্যে আলো ফেলে কী দেখলেন তিনিই জানেন, বললেন, কিছু মনে করবেন না মিসেস সরকার, কার জন্যে জীবনপাত করছেন! এরা কি আপনার মন খারাপের যোগ্য? খুব বেঁচে গেছেন এ লোকের সন্তানের জন্ম আপনাকে দিতে হয়নি। লোকটাকে ঝেড়ে ফেলে দিন মন থেকে, মনখারাপও ঝরে পড়ে যাবে। নতুন করে জীবন শুরু করুন। এত সুন্দর স্বাস্থ্য, এত সুন্দর একটা জীবন আপনার...

শ্লেষে জিনার ঠোঁট বেঁকে গেল। উনি বললেন, আরে নতুন করে জীবন শুরু করা সহজ নয় আমি কি জানি না? কিন্তু কতটুকু বয়স আপনার? উঠুন, খাওয়া দাওয়া করুন, জীবন আপনিই শুরু হয়ে যাবে।

খুব শকে মানুষের যেটা প্রথম হয় সেটা হল আত্মপরিচয় লোপ। কিন্তু তারপর যেটা হয় সেটা হল নতুন একটা আত্মপরিচয় লাভ। আস্তে আস্তে তার মনে হতে

লাগল সে যা-যা জানত তার সবই ভুল। নিজেকে সে যা ভেবেছিল তা-ও ভুল, তা হলে সে কে? একদিন উঠে সে চান করতে গেল নিজে নিজেই। খুব ভাল করে আয়নায় দেখতে লাগল নিজের মুখ। যদি কোথাও কোনও অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। ওই প্রতিচ্ছবিরই ভুরুতে, কানের লতিতে, চিবুকের ভাঁজে, সেই আসল জিনাকে খুঁজতে থাকে সে অনেক অনেক ক্ষণ ধরে।

মল্লিকা একদিন দেখল তার প্রিয় সাদা সালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে এসেছে জিনা। ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ার থেকে কী একটা স্প্রে বার করে সারা শরীরে সুগন্ধ ছড়াল। চুলগুলো পুরো ভেজায়নি। পেছনে একটা চিমটে মতো ক্লিপ দিয়ে আটকে রেখেছে। আলমারি থেকে এক থাক শাড়ি-পোশাক বার করল, ড্রেসিং টেব্‌ল থেকে প্রসাধনের জিনিস, ড্রয়ার থেকে সম্ভবত তার নিজের উপার্জনের টাকা, সব একটা সুটকেসে ভরতে লাগল।

মল্লিকা ভয়ে ভয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস, জিনা?

—কদিন থাকতে দেবে?—

—সে কী? থাকতে দেব মানে?

—ঝুম্পাদের ঘরে, জায়গা হবে?

—কেন হবে না? আয়।

সে বলল, আমি এখন একটু বেরোব। কিছু খেতে দেবে?

—আমার সব রান্না হয়ে গেছে। তুই আয় না!

খেতে বসে খাপছাড়াভাবে জিনা বলে উঠল, তোমরা আমার কাছ থেকে কী আশা কর? এখন?

—তুই কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবি?

—'দের'টা কে?

—কেন আমি, আমার মেয়েরা, বাবা...

—জানি না। সময়ের নিয়মে সব ক্ষীণ হয়ে যায় তো যাবে। গেলে কিছু করার থাকবে না।

—এখন কোথায় যাচ্ছিস?

—ঠিক করিনি। আমায় একটু ভাবতে হবে। এখানে ভাবতে পারছি না।

—আমি সঙ্গে যাই না!

—পাতাল রেলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, ভাবছ! ওসব করছি না।

এইসময়ে সিঁড়ির মাথায় কল্যাণবাবুর স্বর শোনা গেল। লাঠি ঠুকে ঠুকে তিনি মাঝের দরজা দিয়ে এদিকে চলে এসেছেন জিনার খোঁজে।

—জিনা কি খাচ্ছে? বউমা?

—হ্যাঁ বাবা, বেরোবে।

—আচ্ছা, বেরোবার আগে ওকে একবার একটু ওপরে আসতে বলো।

জিনা বিরক্ত গলায় বলল, কী বলবার আছে আর এ-বাড়ির কারুর? আমাকে?

খাওয়া শেষ করে সে অনিচ্ছুক কঠিন মুখে ওপরে উঠে গেল।

বাইরে খুব উজ্জ্বল রোদ উঠেছে আজ। এখনও গায়ে বিঁধছে না ঠিক। কিন্তু শিগরিরই প্রবল হয়ে উঠবে জানান দিচ্ছে। শীতশেষের রোদের এই আসন্ন প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা এসব সাপেদের, ভালুকদের, আরও নানা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের ঘুম ভাঙাচ্ছে। প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে অনাগত প্রাণহীন শরীরে। ভেতরে কেমন একটা অজানা অচেনা স্পন্দন। পাতাল রেলের কামরায় বসে বসে জিনা নিজেকে বলতে লাগল—জীবনের প্রথম ত্রিশটা বছর আমার কেটে গেল শীতঘুমে। বেঁচে ছিলাম অথচ চেতনা ছিল না। ওইরকম নিশ্চৈতন্য সুখের ভাতঘুম আমাকে বছরের পর বছর শিখিয়েছিল আমার পরিবার। কেউ একবারও ভাবেনি, চাকরি ছাড়াও মানুষের কাজ থাকে, প্রজনন ও সন্তানপালন ছাড়াও ভিন্নতর দায় থাকে। ভাবেনি বলেই কি নাগচৌধুরী পরিবারের ক্যাপসুলে-মানুষ মেয়ের জীবনে মহাজাগতিক অন্ধকার নেমে আসে? সে অন্ধকার কেমন করে পার হতে হয় পরিবার তো তাকে শেখাতে পারবে না! কী লজ্জা! উঃ জিনার বিয়েটা এমন দাঁড়াল! ছিঃ জামাই এরকম! কী দুর্দৈব! কারুর বেলা হয় না তো এমন! জিনাটারই ভাগ্য খারাপ! আস্তে আস্তে আদরে ময়লা ধরবে, পেতলে-ভরনে কলঙ্ক পড়ার মতো। তারপর জিনাকে নিয়ে বিব্রত হতে থাকবে সবাই। কত সহজে জেঠু এক একটা মেয়ের বিয়ে স্থির করেন! একটা মেয়েকে একটা লোকের সঙ্গে জুড়ে দিলেই হল। গাঁটছড়া একটা। ভাল চাকরি করে? বাড়ি আছে? পরিবারে সব বেঁচে-বর্তে আছেন তো? পড়শিরা কী বলছেন? নাঃ কোনও বদখেয়াল নেই। দাম্পত্য জীবনের যেসব তালিকা তাদের মেয়েমহলে আলোচিত হত, তার মধ্যে শাশুড়ি-ননদ প্রবলভাবে ছিল। কিন্তু বেশ্যা? কখনও শোনেনি। কারও সঙ্গে কারও বনল না, প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য কারণে। বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কেউ বা অপরকে ভালবাসল, বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এমনটা আকছার শোনা যাচ্ছে আজকাল। যদিও তাদের পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে এমন জিনিস ঘটেনি। কিন্তু তাকে বলতে হবে তার বিবাহিত স্বামী বিবাহের প্রথম দিনটি থেকেই তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, আর সে এতই বোকা যে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তার স্বামী বেশ্যাসক্ত। সেই জিনার স্বামী, যে জিনা সম্পর্কে পাঁচজনের ধারণা এ মেয়েকে নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না, কারণ এর ভেতরে অফুরন্ত আনন্দের উৎস আছে, মানিয়ে নিতে তার জুড়ি নেই, রূপ-গুণ সবই দেখবার মতো। সারারাত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে উলটেপালটে সম্ভোগ করে, লোকটা আবার সন্ধেবেলায় চলে যেত ওই নোংরা গলির পানের পিক লাগা সিঁড়ি বেয়ে, নোংরা ভাষা গন্ধ স্পর্শের মধ্য দিয়ে একটি অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মেয়ের কাছে যে নাকি ন' বছর বয়স থেকে দেহ-বিক্রি করছে? কী অপমান! কী ভীষণ ঘেন্না! নিজের শরীরটাকেই তার নোংরা কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

দিন দুয়েক এরকম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল সে। পাতাল রেলের টিকিট কাটে অফিস-টাইমটার পরে। এ-মুড়ো ও-মুড়ো বার বার যায় আসে, যায় আসে। ইচ্ছে হলে কামরা বদল করে, নয়তো এক জায়গাতেই বসে থাকে অনড়। এইভাবেই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে। পাতাল থেকে উঠে আসে একদিন। সারা

দিন নানান কাজে ঘোরাঘুরি করে। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় ডাকে কোনও কোনও দরকারি মানুষকে। চলেও যায় কারও কারও প্রাইভেট চেম্বারে, পরামর্শ নেয়।

এইজন্যেই মুকুটদের সঙ্গে মেলামেশায় বড্ড আপত্তি ছিল লোকটার। যদি জেনে ফেলে? এইজন্যেই মুকুটকে, ঋত্বিককে এত গালাগাল! ভাবতেও পারেনি ওর অগোচরে ইতিমধ্যেই জিনা পৌঁছে গেছে পাপের অন্দরমহলে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে। কিচ্ছু জানত না। জিনা কখনও ঘরের ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে পারে? অমন সিল্কের পরদা দেওয়া রুপোলি খাঁচার ঘেরাটোপ! বয়স্ক-শিক্ষা! শখ হয়েছে দুদিন শখ করে হয়তো বস্তিটস্তিতে যাবে। যেমন তার খ্যাপা বাবা গিয়ে থাকেন। তারপর আর ভাল লাগবে না। ফিরে এসে নিজের ছেলেভোলানো খেলাঘর নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকবে। বাজার করবে, রান্না করবে ভাল ভাল, পার্টি জমাবে, সারা সন্ধে টিভি দেখবে, আড্ডা মারবে, আর সারা রাত্তির তাকে 'খুশি' করতে পারবে না!

সন্ধের বেশ পরে জিনা ডাফ স্ট্রিটের বাড়িতে ফিরে এল। মল্লিকা জানলায় ছিল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ঝুম্পা কফি নিয়ে এল। মাম্পি—তিনটে প্লেটে তিনটে ধোসা। মল্লিকাকে দেখা যাচ্ছে না। সে আড়াল থেকে এইসব উদাসীনতা-ভেদী তির পাঠাচ্ছে। স্নেহ কাড়া মুখের মাম্পি। নিষ্পাপ, সদ্য কৈশোরের অকলঙ্ক সৌরভ তার গায়ে। ঝুম্পা, যে বুদ্ধি আর বৌদ্ধিক জগতের আকর্ষণে একদম আলাদা, সম্পর্কের জটিলতা, মানবীয় সমাজ-সংসারের পাপের দিকে যার দৃষ্টি এখনও পড়েইনি। শুধু এই সঙ্গটুকুই জিনাকে ভোলাবে, ভোলাতে পারবে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও সে সহজ হবে।

কফি আর ধোসা শেষ করে জিনা ঝুপ করে শুয়ে পড়ল মাম্পির বিছানায়। তার হাতে মাম্পির একটা টেক্সট বুক, ইকোলজির চ্যাপ্টারটা উলটেপালটে খুলে আলগা চোখে আলগা মনে পড়ছে, বলল, রাত্তিরে আর খেতে পারব না। ঘুমিয়ে পড়লে ডাকিসনি। তোরা যতক্ষণ খুশি আলো জ্বেলে পড়। খালি বেশি চেঁচাসনি।

বাইরে সাদা মাতিজ এসে থামল। একটা হর্ন দেয়, তারপর ঘষ্‌ষ্‌ করে একটা আওয়াজ তুলে গ্যারাজে ঢুকতে থাকে গাড়িটা। শুধু জিনা নয়, বাড়িসুদ্ধু সবারই মুখস্থ এই শব্দ পরম্পরা। মাম্পি ঝুম্পার দিকে তাকাল। ঝুম্পা বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। লজ্জাশৌচ শেষ হল নিখিলবাবুর।

রাত দশটা নাগাদ থালা-বাটিতে নিখিলের খাবার সাজিয়ে মল্লিকা এ ঘরে এল। নিচু গলায় বলল, দিয়ে আয়।

ঝুম্পা বলল, আমি না। মাম্পি তুই যা।

কী আর করা। মাম্পি থালাটা নিয়ে চলে গেল। ঠিক কী হয়েছে ওরা জানে না। এ বাড়িতে ছোটরা ছোটদের মতোই থাকে। কেননা এটা ছোট্ট ফ্ল্যাটের সংসার নয়। ছোটদের আর বড়দের মাঝখানে আড়াল রাখার জায়গা এখানে অনেক। ঝুম্পার উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত টিভি থাকত শুধু কল্যাণবাবুর ঘরে। ঝুম্পা অনুমান করেছে ব্যাপারটা নারীঘটিত। মাম্পি শুধু বোঝে সাঙ্ঘাতিক কোনও মনোমালিন্য

হয়েছে দুজনের মধ্যে। দু-একবার দিদিকে বা মাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ধমক খেয়েছে শুধু।

—কে পাঠাল? খাবার দেখে কাকা জিজ্ঞেস করল।

—মা।

—কাকিমা কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে।

যাক, তবে সব ঠিক আছে।

দিন তিনেক সময়মতো খাবারদাবারের সরবরাহ পাবার পর নিখিল সন্ধেরাত্তিরে মাঝের দরজা খুলে দাঁড়াল। এখন সে সকাল সকাল বাড়ি ফিরছে।

—জিনা! জিনা কি এখানে আছে?

কেউ উত্তর দিল না।

পঞ্চম দিনে সে সোজা বাবার ঘরে চলে গেল।

—বাবা?

চোখ তুলে তাকালেন কল্যাণবাবু।

—আপনি ওকে একবার ডেকে পাঠান। আমার কতকগুলো কথা বলবার আছে।

—আমি ডাকলেই সে আসবে কেন? —বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

—আমার সিরিয়াস কিছু কথা আছে। বাবা আপনি একবার...

হাতের কাছে বেলটা একবার বাজালেন কল্যাণবাবু।

ডলি এসে দাঁড়াল। তিনি বললেন, জিনাকে একবার ডেকে দাও তো! জিনা বউদি, ছোট বউদি এসব সম্পর্কবাচক শব্দ আর তিনি ব্যবহার করছেন না।

একটু পরে জিনা এসে ঢুকল। এই কদিনে সে এতটাই বদলে গেছে যে চমকে যেতে হয়। বেশ কয়েক কে.জি. ওজন কমে গেছে। গায়ের রং রোদ-পোড়া। কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্তন তার চোখ এবং ঠোঁটের চেহারায়। এইগুলো সব সময়ে হাসত। এখন কঠিন ভাবহীনতা সেখানে। নিখিলকে দেখেই সে চলে যাচ্ছিল।

কয়েক পা এগিয়ে নিখিল তার পথ আটকাল। চাপা গলায় বলল, আমায় মাফ করো জিনা। এই দেখো আমি নাক-কান মলছি। এ একটা বিশ্রী অভ্যেস। বাজে। তুমি প্লিজ আমায়... আর কখনও এমন হবে না। আমি তোমাকে ভালবাসি। বাবা...ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি অনুতপ্ত, আমার ভুল হয়ে গেছে।

জিনার দেয়ালে পিঠ। সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রয়েছে।

—একটা বাজে অভ্যেস। স্বীকার করছি জিনা। এর জন্যে তুমি আমায় যে শাস্তি দাও যা করতে বলো—ক'মাস পরেই আমরা ইয়োরোপে ঘুরতে যাব।

তুমি প্যারিস দেখতে চেয়েছিলে! সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার, একবারটির মতো...।

—আপনি বনমালা রাহাকে শাস্ত্রমতে হোক, রেজিস্ট্রি করে হোক বিয়ে করুন।

—কী-ই? —চিরে গেল নিখিলের রুষ্ট কণ্ঠস্বর।

—বেশ্যাকে বিয়ে? বাজারের বেশ্যাকে? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার?

—করতে আপনাকে হবেই। আপত্তি করলে শুনব না। আমি এক্ষুনি ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু শর্ত বনমালা রাহাকে বিয়ে করে স্বীকার করতে হবে, সে আপনার স্ত্রী। তার ছেলে আপনার ছেলে।

—কে কার ছেলে? মুখ ভেংচিয়ে উঠল নিখিল, ওই বেশ্যা মাগিটার ছেলে আমার?

—না হলেও ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে হত। কিন্তু ও আপনার, সেটা আপনিও জানেন।

—সোনাগাছির বেবুশ্যে একটা! থুঃ! লাথি মারি আমি অমন বিয়ের মুখে।

কল্যাণবাবু বললেন, এ ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে যাও।

পায়ের কাছে একটা মোড়ায় লাথি মেরে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল নিখিল।

জিনা নীরস গলায় বলল, আমি ওর অফিসে সব খোঁজ নিয়েছি। পুরো ঘটনা জানিয়ে দিয়েছি। ওর বস, কোম্পানি ওর ওপর সন্তুষ্ট নয়। উনি ডিসিশন নিচ্ছেন শিগগির ওকে ভি.আর.এস. নিতে বলবেন। বেশি পাওনা ওর হবে না, যা শুনলাম জলের মতো দেনা করেছে। আমার ওপর নির্ভর করছে ওর চাকরি। ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দেবেন ব্যাপারটা। সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এইবার কল্যাণবাবু পুরোপুরি বুঝতে পারলেন জিনাকে। সে একই সঙ্গে শাস্তি এবং সুবিচার দুটোই দিতে চাইছে। তেমন করে হয়তো সে জানে না কিন্তু জিনা নিজেই একটা নতুন সামাজিক শক্তি। একা সে দাঁড়িয়েছে একটা দীর্ঘদিন চলে-আসা পাপাচরণের বিরুদ্ধে। তার সংস্থা নেই, প্রতিষ্ঠান নেই, ট্রেনিং নেই, অভিজ্ঞতা নেই, আছে খালি প্রবল ন্যায়বোধ আর ইচ্ছাশক্তি। এবং পৌরুষ, যদি এই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিকে পৌরুষ বলা যায়। জিনা একা। আজ হয়তো একা। কিন্তু সে একা যে প্রশ্ন তুলেছে অচিরে সেই প্রশ্ন যুগ-মানসে অনন্য দৃঢ়তায় খাড়া হয়ে যাবে। এভাবেই সব বিপ্লবের শুরু হয়। জনমানসে নয়, ব্যক্তিমানসে।

যুগের পর যুগ অসহায় নারীকে বহুভোগ্যা করেছে বহুলোভী কামুক। ভোগ করে উচ্ছিষ্ট ভাঁড়ের মতো ফেলে দিয়েছে। সমাজ-বেষ্টনীর ভেতরে স্ত্রী, বাইরে গণিকা। কাউকেই তার প্রাপ্য দেয়নি অথচ নিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে সমস্ত সুখ। সুসজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ-শান্তি-জৌলুস, আবার স্বৈরাচারের নিষ্ঠুর মজা। সন্তান উৎপাদন করেছে গণিকালয়ে, তারপর নামহীন, পরিচয়হীন তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে পৃথিবীর আঁস্তাকুড়ে। এর জন্য অনেক করুণার অশ্রু বর্ষিত হয়েছে, আহা-উহুতে ভরে গেছে পৃথিবী। কিন্তু বিচারের কথা কেউ কখনও ভাবেনি। ব্যভিচারী নারীকে অক্লেশে শাস্তি দিয়ে গেছে সমাজ। ব্যভিচারী পুরুষের জন্যে ক্ষমা, ভয়, প্রশ্রয়, বড় জোর একটু ঘৃণা। পুরুষরা তো বহুচারী হয়েই থাকে। আহা! প্রকৃতিই এমন করে তৈরি করেছে এই বেচারা শক্তিমানদের।

প্রকৃতি একা পুরুষকেই এভাবে সৃষ্টি করেছে এ কথা কি সত্যি? কল্যাণবাবু ভাবেন নানা দেশের প্রচলিত শাস্ত্রে-সাহিত্যে মেয়েদের সম্পর্কে প্রচুর কটুক্তি

আছে। নারীরা বহুগামী, স্বৈরাচারী, স্বভাব শিথিল...অনেক অনেক। কেন এত কটূক্তি? এ সবই কি কপোলকল্পিত? না-ও তো হতে পারে? প্রথম যুগগুলোতে সকলেই তো ছিল স্বেচ্ছাগামী! বহু যুগের ওপার থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন সেইসব সুন্দরীদের, যারা স্বেচ্ছাবিহার করত। বসন্তোৎসবের নামে কুঞ্জ বনে বনে অবাধ যৌনলীলায় মেতে উঠত। পরিবারের প্রয়োজনে, সন্তান পালন, গৃহ ও সমাজকে ধারণ করবার জন্য এক দিক থেকে শেকল পরানো হতে লাগল তাদের ওপর। আর এক দিক থেকে চলল নীতিশিক্ষা বর্ষণ—পরপুরুষ গমন পাপ, না জেনেও তা করে অহল্যা পাষাণ হয়েছিলেন, এক পুরুষের প্রতি অনুগত থাকাই পুণ্য, তাতে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এইভাবে চলতে চলতে একদিন মৃত পুরুষের চিতায় তাদের তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল সমাজ। এই পলিসি-মেকিং-এর রাশ যদি সে সময়ে নারীর হাতে থাকত তা হলে? তা হলে হয়তো আজ যাকে বেশ্যাপল্লি বলা হচ্ছে সেইরকমই হত নারীমহলের অন্দরের চেহারা। মেয়েরাও ইচ্ছামতো বিহার করত, তারপর ফিরে যেত ঘরের সুখ, শান্তি, স্বস্তির মধ্যে, নিশ্চিন্ততার জন্যে যেমন আজকের স্বেচ্ছাচারী পুরুষ যায়। সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত যদি হয় পরিবার, যদি সে পরিবার-প্রথাকে মান্য করতে হয়, তা হলে তো সবাইকেই তা করতে হবে! মেয়েদের মধ্যে যদি নিষ্ঠা দীর্ঘদিনের ট্রেনিং-এ ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে পুরুষদের ক্ষেত্রেই বা তা হবে না কেন? ব্যতিক্রম চিরকাল ছিল, থাকবে। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফলের নীতি থাকবে কেন?

জিনা পরিবারকে স্বীকার করার পুরো অর্থ সহজ বুদ্ধিতে এখন বুঝেছে—সমস্তটা নেব আর এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ মাত্র ফেরত দেব এ হয় না। পারিবারিক মর্যাদা ছাড়া নারীকে ব্যবহার করা মানে পরিবার-সিসটেমকে অগ্রাহ্য করা। নারীর অমর্যাদা তো বটেই, এই কোণ থেকে মুকুটরা সমস্যাটাকে দেখেনি। তারা ভাবে—আর্থিক অবস্থা তৃতীয় পৃথিবীর যা, তাতে করে এইসব মেয়ের অন্নসংস্থানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। সুতরাং যতই খারাপ হোক, ব্যাপারটা চলুক। বরং যদি মেয়েগুলোর দুর্দশা একটু কমানো যায়। এভাবে আপসমুখী চিন্তা করে কোনও সভ্যতা বাঁচতে পারে না। প্র্যাগম্যাটিক হও। কিন্তু লক্ষ্যটাকে অন্তত ঘোষণা করো, বাঁচিয়ে রাখো, যাতে জমি তৈরি হলেই আসল কাজ শুরু করতে পার। মুকুটরা যা ছ-সাত বছরে সম্ভব করতে পারেনি, জিনা তা পেরেছে মাত্র দেড় বছর সময়ে। মুক্তির ইচ্ছা জাগিয়েছে। মুক্তি সম্ভব করেছে একজনের। আর এক জনেরটা করার দিকে পা বাড়িয়েছে। অথচ জিনার কোনও ট্রেনিং নেই।

বনমালাকে পুত্রবধূ ভাবতে তাঁর নিজের ভেতর থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আসছে। তিনি অস্বীকার করছেন না। এর ফলে হয়তো নিখিল, তাঁর নিজের পুরো পরিবার সামাজিক দিক থেকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু পরিবারের একজন যদি রত্নাকর হয় অন্যদের তার পাপের ভাগ তো নিতেই হয়। তারা চাক বা না চাক। এবং এটাই সুবিচার। একবার যদি জিনিসটা সম্ভব করতে পারেন, একটা কাজের কাজ হয়। কী আর হবে? আগেকার মতো ধোপা-নাপিত তো আর বন্ধ

করে দিতে পারবে না কেউ। মল্লিকার মেয়েদের দরকার হলে বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন, এখানকার গণ্ডি থেকে দূরে। নিজেরা বুঝেশুনে বিয়ে করবে। জিনা অনায়াসেই সরে যেতে পারত নিজের পরিত্রাণ নিয়ে। কিন্তু সে জিনিসটাকে যতটা তার নিজের ওপর অবিচার হিসেবে দেখছে, ঠিক ততটাই দেখছে বনমালার প্রতি অবিচার হিসেবে। 'ফ্রেশ মাইন্ড' সজীব নতুন মন না হলে এ ভাবনা সম্ভব হত না।

সারাদিন ঘুরেফিরে একটা কথাই তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল, নিখিল কেন এ কাজ করল! তার জীবনে জিনার আয়ু আর বনমালার আয়ু তো মোটের ওপর একই দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে কুসঙ্গে পড়ে যদি এ মতি তার হয়েই ছিল, জিনার মতো একটি মেয়েকে সে বিয়ে করতে গেল কেন? আবার করলই যদি কেন ফিরে আসতে পারল না? এখন তো দেখা যাচ্ছে, জিনাকে ছাড়তেও সে রাজি নয়?

অনেকটা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তিনি পরদিন নিখিলকে ডেকে পাঠালেন। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছে নিখিল। ডলি কল্যাণবাবুর ঘরে দুজনের কফি দিয়ে গেল।

টাইটা খুলে ফেলেছে নিখিল। শার্টটা কোমরের কাছে মুচড়ে মুচড়ে আছে। পায়জামাটা নোংরা। ঘরে ঢুকে রুক্ষ স্বরে বলল, বিছানাটা ঘাঁটা, কেউ পরিষ্কার পর্যন্ত করেনি, জামাকাপড় কাচা হয়নি, সকালবেলায় এক কাপ চা পেলাম না। রাত্তিরে লঙ্গরখানার ভিক্ষে খেতে হচ্ছে, এভাবে আর ক'দিন চলবে?

একজনের জীবনটাই ঘেঁটে দিলে, আর সামান্য বিছানা ঘাঁটা নিয়ে নালিশ করছ, বাপধন? —কল্যাণবাবু ভাবলেন। মুখে বললেন, তুমি বরং একজন লোক রেখে দাও।

—আপনিও সমানে আশকারা দিয়ে যাচ্ছেন, নইলে বাড়ির বউয়ের এত সাহস হয়? ভদ্রবাড়ির মেয়ে, ভদ্রবাড়ির বউ হয়ে খারাপ পাড়ায় যেতে লজ্জা করেনি ওর? কে বলতে পারে সেখান থেকে নষ্ট হয়ে এসেছে কিনা! ওসব এন জি ও ফি-ও অনেক দেখা আছে আমার।

কল্যাণবাবু এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কথার মাঝখানে বাধা দিতে পারেননি। এখন শুধু বলতে পারলেন, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়!

—বুড়ো বয়সে ভিমরতি ধরেছে আপনার। কার বাবা আপনি? আমার না ওর? দিনের পর দিন যে মেয়ে সোনাগাছি যায়...তার আর...

—তুমি অনাচার করতে যেতে পার আর অন্যের সেবার জন্যে গেলে গালি দিচ্ছ?

নিখিলের মুখে একটা বিচিত্র হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে বলল, আপনি নিজেও তো পুরুষ মানুষ না কী?

—তোমরা যেমন সন্তানই হও, আমি তোমাদের বাবা...

—তা হলে বোঝেন না কেন যাই?

—না বুঝি না।

—তা হলে আপনাকে বোঝানো আমার কর্ম না। পুরুষ হলে তার দরকার হয়।

—পুরুষের তো অনেক কিছুই দরকার হয়। বিড়ি-সিগারেট-মদ-ভাঙ-চরস-

কোকেন-এল.এস.ভি-মরফিন-সাপের বিষ। আরও কিছু নতুন বস্তু উঠলে সেগুলোও দরকার হতে থাকবে। কেমন, কিনা?

—সেক্স হল বেসিক নিড।

—তো তারই জন্যে তো মানুষ বিবাহাদি করে!

—আপনি বুঝবেন না বিবাহিত স্ত্রী আর এইসব স্ত্রীলোকে অনেক তফাত!

—তা বেশ তো! আমি বুঝেছি তোমার কথা। ওই মেয়েটিকে তুমি নিয়ে এসো শাস্ত্রমতে। জিনা যেমন বলছে। ও তোমার স্ত্রীলোকের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আর আমি যদ্দূর বুঝেছি স্ত্রী হতেও ওর তেমন অসুবিধে নেই। আমাদের সমপর্যায়ের নয়। তো কী করা যাবে? তুমি ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিজের সমাজের যোগ্য করে নাও। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি শেখে। আমার কথা যদি বল তো বনমালা মেয়েটিকে অ্যাক্সেপ্ট করতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না!

—আমার হবে—নিখিল গরম হয়ে বলল, অ্যাবসার্ড টু দা পাওয়ার ইনফিনিটি। একটা বারোভাতারি মা...

—শোনো নিখিল, খারাপ কথা, গালিগালাজ দিতে হলে যেসব জায়গায় এসব চলে সেখানে যাও। আমি বুঝতে পারছি না, তোমার মতো বেয়াড়া ছেলে আমার হল কী করে!

—হয়তো আমি তা হলে আপনার ছেলে নই! —বিশ্রী হেসে উঠল নিখিল।

পাশ থেকে লাঠিটা তুলে নিলেন কল্যাণবাবু। তারপর সপাটে মারলেন এক বাড়ি। —জাহান্নামে যাও। এখানে তোমার স্থান নেই। এ বাড়ি আমি জিনাকে দিয়ে যাব, আর ওই কুটুসকে, যদি সৎভাবে মানুষ হয়ে ও একটা ভদ্রস্থ সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। যা—ও।

নিশিদুপুর

মাথার ওপরে ছাতার মতো বকুলগাছ। তার ওপরে নিচু সূর্য। তার ওপরে আইসক্রিম-নীল আকাশ। ঘুড়ি উড়ছে একটা-দুটো। ঘয়লা, বামনা। এই নির্বান্ধব নির্জনে কোথায় কে ঘুড়ি ওড়ায় কে জানে! কোনও স্কুল-ছুট বালক! কোনও কর্মহীন যুবক? তারও উঁচুতে কয়েকটি চিল। আকাশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যেন মাছের সঙ্গে জলের। আকাশ-জলে সাঁতরায় চিল। মাঝেমধ্যে যখন নেমে আসে তীব্র হ্রেষায় চমকে ওঠে ইঁটকাঠ, গাছপালা। নির্বিকার নীল থেকে খসে পড়ে কালো ফুটকি, ব্রাউন ফুটকি, বড় হতে থাকে ক্রমশ। শিকার? নাঃ। শিকার নেই, স্বার্থ নেই। শুধু খেলা। দেখতে বেশ লাগে। একটা প্রশান্তি আসতে থাকে।

জিনার এখন বায়ুভূত নিরালম্ব লক্ষ্যহীন অবস্থা। সে নাগচৌধুরীতেও নেই, দে সরকারেও নেই। দমদমে যায়নি, ডাফ স্ট্রিটে সে ফিরেও ফেরে না। শরীরের মধ্যে মন নেই। আলাদা হয়ে ঘুরে বেড়ায় মনটা। 'রোচনা' সম্পর্কে সে মন স্থির করে নিতে চায়। ভাল লাগবে কি না। এটাই এখন তার একমাত্র চাকরির সুযোগ। ইতিমধ্যে দায়হীন আসা-যাওয়া চলছেই। প্রধান আকর্ষণ কুটুস। কেননা কুটুসেরও প্রধান আকর্ষণ জিয়া।

অন্য সবাই জিনাকে জিনাদিদি বলে। এখানে দিদি বা দিদা ছাড়া আর কিছু বলতে শেখানো হয় না। কুটুস অতটা বলে না, বলে 'জিয়া'। তার মুখে আধো আধো 'জিয়া' ডাক শোনবার জন্যেই সব্বাই তাকে বড্ডই বিরক্ত করে। দিদিরা বলে—ও কুটুস, ওই দেখ দূরে—কে আসছে রে?

কুটুস ভুরু কুঁচকে তাকায়, মুঠো গোল করে দূরবিন বানায়। দেখেটেখে বলে, 'জিয়া'।

—লাল ছাপ জামাটা তোকে কে দিয়েছিল রে? —'জিয়া'।

আবার চোখাচোখি। হাসি।

—আজকে কার সঙ্গে লুডো খেলবি রে?

কুটুস বুঝে যায় তাকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে, সে এদিক ওদিক চায়, জবাব দেয় না।

বকুলতলায় বসে বসে আকাশ দেখছিল সবাই। বিকেলের নরম নীল আকাশ। কুটুস জিজ্ঞেস করল, জিয়া আঁকাশের মধ্যেও পিঁপড়ে থাঁকে?

—থাকেই তো। দেখিস না গর্জন করে ছুটে যায়।

—কে? সে তো পেলেন?

—ওরাই আকাশের পিঁপড়ে।

এখানকার নিয়মমতো পাঁচ বছর বয়স থেকে বাচ্চা নেওয়া হয়। কুটুসকে তার মায়ের নির্বন্ধে ও মুকুটের সালিসিতে আরও ছোট বয়সে নেওয়া হয়েছিল। তার মা তাকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের 'বাবু'র ভাড়া করা ঘর থেকে সরাতে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কুটুসের জিবের আড় কিছুতেই ভাঙছে না। সে যেখানে-সেখানে চন্দ্রবিন্দু লাগায়। যুক্তাক্ষর তো উচ্চারণ করতে পারেই না। এটা

ঋত্বিকদের ভাবাচ্ছে একটু। অন্য অনেক ছেলেই যুক্তাক্ষর ভাল করে উচ্চারণ করতে পারে না। কেননা তারা চারপাশে ওইরকম ভাঙা উচ্চারণই শুনে শুনে বড় হয়েছে। কিন্তু কুটুসেরটা স্পষ্ট আধো আধো। এই ব্যাপারটাই একটু ভাবাচ্ছে সবাইকে। চেহারাতেও সে ছোট্ট। কিন্তু আজকাল জিনা ওর মধ্যে পরিষ্কার কল্যাণবাবুর আদল দেখতে পায়। পুরোটা নয়। ঠোঁটের কাছটা। চোখের আকার, হাসির ধরনটা, কানগুলো ওর মায়ের মতো। কল্যাণবাবুর দুই ছেলে মোটামুটি লম্বাচওড়া হলেও উনি নিজে একটু ছোটখাটোই। ছোটখাটো সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। কুটুস বোধহয় তার দাদুর ধরনটাই পেয়েছে। নিখিলের রং ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই তার শরীরে। নিখিলের মতো চৌকোটে ভরাট মুখ, চেরা চেরা নিষ্ঠুর চোখ, পাতলা নির্দয় ঠোঁট কুটুসের হলে তার স্নেহের ধারা কোন দিকে বইত বলা শক্ত। হয়নি যে এটা রক্ষা। কল্যাণবাবু এই শিশুটিকে তাঁর অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যেতে চাইছেন। কিন্তু জিনার ওপর তিনি নির্ভর করছেন। জিনা ওর ভার নেবে, ও যেখানেই থাকুক। স্পষ্ট করে না বললেও এমন ইচ্ছে তিনি হাবেভাবে প্রকাশ করছেন।

জিনা এ বিষয়ে এখনও কিছু বলেনি। এখনও পর্যন্ত সে দমদমের বাড়িতেও কিচ্ছু বলেনি। ও বাড়িতে তার সবচেয়ে কাছের লোক জেঠু। পিসতুতো দিদি রুমার সঙ্গেও তার খুব মিলত। কিন্তু সে তো এখন মিনেসোটায়। মা, বাবা, দিদি এদের কাউকেই কথাগুলো বলবার সাহস সে সঞ্চয় করতে পারছে না। অথচ কাউকে না-কাউকে শিগগিরই তাকে তো বলতেই হবে। 'তোমরা যার সঙ্গে আহ্লাদ করে আমার বিয়ে দিয়েছিলে সে লোকটা দুশ্চরিত্র, ভাল করে জানবার চেষ্টা করনি। চাকরি, বাড়ি আর চেহারা এই তিনেই ভুলেছিলে। ওকে আমি ত্যাগ করেছি।'—এমন কিছু কথা নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই জাতীয় কথাই তো অনেক মেয়েকেই বলতে হয়। কিন্তু সে সহজে বলতে পারছে না, রাগে অপমানে দুঃখে গা জ্বলে যাচ্ছে তার। আর এতগুলো বছর তো সে-ও নিশ্চিন্ত আহ্লাদে কাটিয়েছে। যেসব পারিবারিক সংকট এসেছে তার মুখ্যত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার সুবাদে উতরে গেছে সেসব। দমদম জানতেই পারেনি। এত তরল, অগভীর স্বভাবের মেয়ে সে যে সেসব কোনও দাগও রেখে যায়নি তার মনে। কোনও কিছু নিয়ে দুঃখ পেতে, প্রশ্ন করতেই যেন জানত না সে। ভেবে দেখতে গেলে নিখিল তো খুব পছন্দ করার মতো মানুষ ছিল না! রুক্ষ, রূঢ়, স্বার্থপর, কটুভাষী, অতিরিক্ত দাবি সব সময়ে। অন্য কোনও মেয়ে হলে হাজারবার নালিশ করত। প্রতিবাদ করত। সে তো করেনি! কেন করেনি! করলে হয়তো এই বিয়ের মধ্যেকার ফাঁকিটা আরও তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যেত। কোনওদিন যার সম্পর্কে অভিযোগ করেনি, তূরীয় আহ্লাদ দেখিয়েছে, আজ তার সম্পর্কে কুৎসিত নালিশ নিয়ে হাজির হলে গোটা দমদমের বাড়িটাই কি শকে হার্ট-ফেইল করবে না?

তাই এখনও ডাফ স্ট্রিটেই ফিরছে সে। ডাফ স্ট্রিট থেকেই যাতায়াত। এ বাড়িটা জানে তার অপমানের কাহিনী। অপমানের কালি এ বাড়ির গায়েও লেগেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তারা এক গোত্রের। এখানে কোনও কৈফিয়ত নেই,

উৎকণ্ঠা আছে, আশ্রয় আছে। রোজ কল্যাণবাবুকে কথা দিয়ে বেরোতে হয় সে কোনও হঠকারিতা করবে না। বাড়িতে ফিরে কাউকে না-কাউকে দিয়ে খবর পাঠাতে হয় সে এসেছে। বিতৃষ্ণাটা এই বাড়ি সম্পর্কে আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। যদিও একেক সময়ে প্রচণ্ড একটা ক্ষোভ তাকে দিশেহারা করে দেয়। যতক্ষণ 'রোচনা'য় থাকে সব ভুলে থাকে। যে মুহূর্তে বাড়িতে পা দেয় হুড়মুড় করে ফিরে আসতে থাকে সব। একেকটা সিঁড়ি পার হয় আর ধাপে ধাপে চড়তে থাকে ক্ষোভের মাত্রা। সামনে যাকে পায় তার ওপরই প্রবল ঘৃণা আর রাগ হতে থাকে। একমাত্র মেয়েদুটি ছাড়া।

আজও মল্লিকা জানলায় চোখ পেতে ছিল। ডলি নীচে দরজা খুলে দিতেই ওপর থেকে সরে গেল তার উৎকণ্ঠিত ভিতু ভিতু মুখটা। কেমন অপরাধী অপরাধী। মল্লিকার এই ভাব কেমন একটা অস্বস্তি জাগায় তার মনে। আর কেউ তো এমন করে না! কল্যাণবাবু প্রথম দিনটি থেকেই দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন—তিনি নিজের ছেলেটিকে বিন্দুমাত্র চিনতেন না। ছেলেকে অপথ-কুপথ থেকে ফেরাবার জন্যে যারা বিয়েকেই একমাত্র ওষুধ মনে করে এবং একটি নির্দোষ মেয়ের সর্বনাশ করে তিনি সে দলের নন। তিনি এখনও মাথা উঁচু করেই থাকেন। দাদা জীবনে কখনও কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। এখনও তাঁর ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের। জিনা এখন বোঝে মানুষটি কাপুরুষ গোত্রের। ইদানীং তিনি ক্লাবে আড্ডার সময়টা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাতে জিনার মুখোমুখি হতে না হয়। কিন্তু মল্লিকা যেন এ বাড়ির সন্ত্রস্ত বিবেক। পরিবারের হয়ে জিনার প্রতি অবিচারের সমস্ত বোঝা যেন সে তার একলার কাঁধে তুলে নিয়েছে।

ওপরে এসে জিনা আগে হাত-মুখ ধুল । যতক্ষণ 'রোচনা'য় থাকে তার গায়ে লেগে থাকে খেলাধুলোর ধুলো। বাইরে বেরোবামাত্র সেগুলো হয়ে যায় বাস-লরি-অটোর কালিঝুলি, দূষণ, নোংরা, ঘষে ঘষে ধুয়ে ধুয়েও যায় না সেসব। এইসময়ে মেয়েরা কোনও না কোনও কোচিং-এ যায়। সে একটু চেঁচিয়ে ডলিকে ডাকল, বাবাকে যেন তার আসার খবরটা দিয়ে আসে।

তারপরে অনেকদিন পরে ডাকল, দিদিভাই!

নিজের ঘর থেকে শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল মল্লিকা। বলল, চা করি? না কফি?

—চা দাও। আজ দুবার কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

—আর কী দেব? চিঁড়ে ভেজে দেব? না গরম শিঙাড়া আনিয়ে দেব মদনের দোকান থেকে?

—কিছু না। তুমি বসো।

আজকে কি জিনার মেজাজ কোনও কারণে ভাল আছে?

মল্লিকা চা নিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বসল।

দু-এক চুমুক চা খেয়ে জিনা বলল, দু-এক সপ্তাহ পরেই আমি 'রোচনা'য় চলে যাব ভাবছি।

—কেন?—মুহূর্তে মুখ শুকিয়ে গেল মল্লিকার।

—কতদিন আর তোমাদের ওপর এভাবে থাকব?

—আমাদের ওপর আবার কী? তুই আছিস তোর নিজের জায়গায়। বাবা বোধহয় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করে দিয়েছেন। ও বাড়ি তোর। টাকাপয়সা সব কিছুরই...

—তা হয় না দিদিভাই। বাবা দিলেই যা আমার নয় তা আমি নিতে পারি না।

—কেন নয় কেন? শ্বশুরবাড়িতে কি মেয়েদের কোনও অধিকার নেই? যে সম্পত্তি স্বামীর প্রাপ্য, তা কি স্ত্রীরও হয় না?

—পাগলামো করো না দিদিভাই। স্বামীটামি বলো না।

—তুই-ই পাগলামি করছিস জিনা, কাগজে-কলমে তুই ওর স্ত্রী-ই।

—কাগজে-কলমে যাতে সেটা না থাকে আর তার ব্যবস্থা করছি।

—কর। কিন্তু একবার যখন বিয়ে হয়েছে তোর কিছু অধিকারও তো আছে। তা ছাড়া অত সহজে ও তোকে ডিভোর্স দেবে না জিনা। তোকে মামলা চালাতে হবে।

—চালাব।

—তুই খালি নিজের কথাই ভাবছিস। আমাদের কথা...

—তোমরা আমরা কথা ভেবেছিলে?

মল্লিকার মুখ শুকিয়ে গেছে। সে টেবিলের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে রইল।

জিনা বলল, দিদিভাই, আই ডিডনট মিন ইট। তোমার কী দোষ? বরং তোমার সঙ্গেই কত দিনরাত কত আনন্দে কাটিয়েছি। মনের জ্বালায় এসব বলে ফেলি। কিছু মনে করো না।

মল্লিকা সজল গলায় বলল, আমার কথাটা একটু ভাব জিনা। এখানে থাক। এই তো আমাদের এ দিকে থাকবি। না হলে ও যে কী করবে আমার ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

—আশ্চর্য তো! কী করবে ও? মাঝের দরজাটা বন্ধ করে রাখবে। ও দিকে ও যা খুশি করুক না। দয়া করে খাবারটাবার পাঠাতে যেয়ো না। বনমালা এসে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বনমালাকে মানতে পারছ না জানি। তোমার সেন্টিমেন্ট আমি বুঝতে পারছি দিদিভাই। কিন্তু আমি বলছি দিদিভাই মেনে নাও। ওকে রিহ্যাবিলিটেট করতে সাহায্য করো। কোথাও না-কোথাও এই অন্যায়-শৃঙ্খলটাকে ভাঙা দরকার।

—তুই বড্ড ছেলেমানুষ জিনা। বনমালাকে ও কোনওদিনই বিয়ে করবে না।

—সে ক্ষেত্রে ওর চাকরি যাবে। বাবাও ওকে বার করে দেবেন, যদি আর বেয়াদবি করে। আর কাউকে যাতে বিয়ে করতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।

—ও আর কাউকে বিয়েও করবে না।

—ঠিক আছে। তো থাক—এইভাবেই একদিকে পড়ে থাক। আমি তো শুনেছি বাবা কুটুসকে ওর সম্পত্তি লিখে দেবেন।

—তো ভালই তো। তুই কুটুসকে দত্তক নে। এখানে নিয়ে আয়। অতগুলো ঘর। নিখিল যেখানে থাকে থাক, তুই তোর মতো থাকবি।

—ডিভোর্সের কেস চলবে, আমি এখানে থাকব? এটা সম্ভব?

—বেশ তো, এখানে আমার কাছে থাকবি। সেটা তো আমার পক্ষে আরও ভাল। তুই আছিস জানলে ওর একটা ভয়ভীতি, একটা চক্ষুলজ্জা থাকবে।

—তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না দিদিভাই। ভয়ভীতি? চক্ষুলজ্জা? কীসের? কেন? এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হতে পারে না। এটা তুমি বোঝো...বোঝবার চেষ্টা করো। জিনা চলে গেল।

কোথা থেকে মামলার টাকাটা আসবে এটা সে এখনও জানে না। এটা নিয়ে তাকে ভাবতে হচ্ছে। বাবা-মাকে বলবে কি না এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি সে। জিতে গেলে অবশ্য সবটাই ও পক্ষের মিটিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে? ধার নিতে হবে। কার কাছে? মুকুট? ঋত্বিক? ওরা ছাড়া তার আর আছেই বা কে? অ্যালিমনিটা সে নেবে ঠিক করেছে। তার ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু লোকটাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য যা করার সে করবে। টাকাটা নেবে একেবারে থোক। এই টাকাটা দিয়ে যদি পূর্ণিমার কোনও ব্যবস্থা করতে পারে। এখন বাবার সঙ্গে একটু কথা বলে সে ঘরে চলে যাবে। বসে বসে টিভি দেখবে। কিছুই তেমন করে দেখবে না, শুনবে না, তবু দৃশ্য আর শব্দগুলো তার ভেতরের দৃশ্য আর ধ্বনিগুলোকে অকেজো করে রেখে দেবে কিছুক্ষণ। সেটাই লাভ।

দালান। দরজা। দরজার ওপারে তার পুরনো বাড়ি। কদিন আগেও তার ছিল। তার সাজসজ্জা, পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কত ভাবনা ছিল। এখন নেই। সে জানে না বিছানার চাদর, খাবার টেবিলের ঢাকা বদলানো হচ্ছে কি না, বাথটব পরিষ্কার করা হচ্ছে কি না, সম্ভবত হচ্ছে না। কেননা ও বাড়ির বর্তমান বাসিন্দার এসব সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। তার ধারণা এগুলো কোনওটা মেয়েদের, কোনওটা জমাদারের কাজ, এবং এরা বিনা আহ্বানে, বিনা তদারকিতেই সব সমাধা করে থাকে। যাই হোক, এগুলো তার ভাবনার বিষয় নয়। কিন্তু বাবার ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে।

—আমি অস্বীকার করছি। ও কখনও আমার ছেলে নয়—নিখিলের গলা।

—ও তোমারই ছেলে। ওকে দেখলেই বোঝা যায়। আমি ছোটবেলায় অবিকল ওইভাবে চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বলতাম।—বাবার গলা।

অপরিচিত একটা গলা বলে উঠল, বাচ্চাটি আপনার সন্তান হোক বা না হোক, আপনার পিতৃদেব নিজের ইচ্ছায় তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি একজন সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক অনাথকেও দিয়ে যেতে পারেন। ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছের ওপর। তাঁর নিজের উপার্জনে এই সম্পত্তি তিনি করেছেন।

—আজ্ঞে না—নিখিলের উত্তপ্ত গলা—উনি ওঁর বাবার থেকে যা পেয়েছিলেন তাতেই এসব হয়েছে।

—তা যদি মনে করেন, সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। করতে পারবেন না।

কল্যাণবাবুর গলা—জিনা ডিভোর্সের পর এসব নিতে চাইছে না। তাকে আমি কুটুসের কাস্টোডিয়ান করে দেব। কুটুস সাবালক হলে সম্পত্তি পাবে, তবে

তখনও তার ওপর জিনার তদারকি দায়িত্ব আমি রাখছি।

—একটা বাস্টার্ডকে আপনি আমার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দিচ্ছেন? আমি এ উইল কনটেস্ট করব। মগের মুলুক নাকি? দেখি কেমন করে আপনি এমন অন্যায় করেন—নিখিল শব্দ করে বেরিয়ে আসছে।

জিনা দ্রুত সরে গেল। সত্যি কথা বলতে কী কেন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতগুলো কথা শুনল তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। সম্ভবত কল্যাণবাবু সত্যি সত্যিই নিখিলকে বঞ্চিত করে তার অংশ কুটুসকে দিয়ে যেতে পারবেন এটা সে মনে মনে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এই ধরনের আইনি বন্দোবস্ত হলে তার নিজের কী অবস্থা হবে! কাস্টোডিয়ান মানে কী? সে কতটা বাঁধা পড়ে যাবে এ বাড়ির সঙ্গে? সে মুক্ত হতে চাইছে। কুটুসকে চাইছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তিও চাইছে। ছ-সাত বছরের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা তার ভেতরে একটা চ্যালেঞ্জ জাগিয়েছে। তার সমস্ত সুনিপুণ গৃহিণীপনা, মেলামেশা-সামাজিকতায় দক্ষ আধুনিকাপনা। তার পত্নীত্ব, তার সৌন্দর্য ও রুচিবোধ সমস্ত যেভাবে অস্বীকৃত, অপমানিত হয়েছে তাতে সে ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। কুটুসের পালিকার ভূমিকা পালন করলেই তার মোক্ষ মিলবে না। নিখিলের সঙ্গে বাড়ির দেওয়া বিয়েটা একটা বিয়েই নয়। শরীরে স্পর্শ করলেও মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। নিজে বুঝেসুজে, নিজের দায়িত্বে সে আবার বিয়ে করবে, দেখিয়ে দেবে সুখী হওয়া কাকে বলে। ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছিলেন তার খুব ভাগ্য যে এই লোকের সন্তান তাকে ধারণ করতে হয়নি। বিয়ে করবে, কিন্তু তার আগে নিজের দাঁড়াবার জায়গা তাকে খুঁজে নিতে হবে। তার যে সামর্থ্য নেই তা তো নয়। কারুর দয়ায় সে বাঁচবে কেন?

কিন্তু কতকগুলো নরম জায়গা তার ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে এ বাড়িতে; সেটা সে অস্বীকার করতে পারছে না। দিদিভাই জানে না, সেই এক নম্বর নরম জায়গাটাই তার। যেন দিদিভাই নয়, সে-ই দিদিভাইয়ের দিদি, এমন একটা রক্ষাকর্ত্রীসুলভ মনোভাব। দুর্বল মেয়েদের প্রতি সবল মেয়েদের বোধহয় এই ধরনের একটা দিদিসুলভ দায়িত্ববোধ জন্মায়। আজ যে দুর্দৈব তার জীবনে এসেছে, দিদিভাইয়ের জীবনে তার কাছাকাছিও কিছু যদি কখনও আসত কী করত ও? ভেঙে যেত টুকরো টুকরো হয়ে। কিংবা নিজেই বোধহয় অপরাধীর মতো মুখ বুজে সংসারধর্ম পালন করে যেত। কী প্রচণ্ড ভয় নিখিলকে। যমের মতো ভয় পায় ও নিখিলের রূঢ়তাকে, প্রতাপকে। নিখিলও দিদিভাইকে ভীষণ অপছন্দ করে, সংসার আলাদা করার যা-কিছু ষড়যন্ত্র সে করেছে জিনাকে দিদিভাইয়ের প্রভাব থেকে সরাবার জন্যই। এখন এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে সে।

দিদিভাই ছাড়াও বাবার প্রতি তার একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে খুব কাছাকাছি এসে গেছে তারা। ভাবনা-চিন্তায়, ধ্যান-ধারণায়। সুদ্ধু জিনার কথা ভেবে, তার ওপর আস্থা রেখে উনি নিজেকে, নিজের সংস্কারকে যেভাবে ভাঙছেন, তাতে এককথায় উনি আশ্চর্য। তার নিজের জেঠু, বাবা—এঁরা সব বেশ সরল সহজ, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ভাল লোক, তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা ও ঐক্যে বিশ্বাস আছে। কাণ্ডজ্ঞান যেমন রসজ্ঞানও

তেমনি। কিন্তু কল্যাণ দে সরকারের সঙ্গে তাঁদের কোনও তুলনা হয় না। এই বাবার পাশে তার জেঠু যেন একটা ভাঁড়, ক্লাউন। এই পরিস্থিতিতে পড়লে জেঠু কী করতেন? বোধহয় নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাতে হত; উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি, স্থূলদেহ, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, বয়স ঊনসত্তর, বিশেষ চিহ্ন চিবুকের ওপর কাটা দাগ। প্রমোদ নাগচৌধুরী। কেহ যদি খবর দিতে পারেন কৃতজ্ঞ থাকিব।

তৃতীয় নরম জায়গা ঝুম্পা-মাম্পিকে ছাপিয়ে কুটুস। শিশুর মায়া বড় মায়া। প্রথম দেখার দিন থেকে কুটুসের প্রতি তার যে কী অকারণ স্নেহ পড়েছে, কেন পড়েছে ভেবে সে কূলকিনারা করতে পারে না। ভারী মায়াময় বাচ্চা ও। তারও জিনার ওপর ভীষণ ঝোঁক। সোম, বুধ, শুক্র তিনদিন সে এখন 'রোচনায়' যায়। ঋত্বিক বলেছে—দেখো জিনা, ভেবে-চিন্তে কাজে যোগ দাও। তোমার মতো একজন চিফ সুপার পেলে আমরা বর্তে যাব। কিন্তু চিফ সুপারের দায়িত্ব অনেক। রেসিডেনশ্যাল তো বটেই। তুমি ভেবে নাও। চিফ হলে তুমি কোয়ার্টার্স পাবে, টাকাকড়িও ভাল দিতে পারব। অন্য দিকে টিচারের পোস্টে মাইনে কম, কিন্তু স্বাধীনতা বেশি। দুটোর মধ্যে যেটা ইচ্ছে তুমি নিতে পার। কিন্তু আগে ভাল করে ভেবে নাও।' জিনা এখন তিনদিন পড়াতেই যায়। কিন্তু অন্যান্য দিনগুলোতেও কুটুস তাকে খোঁজে। সে গেলে কাছ থেকে আর নড়তে চায় না।

পরদিন 'রোচনা'য় গেলে ঋত্বিক বলল, জিনা, তোর জন্যে কুটুসের মা অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে। দেখ বোধহয় পূর্ণিমার ঘরে। বনমালার উল্লেখমাত্র ভেতরে একটা রাগ সাপের মতো ফণা তুলছে সে টের পায়। এর কোনও যুক্তি নেই। সে তো বনমালাকে মেনেই নিয়েছে। জানে না কি তার ভূমিকা তার জীবনের বিপর্যয়ের একেবারেই নিমিত্তের মতো? তবু এই রাগ, এই কুঁকড়ে যাওয়া সে থামাতে পারে না।

একটা ছোট ঘর আপাতত পূর্ণিমাকে দেওয়া হয়েছে। সে 'রোচনা'র জরুরি অবস্থার অতিথি। জিনা তার নিজের উপার্জনের থেকে পূর্ণিমার খরচ বহন করে। খুব সম্ভব তার নিজস্ব টাকাকড়ি যা মুকুটদের কো-অপারেটিভে আছে তার ব্যবস্থাও শিগগির হয়ে যাবে। তবে আহামরি কিছু নয়। পূর্ণিমা এখানে ভাল আছে মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। সুপারদের মধ্যে একটি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট তাকে খুব সাহায্য করে। সুধাদির বাংলা জ্ঞানও কাজে লাগছে। ইংরেজি দেখিয়ে দেয় জিনা নিজে। অন্য সময়ে বাচ্চাদের একটু দেখাশোনা, তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে পূর্ণিমার সময় ভালই কাটে।

ঘরে ঢুকতেই বনমালা উঠে দাঁড়াল। তার মুখ নিচু। চোখ মাটির দিকে। জিনা ঈষৎ বিরক্ত গলায় বলল, কিছু বলবে?

বলতেই বনলতা উপুড় হয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল। কাঁদছে।

জিনা আরও বিরক্ত হয়ে বলল, কান্নাকাটি করো না, আমার ভাল লাগে না। কী বলবে বলো। তোমার ওপর আমার কোনও রাগটাগ নেই।

সেই দিনের পর এই প্রথম বনলতার সঙ্গে তার দেখা। অনেক রোগা হয়ে

গেছে মেয়েটি। তাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—দিদি, বনলতা সজল গলায় বলল, আপনি ওসব বিয়ে-থার কথা তুলছেন কেন?

—কেন? সেটাই সভ্য সমাজের নিয়ম, এখনও সেটাই আমি মানি বলে।

—আমাদের কেউ কখনও বিয়ে করে?

—করে না। এবার থেকে করবে। আজ একজন করলে কাল আরও পাঁচজন করবে। তোমরাও প্রমাণ করতে পারবে তোমরা অস্বাভাবিক জীব নও। বাবাও তো রাজি হয়ে গেছেন।

—সে আপনি যা-ই বলুন, এ হয় না। আমিই বা কেন রাজি হব?

—সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু রাজি না হলে কেন সেটা আমি জানতে চাইতেই পারি।

—আপনাদের চাপাচাপিতে যদি সত্যি সত্যি ওরকম কিছু ঘটেও, তাতেও কি উনি আমাকে সম্মান দিতে পারবেন?

—আমি ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলাম বনমালা। মান উনি আমাকেও দেননি। আমি জানতাম না তাই ছিলাম। তুমি জানতে, কিন্তু তোমার আপত্তি হয়নি। এখন যদি তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়েও আগেকার মতো ব্যবহার করেন তা হলে তোমার অপমানিত বোধ করা উচিত নয়। এসব কথা ছাড়ো। আইনত স্ত্রী হলে তুমি অনেক সুবিধে পাবে, তোমার ছেলে তো পাবেই। ছেলে পিতৃপরিচয় পাবে। সবচেয়ে বড় কথা এই অনাচার থামা উচিত। তুমি কারও সম্পত্তি নও, কোনও মানুষ কারও সম্পত্তি হতে পারে না, তবু তোমাকে একজন বেচে দিল, অমনি তুমি তার দাসী হয়ে গেলে—এটা অনৈতিক তো বটেই, সম্পূর্ণ বেআইনি। নিরুপায় হয়ে তুমি এ জীবন মেনে নিয়েছিলে। আমি চাইছি তোমার ওপর অবিচারের প্রতিকার হোক।

—জিনা দিদি। এবার মুখ তুলে চাইল বনলতা, তার চোখে বেশ অবাধ্যতা—যদি বিয়ে করতেই হয় তা হলে নিখিলবাবুর মতো খারাপ লোককে আমি বিয়ে করব কেন, বলতে পার? আমাদেরও যে কখনওসখনও সত্যিকারের বিয়ে হয় না তা নয়, কিন্তু সে হয় ভালবাসায়। তার জন্যে বিশ্বাস চাই। আপনার উনি তো মিথ্যেবাদী। হপ্তায় তিন-চারদিন তিন-চার ঘণ্টার জন্যে আসে তাইতেই তো হাড় কালি করে দেয়। যা হয় ওই তিন-চার দিনের ওপর দিয়ে যায়। ঘরে নিয়ে গেলে তো দিনরাত্তির যা খুশি করবে। উনিও যেমন আমাকে মান দিতে পারবেন না, আমিও তেমনি ওঁকে মান দিতে পারব না। একফোঁটাও নয়। জোচ্চোরকে কি বিশ্বাস করা যায় নাকি?

জিনা বিরক্ত গলায় বলল, কেন, তুমিই তো সেদিন বলছিলে উনি লোক ভাল! তোমার কাছে উনি ভালই থাকবেন।

—না দিদি, ওটা ওঁদের ফুর্তি করার জায়গা, কখনও বন্ধুবান্ধব নিয়ে, কখনও একা। সে ফুর্তির রকম আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন না। আর মদ পেটে পড়লে তো আর দেখতে হবে না। সে চেহারা আপনাদের দেখতে হয় না, সেসব চোখরাঙানি আবদারও আপনাদের শুনতে হয় না। ভাল মানে কী! ভাল মানে

পেমেন্ট ভাল। সেখানে জোচ্চুরিটা করেনি। এ দু মাস ওঁকে আমি ও ঘরে ঢুকতে দিইনি। পরের মাসে বাড়ি ভাড়ার অ্যাডভান্স শেষ হবে—আমিও ও ঘর ছেড়ে দেব।

—তারপরে? কোথায় যাবে? তোমার ছেলে? উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল জিনা।

—আমার ছেলেকে ঋত্বিক দাদারা যেমন দেখছে দেখবে। আর নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারব।

—আবার ওই...

—তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দিদি, আমার ছেলের মাথার দিব্যি, আমি আর ও কাজ করব না। তুমি আমার কথা ভেবে মিছে কষ্ট পেয়ো না।

বনমালা বেরিয়ে গেল।

—শোনো, বনমালা শোনো—জিনা পেছন থেকে ডাকল—কিন্তু বনমালাকে ধরতে পারল না। চিন্তিত মুখে সে পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করল, তুই কিছু জানিস? ও কোথায় যাবে, কী করবে? কী ঠিক করেছে ও?

পূর্ণিমা মাথা নাড়ল। সে কিছু জানে না।

এরই দু-তিন দিন পরে রবিবার পরেশনাথের মন্দিরে বেড়াতে গিয়ে ফিরল না 'রোচনা'র কয়েকটি বাচ্চা। কুটুস এবং আরও তিনটি। কুটুসই সবচেয়ে ছোট, অন্যরাও বছর ছয়-সাড়ে ছয়ের বেশি হবে না। নিয়ম অনুযায়ী ওদের সঙ্গে গিয়েছিল ওদের তিনটি দিদি, অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, দুজন টিচার, গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন ললিতা দেবী ছাড়াও সমরেশ চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা, এর ওপরে বাসের ড্রাইভার। তার হেল্পার। ললিতা দেবী ও সমরেশ চৌধুরী যান নিজস্ব গাড়িতে। এঁরাও প্রায়ই যান। বাচ্চারাও এঁদের ভাল করেই চেনে। বিশেষ করে ললিতা দেবী প্রায়ই হস্টেলে অনেক খাবারদাবার, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে যান বলে তাঁকে সব বাচ্চাই ভালবাসে। ওদের গুনে-গেঁথে বাস থেকে নামাতে হয়, গুনে-গেঁথে তুলতে হয়। তোলবার সময়েই গুনতিতে চারজন কম পড়ে। পরক্ষণেই বোঝা যায় তারা ঠিক কোন চারজন। চিড়িয়াখানা বা বট্যানিক্যাল গার্ডন্‌স্‌-এর মতো বড়ো জায়গায় গেলে বাচ্চাদের দল হিসেবে ভাগ করে প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজনকে রাখা হয়। নিক্কো পার্ক, সায়েন্স সিটি, পরেশনাথ—এসব জায়গায় দরকার হয় না। শেষ দেখা গেছে ওদের মাছের চৌবাচ্চার কাছে। একমনে মাছ দেখছিল।

সংখ্যায় গরমিল ধরা পড়ার পরে ওঁরা সারা পরেশনাথ মন্দির-চত্বর আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছেন, অবশেষে স্থানীয় থানায় ডায়েরি করে এসেছেন। কিন্তু ঋত্বিক রবিবার রাত্রে দিল্লি থেকে ফেরায় সোমবার এগারোটার আগে খবর পায়নি। দিল্লি গিয়ে বেচারি আরও ফান্ডের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছে। খুব খুশি মেজাজে ছিল। এসেই এই খবর। সারাদিন বেলগাছিয়া থানা, মিসিং পার্সনস স্কোয়াড, মিডিয়া এইসব নিয়ে ব্যস্ত ছিল ঋত্বিক-মুকুট দুজনেই।

রোববার থেকে জিনার জ্বর জ্বর। সকালে সে যেতে পারবে না জানিয়ে

দিয়েছিল ঝুম্পাকে দিয়ে। বিকেল চারটে নাগাদ সে মুকুটের ফোন পেল।

—জিনা একটা বাজে খবর আছে।

—কী? বনমালা? আমি তোকে শুক্রবার থেকে অনেকবার...

—বনমালার কিছু হয়নি। শুক্রবার ওর জন্যেই আমাকে একটু বাইরে যেতে হয়েছিল। ছিলাম না ক'দিন। খবরটা ওর ছেলের।

—কুটুসের? কী হয়েছে?

—কুটুস হারিয়ে গেছে।

—হারিয়ে গেছে মানে?

তখন মুকুট তাকে আদ্যোপান্ত বলল।

পুলিশ ইনভেস্টিগেট করছে, তুই ভাবিসনি।

জিনার মাথা ঝিম ঝিম করছিল।

—কে হারিয়ে গেছে? কী? —রিসিভার রাখতেই পেছন থেকে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল।

—কুটুস হারিয়ে গেছে পরেশনাথের মন্দির থেকে।

কুটুস ইদানীং মাঝে মাঝেই এসে ডাফ স্ট্রিটের বাড়িতে থাকছে। জিনার সঙ্গে আসে। আবার একদিন পরে জিনার সঙ্গেই ফিরে যায়।

—কার বাড়িতে এসেছে কুটুস? —মাম্পি জিজ্ঞেস করে।

—জিয়া।

—কে তোমাকে মুড়ি খেতে দেয়?

—ঝুমা।

মুড়ি খেতে খুব ভালবাসে কুটুস। আলুসেদ্ধ দিয়ে মুড়ি। মেখে দেয় মল্লিকা। ঝুম্পা বসে বসে খাওয়ায়। মাটিতে মুড়ি পড়ে গেলে একটি একটি করে তুলতে থাকে কুটুস।

—খেয়ো না, পড়ে যাওয়া খাবার খেতে নেই।

—আঁলু? —আঁলু পড়ে গেলে? যদি খাওয়া না যায়? আলু ভীষণ ভালবাসে কুটুস।

—ফ্রান্স থেকে এসেছিস নাকি রে তুই? —ঝুম্পা জিজ্ঞেস করে।

কুটুস জোরে জোরে মাথা নাড়ে। —'নোচনা।' ফ্রান্স নয়, সে 'রোচনা' থেকে এসেছে।

আড়াল থেকে তাকে লক্ষ করেন কল্যাণবাবু। অনেক লক্ষ করে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন এ তাঁদের বাড়িরই ছেলে। নিজেকে তো আর ছোটবেলায় দেখেননি! কিন্তু লোকের কাছে শোনা ছিল। তারপর আছে অ্যালবামে ছবি। একটা নিজের ছোটবেলার ছবি, বড় করে তিনি বাঁধিয়ে রেখেছেন, ফ্রেমসুদ্ধ ছবিটা সারা বাড়ি ভ্রমণ করে। কখনও মল্লিকার ঘরে, কখনও ঝুম্পাদের ঘরে, কখনও আবার ফিরে আসে কল্যাণবাবুর নিজের কাছেই। এই ছবিটা দিয়েই তিনি বোধহয় নিজের ও আর সবার মনের সংশয় কাটাতে চান। একজন অনাথ বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য অর্থ সাহায্য করতেও কল্যাণবাবুর আপত্তি হত না। কিন্তু সম্পত্তির অংশীদার

করতে গেলে নিশ্চিত হওয়া চাই।

ছবিটা দেখিয়ে কুটুসকে যদি বলা যায়—কে বল তো?

কুটুস অমনি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আঙুল রাখে আয়নার প্রতিবিম্বের ওপর। বলে—কুটুস।

কুটুস হারিয়ে গেছে শুনে অদ্ভুতভাবে চুপ হয়ে গেলেন মানুষটি। রাত্রে শোবার আগে একটু দুধ খান। খেলেন না আজ। রাত আটটার পর সাধারণত তাঁর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আজ খোলা রইল। আলোর একটা চওড়া স্রোত দরজা থেকে বেরিয়ে দালানের ওপর পড়ে রইল।

জিনা বিছানায় মৃতের মতো শুয়েছিল। জ্বর একটু কমেছে। মল্লিকা খাবার এনেছে।

—জিনা, ওঠ, খেয়ে নে।

অনেক সাধাসাধির পর উঠে বসল জিনা। রাগে, চোখের জলে মুখটা মাখামাখি হয়ে গেছে। চুলগুলো কপালে সাঁটা। সে তীব্র স্বরে বলল—যাও না যাও, আমাকে কেন? রান্নাঘরে যাও। দেখো আদরের দেবর বোধহয় এসেছেন, তাঁর জন্যে পঞ্চব্যঞ্জন সাজাতে হবে না? কবে থেকে বলছি—ওকে বুঝতে দাও, বুঝতে দাও সবাই ত্যাগ করলে মানুষের কী অবস্থা হয়! তা কে কাকে বলছে!

কল্যাণবাবু অপেক্ষা করছেন। নটা নাগাদ নীচের দরজা চাবি দিয়ে খুলে সে ওপরে উঠল। দালান অবধি পৌঁছোতেই তিনি ঘরের সামনে বেরিয়ে এলেন।

—শোনো—

নিখিল দাঁড়িয়ে গেল।

—বাচ্চাটি কোথায় আছে?

—কে বাচ্চা?

—বাচ্চা একজনের কথাই আমি জিজ্ঞেস করতে পারি তুমি জান।

—ওহ্, কী ব্যাপার? কোথায় সে?

—সেটাই জানতে চাইছি। কোথায় রেখেছ তাকে? আই অ্যাকিউজ য়ু।

—আপনার কথার মানে? আপনার আস্পদ্দা তো কম নয়?

কল্যাণবাবু ঘরে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল।

নিখিল মাঝের দরজায় এসে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, সবাই শুনে রাখো, বেয়াদবির দিন শেষ হয়েছে। এ আমার বাড়ি। আমি যা খুশি করব। ইচ্ছে হলে পুরো শেঠবাগান-রামবাগান উঠিয়ে নিয়ে আসব। নন-স্টপ মাইফেল চলবে। চানস্ দিয়েছিলাম বোঝাপড়ার। হল না। এবার দেখবে আমি কী করতে পারি আর না পারি। —আজ সে বেশ খানিকটা মাতাল। তার চোখ লাল। মত্ততার চিহ্ন তার চলায়-ফেরায়। বিমান যথারীতি এখনও অনুপস্থিত।

সকাল হতে আর দেরি করল না জিনা। কারও কথা শুনল না। একটা ট্যাকসি নিয়ে চলে গেল ঋত্বিকদের বাড়ি। যোধপুর পার্ক। দোতলার জানলা থেকে তার চলে-যাওয়া দেখল নিখিল।

বাড়ির দরজা পেরিয়ে প্রথম কথা বললো জিনা—তোরা রেইড করা।

—কোথায়? —ওই দুই আউটসাইডারের বাড়ি। আমার মনে পড়ছে প্রত্যেক নববর্ষে, ক্রিসমাসে নিখিল একটা করে বড় কার্ড পেত। নাম থাকত 'ল'। জিজ্ঞেস করলে বলত 'ললিত' নামে ওর এক পুরনো বন্ধু ওটা পাঠায়। ওইরকম মনোগ্রাম তার সব কিছুতেই। কখনও এই ললিতকে দেখিনি আমি। আমার ধারণা ওটা ললিত নয়, ললিতা। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। দেখ, ওই 'ললিতা' হয়তো কোনও পাচার-চক্রের সঙ্গে জড়িত।

—সুদ্ধু একটা ওয়াইল্ড গেস-এর ওপর নির্ভর করে কারও বাড়ি রেইড করানো যায়?—মুকুট বলল। কিন্তু জিনার কথায় সে বেশ বিচলিত হয়েছে।

—ওয়াইল্ড? তোরা এটাকে ওয়াইল্ড বলছিস! আমি, বাবা, আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর এটা নিখিলেরই কাজ। ওদের লক্ষ্য হল কুটুস। আর তিনটে বাচ্চাকে চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

ঋত্বিক বলল—মহিলাকে তো আমার গোড়ার থেকেই ভাল লাগেনি। এইসব লাইনে যারা সারাজীবন ধরে ঘাগু হয়েছে তাদের মধ্যে বহু বড় ধরনের অপরাধ দেখা যায়! কে জানে শিশু-পাচার-চক্র না শুধুই নিখিল-চক্র? জিনা তুইও তো মহিলাকে হস্টেলে এসে বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছিস। তখন কী মনে হয়েছিল।

জিনা বলল, ভাল লাগেনি। অত বড়লোকি দেখানোর কী আছে? অত দেমাকই বা কেন? ও সমস্তই মুখোশ। যাই হোক, এখন এসব স্পেকুলেট করে লাভ নেই।

ঋত্বিক বলল, মহিলা যদি এর পেছনে থাকেনও, ওঁর বাড়িতে কখনও পাওয়া যায়, পুলিশে যা করার করছে। আমি একটু পরেই বেরোব। মুকুট, জিনাকে শুইয়ে দে। ওর বেশ জ্বর। প্যারাসিটামল দিয়ে দে একটা। আমার প্রজেক্টটার বারোটা বাজিয়ে দিল এরা।

—হ্যাঁ, খালি নিজের কথাই চব্বিশ ঘণ্টা ভাব। —জিনা রাগ করে বলল।

—তোর খালি কুটুস জিনা, আমার কিন্তু আরও তিনটে আছে শানু, চিতু, শম্ভু। দুর্ভাবনা কারও চেয়ে কম নয় আমার। কিন্তু আমাকে মাথা ঠান্ডা করে চলতে হবে। আমি পুলিশকে তোর সন্দেহের কথা বলব। কোন মিনিস্টার, কোন আমলার সঙ্গে মহিলার দহরমমহরম তো জানি না, তবে আমি শেষ পর্যন্ত লড়ব। এবং তোদের সন্দেহ যদি সত্যি হয়, নিখিল দে সরকার বাঁচবে না।

জিনা চোখ বুজল। তার আর একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে চারপাশে সব কিছুই ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। যেখানে যা আছে। মনে হচ্ছে এইসব দরজা জানলা ভেঙে বেরিয়ে যায় একটা অতিপ্রাকৃত প্রাণীর মতো। তছনছ করে দেয় এই অনাচারে, শয়তানিতে ভর্তি পৃথিবীটার যাবতীয় সংসার। কিন্তু আপাতত তার ভীষণ ঘোর আসছে একটা। মাথায় কে দুরমুশ পিটছে। হাত পা সব যেন কুকুরে চিবোচ্ছে। সে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারছে না আর। এত জ্বর! মুকুট মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে ঠান্ডা জলে। তার চুলগুলো খাটের পাশ থেকে ঝুলে রয়েছে। হু হু করে পাখা চলছে। জ্বর মাপছে মুকুট, কাকে ফোন করল, সবই যেন স্বপ্নে ঘটছে,

যা-কিছু এতদিন ঘটেছে সবই স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন। এক কালরাত্তির যেন তাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরছে। কবে, কোথায় এর শেষ? একটা ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে যাচ্ছে তার জ্বরগ্রস্ত মস্তিষ্ক থেকে। তরঙ্গে তরঙ্গে।

এইভাবেই ঘনিয়ে আসে সেই নিশ্ছিদ্র নিশিদুপুর। জ্বরে অচৈতন্য একজন, একজন নিরুদ্দেশ, আর একজন বসে আছে খোলা জানলার পাশে, করতলে তিনখণ্ড শক্ত মলাটে বাঁধাই গল্পগুচ্ছ। ভেতরে দুশ্চিন্তা, অশান্তি, ভুলে থাকবার একমাত্র উপায় বই। দুপুরে সে ঘুমোবে না স্থির করে, কিছুতেই ঘুমোবে না, কিন্তু এক এক দিন পেরে ওঠে না, আর ঘুমোলেই ম্যমি, ভয়াবহ ভুতুড়ে অন্ধকার, ঘুমোলে বাঘ। সুতরাং তেরোতলা বাড়ির ছাদ থেকে এক লাফে টি.ভি. টাওয়ারে উঠে যায় বাঘটা। মানচিত্র পরিষ্কার। আরেক লাফে নেমে আসে পার্শ্বনাথ মন্দিরের চুড়োয়। আর এক স্লো-মোশন লাফ। জাম্প কাট মানিকতলার মোড়, জাম্প কাট স্টেটবাসের মাথা, জাম্প কাট গোরাচাঁদ বোসের গলি। সরু সরু রাস্তার হেঁতাল ঝোপের পেছনে পেছনে গুঁড়ি মেরে সে এগোতে থাকে। ধূর্ত, নিষ্ঠুর, খল নারীখাদক।

সময়টা অদ্ভুত। দিন অথচ দিন নয়। সূর্য পশ্চিম কোণে ঝুলছে। চাঁদের মতো ক্ষীণ। মেঘের প্রতাপে ভিজে ভিজে নিবু নিবু। ভারী নিষ্প্রভ হাওয়ায় শহরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের বাঘের বুনো গন্ধ। ঘরময়, বারান্দাময়। তীব্র মানুষখেকো গন্ধের চোটে হাঁকপাঁক করে জেগে ওঠে সে। কখন সদর দরজা খুলে গেছে হারানো চাবির মোচড়ে সে টেরও পায়নি। অবসরের চুল মেলে নিশ্চিন্তে ছিল। তামাক-অ্যালকোহলে জড়ানো শরীরের বোঁটকা গন্ধ। খুট করে একটা শব্দ। দরজার আলোর আয়তক্ষেত্র উধাও। লুকোনো কোণ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বপ্নের বাঘ।

প্রাণপণে মুখ সরায় সে করাল মুখের কামড় থেকে। থাবা থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে নিজের মাংস। শাড়ির ওপর দুর্বহ ওজন, হিঁচড়ে পালিয়ে যায় সে শাড়ি থেকে তারপর বইটা দিয়ে সজোরে আঘাত করে। চোখ ঘেঁষে গেছে চোটটা। দৌড়ে ছিটকিনি খোলে সে, চিৎকার বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে, অকথ্য গর্জনে মুখ চেপে ধরছে বাঘটা। সে প্রাণপণে ছুটে যেতে চায় একবার নীচের সিঁড়ির দিকে একবার ছাতের সিঁড়ির দিকে। দরজা চাই, একটামাত্র খোলা দরজা। তাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সিঁড়ির মুখ থেকে টেনে আনতে থাকে বাঘটা, ঘরের দিকে। টুঁটি কামড়ে ধরেছে। থাবাদুটো বুকে। শরীর-মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে এবার এক ধাক্কা দেয়। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পড়ে গেছে বাঘটা, আরেকটা ধাক্কা দেয়, বিদ্যুতের মতো বেগে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে, সমস্ত দিয়ে। গড়াতে গড়াতে নীচে পড়তে থাকে বাঘটা। ধপ্ করে একটা বিশ্রী শব্দ হয়। মাথা নিচু করে পড়েছে। তখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ে দালানের মাঝখানে সবুজ দরজার ওপর। তার সমগ্র বিবাহিত জীবনের সংকুচিত নীরবতার ওপার থেকে ভয়, লজ্জার দেয়াল দু হাত দিয়ে ভেঙে বিকৃত গলায় চিৎকার করে ওঠে। জিনা! জিনা! জিনা!

দরজা খুলে যায়!

এ কী! সায়া-ব্লাউজ পরা আলুথালু হতশ্রী সামনে দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যান বৃদ্ধ।

ওই যে—সে কান্না আর চিৎকার মেশানো একটা তীব্র আর্তনাদ করে—মেরে ফেলেছি। ঠেলে ফেলে দিয়েছি। আর সইতে পারিনি। কতদিন সইব?

লাঠির ওপর ভর, আস্তে আস্তে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ান তিনি। সিঁড়ির তলায় ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে তাঁর ছোট ছেলে, খারাপ ছেলে।

ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। খোলা চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে, ব্লাউজ ছিঁড়ে ঝুলছে, উন্মাদিনীর মতো দৃষ্টি—ওপরে-নীচে বারকয়েক তাকিয়ে দেখলেন তিনি বোঝবার প্রবল চেষ্টায়। তারপর তীব্র কশাঘাতের মতো সত্য ধরা দিল। এত দিনের সমস্ত 'কেন'র কার্যকারণ বুঝে তিনি এক মিনিট তাঁকে আঁকড়ে-ধরা মেয়েটিকে ধরে রইলেন, তারপর এক হাতে লাঠি আর এক হাতে তাকে ধরে ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন, আলনা থেকে একটা শাড়ি নিয়ে বললেন—পরে নাও, আমি তো পরাতে জানি না মা! নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে, তাক থেকে একটা ওষুধের পাতা নিলেন, ছিঁড়ে দুটি বড়ি হাতে দিয়ে বললেন—খেয়ে নাও দেখি, জল দিচ্ছি। নিজের আরামচেয়ারে বসিয়ে দিলেন ধরে ধরে। কুঁজোর জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বললেন—মুখটুখগুলো ভাল করে মুছে নাও এবার। নিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকো, ঘুম এসে যাবে। ...তুমি তো ফেলনি! টাল সামলাতে না পেরে ও আপনি পড়ে গেছে। টাল সামলাতেও তো জানতে হয়!

অপেক্ষা করবেন। তাঁকে এখন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ও ঘুমিয়ে পড়বে। তারপরে তিনি কতকগুলো ফোন করবেন। বেশি নয়। মাত্র তিনটে। একটা বিমানকে, তার অফিসে, দ্বিতীয়টা 'রোচনা'য়, জ্বরগায়ে জিনা বোধহয় সেখানেই গিয়ে বসে আছে, বাচ্চাটার, বাচ্চাগুলোর যদি কোনও খোঁজ পাওয়া যায়। আর তৃতীয় ও সর্বশেষটা ডক্টর সেনগুপ্তকে, তাঁর মোবাইল নম্বরে।

—ডক্টর সেনগুপ্ত? কল্যাণ সরকার বলছি। হ্যাঁ ডাফ স্ট্রিটের। একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই। একদম একা, তার ওপরে খোঁড়া মানুষ, কী যে করি! ছোট ছেলেটি ইদানীং বেসামাল হয়ে বাড়ি ফিরছিল। আপনি তো সবই জানেন! সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে। ঘাড়টা দেখে ভাল ঠেকছে না। বেকায়দায় পড়েছে। আমি খোঁড়া, নীচে নামতে পারছি না, বড় বউমাটি কীরকম ভিতু প্রকৃতির দেখেছেন তো! দেখেশুনে এমন ঘাবড়ে গেছে যে ট্রাংকু ইলাইজার দিতে হল। আমাকে যেটা দিয়েছিলেন! হ্যাঁ টেন দিয়েছি। —বড় ছেলেকে ফোন করেছি। সে-ই এসে দরজা খুলবে। হ্যাঁ, জানি না এ কেন এমন অসময়ে ফিরল! ঈশ্বর জানেন, নিয়তি! কী বলব বলুন—পাপের বেতন কী তা সবাই জানে। তবু, শত হলেও তো বাপ! আপনি যত শিগগির পারেন... হ্যাঁ শক্ত আছি। শক্তই থাকব। নিশ্চয়।

বাণী বসুর জন্ম ২৬ ফাল্গুন, ১৩৪৬।
শিক্ষা-দীক্ষা-কর্ম কলকাতায়।
শিক্ষা : প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ণ, পরে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী। ইংরেজিতে অনার্স, পরে ইংরেজি সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. (১৯৬২)।
কর্ম : হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা।
লেখালেখি : ছাত্রী-জীবন থেকেই প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা ও অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত। উল্লেখযোগ্য অনুবাদ : শ্রীঅরবিন্দের সনেটগুচ্ছ (শৃঙ্গস্তু), সমারসেট মমের সেরা প্রেমের গল্প (১৯৮০, রূপা), সমারসেট মমের সেরা গল্প (১৯৮৪, রূপা) ও ডি.এইচ. লরেন্সের সেরা গল্প (১৯৮৭, রূপা)। আনন্দমেলা ও দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। 'জন্মভূমি মাতৃভূমি' প্রথম উপন্যাস। শারদীয় 'আনন্দলোক'-এ প্রকাশিত, ১৯৮৭-তে। পেয়েছেন তারাশঙ্কর পুরস্কার ১৯৯১, আনন্দ পুরস্কার ১৯৯৭। **বঙ্কিম পুরস্কার ১৯৯৯।**

.....

প্রচ্ছদ নির্মলেন্দু মণ্ডল

এই উপন্যাসের কাহিনী জিনাকে নিয়ে। জিনার স্বপ্ন, স্বপ্নসম্ভব ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প। ওর স্বামী খারাপ ছেলে নিখিলের ভূমিকা এখানে তবে কী? নিজের স্বামীকে জিনা যেখানে আবিষ্কার করবে, সেই অন্ধকারেই আলো জ্বালাবার ব্রত নিয়ে নিঃসন্তান জিনা সমাজসেবা করতে এসেছে। তা হলে জিনা কোন আলোর সন্ধানে বেরিয়েছে?

9 788177 562026